Family Development Package - Book 6

প্যারেন্টিং

এই আধুনিক যুগে
আমার সন্তানকে কিভাবে মানুষ করবো?

আমির জামান
নাজমা জামান

Family Development Package – Book 6

ইসলামিক সায়েন্সের আলোকে

প্যারেন্টিং

এই আধুনিক যুগে আমার সন্তানকে কিভাবে মানুষ করবো?

“Parenting”

How to make our Children competitive in this technologically progressive world

আমির জামান
নাজমা জামান

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

সম্পাদনা পরিষদ

✍
ড. কায়সার মামুন
শিক্ষা বিষয়ক গবেষক
সিংগাপুর

✍
ড. নাহিদা সরকার
জি.পি. সিডনী
অষ্ট্রেলিয়া

✍
আলী আকবর
শিক্ষা বিষয়ক গবেষক
আমেরিকা

✍
মেরিনা সুলতানা
আরলি চাইল্ডহুড এডুকেটর
ক্যানাডা

Published by
Institute of Family Development, Canada
www.themessagecanada.com

প্যারেন্টিং – এই আধুনিক যুগে আমার সন্তানকে কিভাবে মানুষ করবো?

Amir Zaman
Nazma Zaman
Toronto, Canada
Email: themessagecanada@gmail.com

© Copyright: IFD Trust

1st Edition: December 2008
2nd Edition: August 2011
3rd Edition: January 2013
4th Edition: December 2015

প্রাপ্তিস্থান

Bangladesh:

IFD Trust	**UZ Sales Centre**	**Taleb Pharma**	**Al-Maruf Publications**	**Kabir Pablishers**
Mohammadpur	Dhaka	NurJahanRoad	Katabon, Dhaka	Chittagong
Dhaka	01712846164	Dhaka	029673237	01613061653
01710219310	01675865180	01917216350	01913510991	
01682711206		01712177474		

Canada:

TIC	**ATN Book Store**	**Proton Book Centre**
Toronto Islamic Centre	Danforth, Toronto	Danforth, Toronto
575 Yonge St. Toronto	416-686-3134	416-388-4250
647-350-4262	416-671-6382	647-346-4250

Other Countries:

New York, USA	**California, USA**	**London, UK**	**Australia**	**Singapore**
917-671-7334	714-821-1829	447424248674	61287839811	65-938-67588
718-424-9051	714-930-6677			

মূল্য ঃ ২৫০ টাকা (BDT)
Price: $7 (Seven Dollars)

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

আস্‌সালামু আলাইকুম

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের যিনি আমাদের নিকট আল-কুরআন পাঠিয়েছেন জীবন পরিচালনার জন্য একটি পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা (গাইডলাইন) হিসেবে এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে পাঠিয়েছিলেন সেই গাইডলাইন বাস্তবায়ন করে দেখানোর জন্যে।

আমরা মা-বাবারা সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কত কষ্টই না করে যাচ্ছি। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে যে সঠিক দিক নির্দেশনার অভাবে অনেক ছেলেমেয়েরাই মা-বাবার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। এরকম অনেক ঘটনাই ঘটেছে যে সন্তানদের উপর সঠিক সংশোধন প্রক্রিয়া প্রয়োগ না করার কারণে সন্তান মা-বাবার অবাধ্য হয়ে গেছে। এসব পরিস্থিতিতে নিরাশ হওয়া যাবে না। অবশ্যই প্রত্যেকটা সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধান রয়েছে। এসমস্যার মূল কারণ কী এবং তার সমাধান কিভাবে করা যাবে তা নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে। আমাদের ১২ বছরের চিন্তা ও গবেষণার ফলাফল এ বইটিতে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। এই বইটিতে কোন theory বা তত্ত্বকথা আলোচনা করা হয়নি, বরং সব practical তথা বাস্তবধর্মী বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে একের পর এক ঘটনা তুলে ধরে তার একটি সঠিক সমাধান বের করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সূরা মুনাফিকুন এর ৯ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন ঃ *"মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে ফিরিয়ে না রাখে।"* আবার সূরা আত-তাগাবুন এর ১৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ *"তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষা স্বরূপ। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার"।*

সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমরা কত কিছুই না করছি। আর সেই সন্তান যদি সত্যিকার অর্থে "মুসলিম" না হয় তাহলে আমাদেরকে আখিরাতের ময়দানে কঠিন জবাবদিহি করতে হবে এবং এই সন্তানই কিয়ামতের দিন তার মা-বাবার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে। তাই আমরা যেন সন্তানের

ভবিষ্যৎ নিয়ে একমুখী (one-way) চিন্তা না করি। আমরা যদি এই বইটি থেকে প্রকৃতভাবে উপকৃত হতে চাই তাহলে বইটি একবার পড়েই যেন রেখে না দেই। একটু কষ্ট হলেও বইটি কয়েকবার মনোযোগ দিয়ে পড়ি এবং বোঝার চেষ্টা করি। যে বিষয়গুলো পাঠকের কাছে জরুরী বলে মনে হয় সেগুলো হাইলাইটার পেন দিয়ে হাইলাইট করি। বিষয়গুলো গভীরভাবে চিন্তা করি এবং অন্যদের সংগেও শেয়ার করি।

আমাদের লেখা বইগুলোর উদ্দেশ্য অন্যান্য গতানুগতিক বইয়ের মতো নয়। এটি আমাদের মত সাধারণ মুসলিমদের জন্য কুরআন-সুন্নাহর আলোকে একটি Exercise Book এবং সেই সাথে একটি গাইডলাইন। আমাদের উদ্দেশ্য সন্তানদের নিয়ে একটি সুখী ও সুন্দর পরিবার গঠন, এবং একই সাথে একটি সুন্দর সমাজ ও দেশ গঠন, যাতে এই পৃথিবীতেও সফল হওয়া যায় এবং একই সংগে পরকালেও সফল হওয়া যায়।

আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি শিবলী মেহেদী ভাইয়ের জন্য যিনি এই বইটি লাইন বাই লাইন দেখে সংশোধন করেছেন এবং প্যারেন্টিং বিষয়ে অনেক মূল্যবান তথ্য দিয়ে আমাদেরকে সহায়তা করেছেন। শিবলী ভাই মূলতঃ শিশু লালন-পালন নিয়ে কাজ করেন। Shishu Lalon Palon লিখে ইউটিউবে সার্চ দিলেই শিবলী ভাইয়ের সকল শিক্ষামূলক ভিডিওগুলো পাওয়া যাবে। আমরা শিবলী ভাই এবং তার পরিবারের আখিরাতে মুক্তির জন্য দু'আ করি।

আলহামদুলিল্লাহ, এই বইটি লেখার ব্যাপারে সিঙ্গাপুরে বসবাসরত আমার দ্বীনি ভাই সারওয়ার কবির শামীম এর লেখা "সফল প্রবাস জীবন" বইটি আমাদেরকে বেশ সাহায্য করেছে। আর এজন্য আমরা শামীম ভাই-এর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আমরা তার ও তার পরিবারের আখিরাতে মুক্তির জন্য দু'আ করি।

সম্মানিত পাঠকের মতামত, ভুল সংশোধন ও দৃষ্টি আকর্ষণ ই-মেইল অথবা টেলিফোনে জানালে আগামী সংস্করণে তা প্রতিফলিত হবে, ইন্‌শাআল্লাহ।

জাযাকআল্লাহু খাইরন,

আমির জামান
নাজমা জামান
টরন্টো, ক্যানাডা

আমি কি আমার সন্তানকে নিয়ে সমস্যায় ভুগছি?

- আমার সন্তান কি আমার কথা শুনতে চায় না?
- আমার সন্তান কি পড়াশোনায় অমনোযোগী?
- আমার সন্তান কি অন্যদের সাথে কিছু শেয়ার করতে চায় না?
- আমার সন্তানের কি জীদ বেশী?
- আমার সন্তান কি জিনিস-পত্র ভাঙে বা ছুড়ে ছুড়ে মারে?
- আমার সন্তান কি স্কুল ফাঁকি দেয় বা স্কুলে যেতে চায় না?
- আমার সন্তান কি আজেবাজে গালি দেয়?
- আমার সন্তান কি বন্ধুদের সাথে মারামারি করে?
- আমার সন্তান কি সন্ধার পরও বাইরে থাকে?
- আমার সন্তান কি মিথ্যা কথা বলে?
- আমার সন্তান কি সারাক্ষণ নাচগান নিয়ে থাকে?
- আমার সন্তান কি সারাক্ষণ কম্পিউটার গেইমস, এক্স-বক্স নিয়ে থাকে?
- আমার সন্তান কি সারাক্ষণ ট্যাবলেট, স্মার্টফোন নিয়ে থাকে?
- আমার সন্তান কি সারাক্ষণ টিভি নিয়ে ব্যস্ত থাকে?
- আমার সন্তান কি বাজে বন্ধুদের সাথে মিশে?
- আমার সন্তান কি আমার পকেট থেকে না বলে টাকা নেয়?
- আমার সন্তান কি ঠিক মতো সলাত আদায় করতে চায় না?
- আমার সন্তান কি ঠিক মতো সিয়াম পালন করতে চায় না?
- আমার সন্তান কি প্রায়ই কোষ্ঠকাঠিন্যতে ভুগে?
- আমার সন্তান কি স্কুলে টিফিন দিলে তা না খেয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসে?
- আমার সন্তান কি শাক-সব্জি ও ফল-মূল খেতে চায় না?
- আমার সন্তান কি মাঝেমধ্যেই দাঁত ব্রাশ করতে চায় না?
- আমার সন্তান কি প্রতিদিন গোসল করতে চায় না?
- আমার সন্তান কি মাঝেমধ্যে বিষন্নতায় ভুগে?

সূচীপত্র

চ্যাপটার ১ ঃ প্যারেন্টিং নিয়ে কিছু কথা

প্যারেন্টিং কি ও কেন? ১৩
প্যারেন্টিং অর্গানাইজেশনস এবং ইনষ্টিটিউটস ১৯
প্যারেন্টিং-এর ছয়টি ধাপ ২১

চ্যাপটার ২ ঃ সন্তান জন্মের পূর্বে ও পরে

গর্ভবতী মায়ের পড়াশোনা ২৩
মায়ের গর্ভে শিশুর শিক্ষা পর্ব ২৪
সন্তান জন্মের পূর্বে সতর্কতা ২৫
সন্তান জন্মের আগে দু'আ ২৬
সন্তান জন্মের আগের নৈতিক দায়িত্ব ২৭
সন্তান জন্মের আগের স্বাস্থ্যগত দায়িত্ব ২৭
সন্তান জন্মের পরপর দায়িত্ব ২৮
সন্তান জন্মের পর প্রথম দিনের দায়িত্ব ২৮
সন্তান জন্মের পর সপ্তম দিনের দায়িত্ব ২৯
ছেলে সন্তানের মুসলমানি (খতনা) কখন করাবো? ৩০
ভূমিষ্ট শিশু নিয়ে কুসংস্কার মুক্ত থাকা ৩১
শিশু সন্তানকে শিরক থেকে মুক্ত রাখা ৩২

চ্যাপটার ৩ ঃ শিশুর লালন-পালন এবং শিশুর শিক্ষা

শিশুর বেড়ে উঠা এবং ক্রমবিকাশ ৩৫
শিশুদের নিয়ে সতর্কতা ৪২
শিশুদের সাথে কথা বলা ৪৬
শিশুদের নিয়ে আরো কিছু মূল্যবান টিপ্‌স ৪৭

চ্যাপটার ৪ ঃ কিছু প্রশ্ন, কিছু চিন্তা, কিছু ভাবনা

আমার সন্তানকে কিভাবে গাইড করবো? ৫২
সত্যিকার মানুষের সংজ্ঞা কী? ৫৩
আমি কি চাই না আমার সন্তানের মনে ভাল উপাদানগুলি বেশী করে ঢুকুক? ৫৫
আমি কি চাই এই প্রতিকূল পরিবেশে আমার সন্তানের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি হোক? ৫৭
আমি কি এখনও সাবধান হবো না? ৫৮
আমাদের প্রয়োজন আগেই মানসিক প্রস্তুতি ৫৯
মা-বাবার আচরণ সন্তানদের মনে প্রভাব ফেলে ৬০
মা-বাবাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন ৬১

আমার সন্তানের শিক্ষা কিন্তু থেমে নেই ৬১
এ যুগের ছেলেমেয়েদের ধারণা ৬৩

চ্যাপটার ৫ ঃ আমাদের চাওয়া

আমরা সবাই চাই সন্তানরা ভাল হোক, ভাল পথে চলুক ৬৬
বেশীরভাগ মা-বাবার ভুল ধারণা ৬৮
দ্বীন সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা ৬৮
আমরা সন্তানদের সবসময় ছোট মনে করি ৬৯
কিছু পারিবারিক নিয়ম থাকা উচিত ৭০
পারিবারিক সিটিং বা বৈঠক ৭১
বাসায় সন্তানদের জন্য লাইব্রেরী করে দেয়া ৭২
সন্তান প্রতিপালনে মুসলিম ও অমুসলিম মায়ের পার্থক্য ৭২
সন্তানকে মানুষ করার পিছনে মায়ের কর্তব্য ৭৪
সন্তানদের সামনে অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত থাকা ৭৬
রাগ নিয়ন্ত্রন কিভাবে করবো? ৭৭
পরিবারের সাথে সময় কাটানো ৭৮
আল্লাহ, রসূল ﷺ ও ইসলামকে আমরা সবচেয়ে বেশী ভালবাসবো ৭৮

চ্যাপটার ৬ ঃ আমার সন্তানের অধিকার

মেয়ে হলে অসন্তুষ্ট হওয়া ঠিক না ৮২
প্রতিবন্ধী (Mental Disability) সন্তান ৮৩
সন্তানদের প্রতি করণীয় ৮৫
উত্তম ব্যবহার শিক্ষা দান ৮৭
সন্তানদেরকে ঘরের কাজকর্মে অভ্যস্ত করা ৮৮
ভারসাম্যপূর্ণ অভ্যাস তৈরী করা ৮৯
সন্তানকে অভিশাপ না দেয়া ৯০
আমার সন্তানের বিবাহ ৯২

চ্যাপটার ৭ ঃ আমার সন্তানের চরিত্র গঠন

সন্তানের চরিত্র গঠনের উপায় ৯৬
রসূল ﷺ -এর চরিত্রকে মডেল হিসেবে তুলে ধরি ৯৭
অন্যায়কে সুস্পষ্ট করি ৯৭
সন্তানদের ছোটবেলা হতে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য শেখাতে চেষ্টা করি ৯৮
তারা যেন মিথ্যা না বলে ৯৯
আমার সন্তানদেরকে স্পষ্টভাষী হতে সাহায্য করি ৯৯
ইসলামী আদব শিক্ষা দান ১০০
সন্তানদের সালামের অভ্যাস করানো ১০১

সুন্দর ও অসুন্দর কথা শিক্ষাদান ১০২

চ্যাপটার ৮ ঃ আমার সন্তানের নির্ভুল জ্ঞান অর্জন

বাবা-মায়ের জ্ঞান অর্জন করা জরুরী ১০৭
ভুল শিক্ষা থেকে সাবধানতা ১০৮
কুরআন অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়া ১১০
আমার সন্তানের সঠিক আকীদা ১১২
গান, কবিতা, গল্প-উপন্যাস, নাটক, সিনেমা এবং বাঙালী কালচারের নামে নানা রকম শিরক! ১১৩
সন্তানদেরকে আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া ১১৪
সন্তানদের নিকট মুহাম্মাদ ﷺ -এর পরিচয় তুলে ধরি ১১৪

চ্যাপটার ৯ ঃ আমাদের সন্তানদের জন্য গাইডলাইন

সন্তানদের একাডেমিক ইসলামী শিক্ষা ১১৯
সন্তানদের নিয়ে স্কলারদের ভিডিও উপভোগ ১২০
ইংলিশ ভার্সনের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য গাইড ১২১
আমার সন্তানের ডেইলি রুটিন (Sample) ১২২
সন্তানদের সকাল-সন্ধ্যার দু'আ শিক্ষা দেয়া ১২৩
সন্তানদের পড়ালেখায় ভাল করার বিষয়ে বাবা-মায়ের সহায়তা ১২৪
সন্তানদের ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টে সাহায্য করা ১২৭

চ্যাপটার ১০ ঃ আমার সন্তানের ট্রেনিং

আমার সন্তানের সলাতের ট্রেনিং ১৩১
সন্তানদের নিকট জামাতে সলাত আদায়ের গুরুত্ব তুলে ধরা ১৩২
পরিবারের সাথে সলাত আদায় ১৩৪
সন্তানদের সিয়াম (রোযা) পালনের অভ্যাস করানো ১৩৪
মেয়েকে পর্দা/হিযাব করার অভ্যাস করানো ১৩৫
ফরয ইবাদতের গুরুত্ব ১৩৬
সন্তানদেরকে ত্যাগের শিক্ষা দেয়া ১৩৬
ধনী-গরীব সকল আত্মীয়দের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া ১৩৭
আমার সন্তানের সংঘবদ্ধ জীবনযাপন ও ট্রেনিং প্রোগ্রাম ১৩৮
টিভি চ্যানেল উপভোগ ১৩৮

চ্যাপটার ১১ ঃ সতর্কতা অবলম্বন

সন্তানদের শাসন করা ১৪২
সন্তানদের প্রতি আজেবাজে মন্তব্য না করা ১৪৩
সন্তানদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি দৃষ্টি রাখা ১৪৪
আমার সন্তান যেন আমাকে বন্ধু ভাবে ১৪৪

সন্তানের ধূমপানের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা ১৪৫
মা-বাবাদের জন্য দু'টি তথ্য ১৪৭
ছেলে এবং মেয়েরা কি একে অপরের বন্ধু হতে পারে? ১৪৭
সন্তানদের ভবিষ্যৎ পেশা সম্পর্কে সতর্কতা ১৫১
ফেইসবুক সম্পর্কে সাবধানতা ১৫১
আমার সন্তান কি সাইবার বুলিং-এর শিকার? ১৫২
ইসলামিক ওয়েবসাইট ভিজিট করার বিষয়ে সতর্কতা ১৫৪
আমার সন্তান কি কার্টুন পছন্দ করে? ১৫৪

চ্যাপটার ১২ ঃ আমার সন্তানদের জন্য বিশেষ সচেতনতা

ইসলামের দৃষ্টিতে সেক্স ১৬১
যৌনতা বিষয়ে শিশুর প্রশ্নের জবাব দেয়া ১৬৩
শিশুর বিকাশের জন্য যেভাবে মা-বাবা সাহায্য করতে পারে ১৬৪
যৌন হয়রানী থেকে সতর্কতা ১৬৬
পর্নগ্র্যাফি থেকে দূরে রাখার বিষয়ে কতিপয় পদক্ষেপ ১৬৭
পর্নগ্র্যাফিতে আসক্তির সমস্যা ও সমাধান ১৬৮

চ্যাপটার ১৩ ঃ সন্তান প্রতিপালনে সূরা লুকমানে উপদেশাবলী

প্রথম থেকে একাদশ উপদেশাবলী ১৭১
শিশুদের প্রতি নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর ভালোবাসা ১৭৭

চ্যাপটার ১৪ ঃ সন্তানের নিকট মা-বাবার গুরুত্ব

মা দিবস ও বাবা দিবস ১৮০
মায়ের অধিকার ১৮১
মা-বাবার সাথে ভাল আচরণে তাদের কী লাভ ১৮৩
মা-বাবার আনুগত্য করা ওয়াজিব ১৮৪
মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার ১৮৭
মা-বাবার জন্য অর্থ ব্যয় ১৯০
অনেক সন্তানেরাই জানে না মা-বাবার মৃত্যুর পর কী করণীয় ১৯৪

চ্যাপটার ১৫ ঃ প্যারেন্টিং বিষয়ে শায়েখ নুমান আলী খানের পরামর্শ

আমার সন্তানের সাথে আমার সম্পর্ক কতটুকু? ১৯৭
সন্তান প্রতিপালনে আমাদের করণীয় ২০১
সন্তানদেরকে সময় দেয়া ২০৮
সন্তানদের মিথ্যা বলার কারণ ও প্রতিকার ২১১

চ্যাপটার ১৬ ঃ টিনএইজ প্যারেন্টিং

১৩ থেকে ১৯ বছর বয়স ২১৬
টিনেইজ বয়সে ছেলেমেয়েরা সাধারণত যে সমস্যাগুলোতে পরে ২১৬

Useful Tips for Teenage Parenting ২১৯
যে সকল ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেছে কিন্তু ছোটবেলায় বাবা-মা থেকে দ্বীনি শিক্ষা পায়নি ২২১

চ্যাপটার ১৭ ঃ হেলথ্ টিপ্স (কিছু স্বাস্থ্য পরামর্শ)

খাওয়ার রুটিন পরিবর্তন করা ২২৪
শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য ও সমাধান ২২৪
সন্তানের জন্য কিছু স্বাস্থ্য টিপ্স ২২৬
ব্রেইনকে প্রখর রাখতে ৮টি অভ্যাস ২২৭
ব্রেইনের জন্য ১০টি খারাপ অভ্যাস ২২৯
ব্রেইন ফুড এবং স্মরণ-শক্তি বৃদ্ধি ২৩১
স্ট্রেস কন্ট্রোল করা ২৩১
প্রচন্ড গরম থেকে নিরাপদে থাকা ২৩৪
রসুন উপকারিতা ২৩৪
মধুর উপকারিতা ২৩৪
কালিজিরার উপকারিতা ২৩৭
নাবী মুহাম্মাদ ﷺ স্মৃতিশক্তি বাড়াতে যে খাবার খেতে বলেছেন ২৩৮
দীর্ঘজীবী হওয়ার উপায় ২৪১

APPENDIX: কিছু বাস্তব চিত্র থেকে শিক্ষাগ্রহণ ২৪২

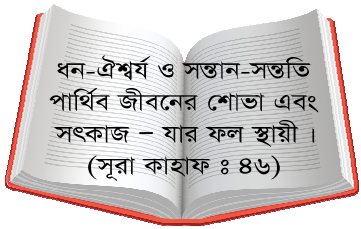

প্যারেন্টিং নিয়ে কিছু কথা

চ্যাপটার ১

প্যারেন্টিং কি ও কেন?

প্যারেন্টিং শব্দটি ইংরেজী, এর সারমর্ম হচ্ছে সন্তান প্রতিপালনে মা-বাবার ভূমিকা। প্যারেন্টিং শব্দটির অর্থ ব্যাপক। প্যারেন্টিং মানে খুব ছোট বয়সে শুধু শিশুর লালন-পালন নয়। প্যারেন্টিং হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি যার মাধ্যমে সন্তানের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং ধর্মীয় প্রতিটি দিক দিয়ে শিশুকাল থেকে যৌবন পর্যন্ত শিক্ষা দান।

প্যারেন্টিং-এর মূল দায়িত্ব সাধারণত পালন করেন জন্মদাত্রী মা এবং বাবা। কিন্তু তারপরও নিকট আত্মীয়-স্বজন যেমন, বড় ভাই-বোন, খালা-খালু, চাচা-চাচী, মামা-মামী, দাদা-দাদী, নানা-নানীরাও প্যারেন্টিং-এর কাজটি করতে পারেন। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত পিডিয়াট্রিশিয়ান এবং সাইকোলজিস্ট ডোনাল্ড উইনিকোট বলেছেন, ভাল প্যারেন্টিং-এর অর্থ হচ্ছে সন্তানের জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে তার প্রতিটি মুহূর্তের ডেভেলপমেন্টের অর্থাৎ অগ্রগতির বা উন্নতির প্রতি সজাগ থাকা (সজাগ দৃষ্টি রাখা)।

আমাদের দেশে কোন কোন প্যারেন্ট সন্তানের শুধু মাত্র স্বাস্থ্য ও খাওয়া-দাওয়া নিয়ে চিন্তা করেন। আবার কোন কোন প্যারেন্ট শুধু সন্তানের পড়ালেখা নিয়ে বেশী চিন্তা করেন যেমন, সকালে টিচার, সারাদিন স্কুল, বিকেলে কোচিং, রাতে আরেক টিচার ইত্যাদি। আবার কোন কোন প্যারেন্ট সন্তানের কোন বিষয়েরই খোঁজ-খবর নেন না, কিন্তু পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ হলেই শুরু করেন মারধর, শাস্তি ইত্যাদি। এর কোনটিই ঠিক নয়।

প্যারেন্টিং হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপনা বা complete package. এই প্যাকেজের আওতায় সন্তানের এই দুনিয়ার ভালো এবং আখিরাতের ভালোর জন্য যা যা প্রয়োজন তা সবই সম্পৃক্ত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে বেশী গুরুত্ব দেয়া যাবে না।

প্যারেন্টিংয়ের ধরণ ঃ শিশু বিশেষজ্ঞরা প্যারেন্টদেরকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যারা সন্তানের ভালমন্দ সবই গ্রহণ করেন তারা হচ্ছেন ইকুয়ালিটেরিয়ান (equalitarian) বা সাম্যবাদী প্যারেন্ট। আর যে সকল প্যারেন্ট সন্তানের সব ধরনের খারাপকে খারাপ চোখে দেখেন না তারা হলেন সহনশীল প্যারেন্ট। আর যে সকল প্যারেন্টরা সন্তানদের ভাল-মন্দ বিষয়গুলো খুব কড়াকড়িভাবে দেখেন তারা হলেন স্ট্রিক্ট প্যারেন্ট।

শিশুদের ধরণ ঃ শিশু বিশেষজ্ঞরা প্যারেন্টদের মতো শিশুদেরকেও তিনভাগে ভাগ করেছেন। যে সকল শিশু ভাল-মন্দ দু'টিই করে বেড়ায় তারা হচ্ছে নমনীয় শিশু। আর যে সকল শিশু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মা-বাবাকে খুব সহযোগিতা করে থাকে তারা হলো সহযোগিতাকারী শিশু। আর যে সকল শিশু একেবারেই মা-বাবার কথা শুনে না তারা হচ্ছে অবাধ্য শিশু।

প্যারেন্টিংয়ের ধরণ

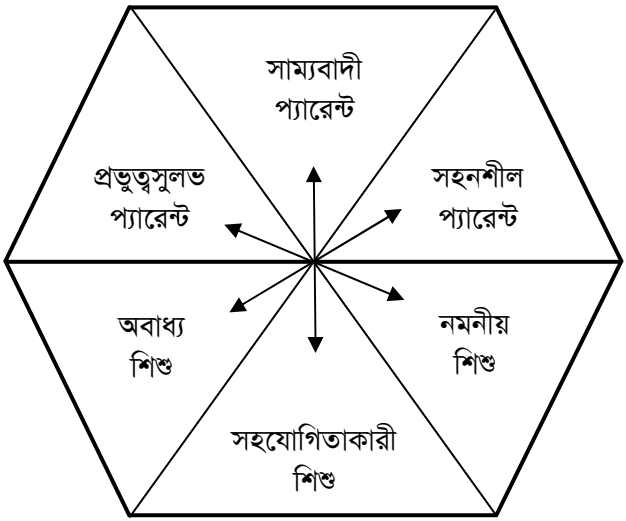

শিশুর ধরণ

প্যারেন্টিং শব্দটি বাংলাদেশে থাকতে আমরা খুব একটা শুনিনি। ক্যানাডা আসার পর দেখি প্যারেন্টিং শব্দটি বহুল প্রচলিত। এই বিষয়ে এখানে কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিগুলোতে বিভিন্ন রকমের শর্ট কোর্স এবং লং কোর্স রয়েছে। তারপর আমাদের মেয়ে জারার জন্ম হওয়ার পর এই বিষয়ে আরো ভালভাবে জানতে শুরু করলাম। আমরা স্বামী-স্ত্রী প্যারেন্টিং-এর উপর ক্যানাডা এবং আমেরিকা থেকে এধরনের কয়েকটি কোর্সও করেছি। উন্নত দেশগুলোতে এই বিষয়ের উপর খুব জোর দেয়া হয়। উন্নত বিশ্বের প্যারেন্টিং এর কিছু বিষয় আমরা বাংলাদেশে বসবাসরত বাবা-মায়েদের সাথে শেয়ার করতে চাই। আমরা চাই আমাদের বাংলাদেশেও ভবিষ্যতে প্যারেন্টিং এর উপর এই ধরনের সুযোগ-সুবিধা এবং সিস্টেম ডেভেলপ হোক এবং চালু হোক।

ক্যানাডায় শিশু জন্মের আগে থেকে শুরু হয়ে যায় প্যারেন্টিং কার্যক্রম। ক্যানাডিয়ান সরকারের রয়েছে এ জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ। যেমন ঃ

- প্রিন্যাট্যাল ক্লাস (মায়ের জন্য)
- ডেলিভারি ওরিয়েন্টেশন (মা এবং বাবা দু'জনের জন্য)
- ব্রেষ্ট ফীডিং ক্লাস (মা এবং বাবা দু'জনের জন্য)
- পোষ্ট ন্যাট্যাল ক্লাস (মায়ের জন্য)
- ডায়েট ক্লাস (মায়ের জন্য)
- প্যাটারনিটি লীভ (বাবার জন্য)
- ডে-কেয়ার (বাচ্চার জন্য)
- প্রি-স্কুল (বাচ্চার জন্য)

প্রিন্যাট্যাল ক্লাস ঃ এই ক্লাসটি গর্ভবতী মায়েদের জন্য। এখানে শেখানো হয় যে শিশু জন্মের আগে মা কি কি করবে, কিভাবে চলবে, কি কি সাবধানতা অবলম্বন করবে ইত্যাদি।

ডেলিভারি ওরিয়েন্টেশন ঃ শিশু যে হসপিটালে ডেলিভারি হবে সেখান থেকে ডেলিভারি তারিখের এক-দুই মাস আগে হসপিটাল ভিজিট করার জন্য এপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়। সেদিন মা এবং বাবা দু'জনকেই হসপিটালের দরজা থেকে শুরু করে রিসেপশন, ওয়েটিং রুম, ডেলিভারি রুম, অপারেশন রুম ইত্যাদি সব আগেই দেখিয়ে দেয়া হয়। বিষয়টা গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারব বিষয়টা কত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যে দিন ডেলিভারির ব্যাথা উঠে

সেদিন মা এবং বাবা দু'জনই খুব উদ্বিগ্ন থাকেন, কোথায় যাবেন, কিভাবে যাবেন সব কিছু মিলিয়ে খুব টেনশনে থাকেন। তাই আগে থেকেই যদি প্র্যাকটিকাল প্ল্যানটি জানা থাকে তাহলে ঐ দিন আর বেশী ঝামেলা পোহাতে হয় না (টেনশনে ভুগতে হয় না)।

সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার দিন ঃ স্কুল জীবনে হুমায়ুন আহমেদের মে ফ্লাওয়ার উপন্যাস থেকে এই বিষয়টি প্রথম জানতে পারি। তখন খুব অবাক লেগেছিল। এই অভিজ্ঞতা বাংলাদেশে কারো নেই। আমেরিকা-ক্যানাডায় বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার সময় শিশুর বাবা শিশুর মায়ের হাত ধরে অপারেশন থিয়েটারে বা ডেলিভারি রুমে বসে থাকেন। এর কারণ হচ্ছে মা যে সন্তান ভূমিষ্ট করার জন্য কত কষ্ট করেন তা বাবা হিসেবে স্বামীও যেন কিছুটা বুঝতে পারেন। এবার সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর সন্তানকে সর্বপ্রথমে বাবার কোলে দেয়া হয় এবং তিনি শিশুর কানে আযান দেন।

নতুন শিশুর জন্য গিফ্‌ট ঃ একটি আনন্দদায়ক বিষয় হচ্ছে হসপিটালে শিশু যেদিন জন্ম নেয় সেদিন নার্সরা বেবীর জন্য ফুল নিয়ে আসে। পৃথিবীর বড় বড় নাম করা বেবী প্রডাক্টস কোম্পানীগুলো যেমন, ডাইপার কোম্পানী, বেবী ফুড কোম্পানী, বেবী প্রসাধনী কোম্পানী ইত্যাদি থেকে নানা রকম গিফ্‌ট সামগ্রী পাঠানো হয়। একটি ফটোগ্রাফী কোম্পানী শিশুর জন্মের দিন প্রস্তুত থাকে বেবীর নানা ভংগীতে ছবি তোলার জন্য।

ব্রেষ্ট ফীডিং ক্লাস ঃ যদি অনাগত সন্তানটি বাবা মায়ের প্রথম সন্তান হয় তাহলে এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একজন নতুন মায়ের জন্য এটি একটি নতুন অভিজ্ঞতা। এই ব্রেষ্ট ফীডিং-এরও যে নানা উপায় আছে তা না জানলে নবজাতক শিশু হয়তো ঠিক মতো দুধ না পেয়ে কষ্ট পাবে। কারণ একটি নবজাতক শিশুর একমাত্র খাদ্য হচ্ছে মায়ের বুকের দুধ। তাই ক্যানাডাতে সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার পরপরই প্রতিটি হসপিটালে রয়েছে ব্রেষ্ট ফীডিং-এর জন্য স্পেশাল ক্লাস। এই ক্লাসে প্রতিটি নতুন মা এবং বাবাকে একজন শিক্ষক শিক্ষা দেন যে কীভাবে শিশুকে ব্রেষ্টফীডিং করাতে হবে।

পোষ্ট ন্যাট্যাল ক্লাস ঃ এই ক্লাসটিও মায়ের জন্য। অর্থাৎ শিশু জন্মের পর এই ক্লাস শুরু করতে হয়। বিশেষ করে যাদের প্রথম বাচ্চা। এই নতুন শিশুকে কিভাবে পরিচর্যা করতে হবে তা নিয়ে সাজানো হয়েছে এই পোষ্ট ন্যাট্যাল ক্লাসের কার্যক্রম। এটি শিশু জন্মের পর চার মাসের কোর্স। এখানে শেখানো

হয় কিভাবে সদ্যভূমিষ্ট বাচ্চাকে লালন-পালন করতে হবে। এছাড়া বাচ্চা জন্মের পরপর হসপিটাল থেকে একজন শিশু বিশেষজ্ঞ নার্স বাসায় নিয়মিত পাঠানো হয়। কারণ একজন নতুন মা হয়তো অনেক কিছুই জানেন না। যেমন, বাচ্চাকে কীভাবে গোসল করাতে হয়, কীভাবে ডাইপার পরিবর্তন করতে হয়, কীভাবে ব্রেস্ট ফীডিং করাতে হয়, কীভাবে অন্যান্য কাজগুলো করতে হয় ইত্যাদি।

ডায়েট কোর্স ঃ এই কোর্সটিও মায়ের জন্য। গর্ভকালীন একজন মায়ের দৈহিক ওজন ১০ থেকে ১৪ কেজি পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। শিশুর মা শিশু জন্মের আগে এক প্রকার খাবার খেয়েছেন এবং জন্মের পর তার খাবারের মধ্যে বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। মা যদি ব্যালেন্সড ডায়েট না করেন তাহলে সেখান থেকে নানা প্রকার অসুবিধা হতে পারে, অস্বাভাবিক মোটা হয়ে যেতে পারেন ইত্যাদি। তাই শিশুর জন্মের পর পোষ্ট ন্যাট্যাল ক্লাসের পরপরই এই ডায়েট কোর্সের ব্যবস্থা।

প্যাটারনিটি লীভ (ছুটি) ঃ এই শব্দটি বাংলাদেশে থাকতে কোনদিন শুনিনি। আমরা সবসময় শুনে আসছি ম্যাটারনিটি লীভ অর্থাৎ যে সকল মায়েরা চাকরীজীবী তারা যখন প্রেগন্যান্ট হন এবং শিশুর জন্মের কিছুদিন আগে থেকে ছুটিতে যান সেই ছুটিকে বলে ম্যাটারনিটি লীভ, এই লীভ বাংলাদেশে সাধারণত তিন থেকে ছয় মাস দেয়া হয়। কিন্তু ক্যানাডাতে মায়েদের জন্য ম্যাটারনিটি লীভ এক থেকে দেড় বছর পর্যন্ত। প্যাটারনিটি লীভ হচ্ছে বাবাদের জন্য। তারাও শিশুর পরিচর্যার জন্য নতুন মাকে সাহায্য করার জন্য এক থেকে দেড় বছর ছুটি কাটাতে পারেন এবং সেই ছুটিকেই বলে প্যাটারনিটি লীভ। এখানে শিশু পরিচর্যার দায়িত্ব শুধু মায়ের একার নয়, বাবারও।

ডে কেয়ার ঃ অনেক বাবা-মা দু'জনই হয়তো চাকরী করেন। তখন তারা বাচ্চাকে ডে কেয়ারে রেখে যান এবং অফিস থেকে ফেরার পথে আবার বাড়ি নিয়ে আসেন। যারা ডে কেয়ার পরিচালনা করেন তাদেরকে অবশ্যই এই বিষয়ের উপর ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রি থাকতে হবে। যে কেউ চাইলেই এই কাজ করতে পারে না। বেশীরভাগ অমুসলিম ডেকেয়ারে মুসলিম বাচ্চাদেরকে হালাল খাবার দিয়ে থাকে। এছাড়া আমেরিকা এবং ক্যানাডায় অনেক মুসলিম ডে কেয়ারও রয়েছে। এই ডে কেয়ার থেকে বাচ্চা অনেক কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে। বাচ্চার মা-বাবা অনলাইলে বাচ্চাকে সারাদিন দেখতে পারে যে সে ডে কেয়ারে কখন কি করছে।

প্রি-স্কুল ঃ শিশুর বয়স যখন তিন বছর হয় তখন এখানে তাদের জন্য রয়েছে প্রি-স্কুল। শিশুরা প্রাইমারী স্কুলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এক বছর এই প্রি-স্কুলে পড়াশুনা করে। শিশুকে প্রাইমারী স্কুলে যাওয়ার আগে উপযোগী করে এই এক বছরে তৈরী করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ের পড়ালেখা এখানেই শেখানো হয়। এছাড়া তাকে নানা রকম আদব-কায়দা শেখানো হয় যেমন, বই-খাতা গুছিয়ে ব্যাগে ঢুকানো, কাপড়-চোপড় পরা, জুতা-মোজা পরা, ঠিক মতো বাথরুম করা, ডাইনিং টেবিলে বসা, খাওয়া-দাওয়া করা, হাত-মুখ ধোয়া, টিশু পেপার ব্যবহার করা, ময়লা-আবর্জনা সঠিক জায়গায় ফেলা ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রাইমারী স্কুল ঃ শিশুর বয়স যখন পাঁচ বছর হয় তখন সে প্রাইমারী স্কুলে যায়। এখানে সে পড়ালেখার পাশাপাশি আরো অনেক কিছু শেখে। তাদেরকে স্কুল থেকে মাঝেমধ্যে ট্রেনে করে দূরে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয় যেমন, চিড়িয়াখানা, বিভিন্ন রকম মিউজিয়াম, পাবলিক লাইব্রেরী ইত্যাদি। এসব স্কুল ট্রিপে শিশুদেরকে ট্রাফিক আইন-কানুন শেখানো হয় যে, কীভাবে রাস্তা পারাপার হবে, কোন লাইট জ্বললে কী করতে হবে ইত্যাদি।

আরো মজার বিষয় হচ্ছে যে, শিশুদেরকে ছোট বয়স থেকেই ফায়ার সার্ভিস এবং পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। তাদেরকে স্কুলের ফিল্ড ট্রিপে ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ফায়ারম্যান, ক্যাপ্টেন, ফায়ার ট্রাক ইত্যাদির সাথে সামনাসামনি পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। পুলিশদের প্রতি শিশুদের সবসময় এক প্রকার কৌতূহল থাকে, তাদের ধারণা পুলিশরা সাধারণ মানুষ নয়। তাই শিশুদেরকে পুলিশ অফিসারদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়, শিশুরা পুলিশদের প্রশ্ন করে নানা রকম কৌতূহল মিটায়, পুলিশদের সম্পর্কে তাদের অমূলক ভুল ধারণা থাকলেও তা ভেঙ্গে যায়, তারা পুলিশদেরকে বিপদের বন্ধু মনে করে।

এই বিষয়গুলো আমরা এই কারণে শেয়ার করলাম যে আমাদের দেশেও কি আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য এবং নতুন বাবা-মায়েদের জন্য সিস্টেমগুলো চালু করতে পারি না? সকলের উদ্যোগ থাকলে ইন্‌শাআল্লাহ শিঘ্রই বাংলাদেশে প্যারেন্টিং এর উপর সুন্দর সুন্দর ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।

প্যারেন্টিং অর্গানাইজেশনস এবং ইনষ্টিটিউটস

আমেরিকা, ক্যানাডা, ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া ও সিংগাপুরে প্যারেন্টিংয়ের বিষয়ে অনেক অর্গানাইজেশন এবং ইনষ্টিটিউট রয়েছে। প্যারেন্টিং হচ্ছে একটি সায়েন্স, পৃথিবীর বড় বড় ইউনিভার্সিটি এর উপর গবেষণা করে নানা রকম সমস্যার সমাধান বের করেছে এবং আজও এই গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। প্যারেন্টিং সায়েন্সের উপর বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট ডিগ্রিও দেয়া হয়।

আজকাল উন্নত দেশগুলোতে কিছু কিছু মুসলিম প্যারেন্টিং অর্গানাইজেশন এবং ইনষ্টিটিউটও হয়েছে। তবে অমুসলিম অর্গানাইজেশন এবং ইনষ্টিটিউটগুলো এই বিষয়ের উপর অধিক পারদর্শী এবং রিসোর্সে সমৃদ্ধশালী। আমরা যারা প্যারেন্ট তাদের উচিত হবে এই সকল অর্গানাইজেশন এবং ইনষ্টিটিউট থেকে জ্ঞান অর্জন করা এবং তার সাথে ইসলামিক কালচারকে সমন্নয় সাধন করে তা নিজেদের পরিবারে বাস্তবায়ন করা।

উন্নত দেশগুলোর টিভিতে প্যারেন্টিং-এর উপর নানা রকম প্রোগ্রাম বা টিভি শো দেখানো হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানগুলোতে প্যারেন্টিং-এর উপর বিশেষজ্ঞদের অতিথি হিসেবে আনা হয়। তারা প্যারেন্টদের নানা রকম প্রশ্নের উত্তর দেন। এছাড়া আরো কিছু লাইভ প্রোগ্রামও ধারণ করা হয় যা থেকে প্যারেন্টরা অনেক কিছু শিখতে পারে। যেমন, একটি পরিবারে তিনটি বাচ্চা আছে, তাদের মধ্যে একটি বাচ্চা অন্যরকম, একেবারেই মা-বাবার কথা শুনতে চায় না, পরিবারের সবাইকে অস্থির করে রাখে। একজন বিশেষজ্ঞ মহিলা ন্যানী (Nanny) এসে ঐ বাড়িতে কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ থাকে এবং ঐ বাচ্চার সাথে সময় কাটায়। একসময় দেখা যায় যে ঐ বাচ্চার মধ্যে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। এই প্রোগ্রামে হিডেন (লুকানো) ক্যামেরা দিয়ে ধারণ করা হয় বাচ্চার কাজকর্ম এবং ন্যানীর সাথে তার এই কয়দিনের সময় কাটানোর নানা রকম অভিজ্ঞতা।

অবাক করা কথা এই যে, অমুসলিমদের প্যারেন্টিং-এর অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, শিশু লালন-পালনের বেশীরভাগ বিষয়গুলোই ইসলামের সুন্নাহভিত্তিক। অমুসলিম বিশেষজ্ঞরা অনেক গবেষণা করে যা আবিষ্কার করেছেন তা ১৪শত বছর আগেই আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। নিম্নে কিছু মুসলিম প্যারেন্টিং-এর ওয়েবসাইট দেয়া হলো।

- http://www.effectiveislamicparenting.com/
- http://www.islamawareness.net/Parenting/
- http://www.soundvision.com/article/22-tips-for-parents-on-keeping-muslim-teens-muslim
- http://muslimmatters.org/2013/05/10/making-families-work-yasir-qadhi/
- http://www.muslimparentsnetwork.org/
- http://seekershub.org/home/courses/GEN140
- http://outstandingmuslimparents.com/
- http://outstandingmuslimparents.tv/
- http://theislamicmonthly.com/muslim-kids-are-more-difficult-to-raise-or-is-it-a-parenting-thing/
- http://islamic-world.net/parenting/parenting_tips.htm
- http://muslimommy.com/
- https://www.pinterest.com/parenthoodms/muslim-parenting-blogs/
- http://blog.islamiconlineuniversity.com/muslim-parenting-whats-and-hows/
- http://www.muslimfamilymatters.com/training/parenting
- http://www.patheos.com/blogs/altmuslim/2013/06/parenting-in-the-age-of-new-media-advice-for-muslim-parents/
- http://productivemuslim.com/luqman-parenting-lessons-part1/
- http://www.grandmajeddah.com/home-1.html
- http://www.salaam.co.uk/course/muslimfamily.php
- www.amanaparenting.com

প্যারেন্টিং-এর ছয়টি ধাপ

এই বইতে আমরা সন্তান প্রতিপালনের ৬টি ধাপ নিয়ে আলোচনা করেছি। একটি শিশুর জন্মের আগে মায়ের প্রস্তুতি থেকে শুরু করে সন্তানের জন্ম, তারপর লালন-পালন করে বড় করে বিয়ে-শাদী দেয়া পর্যন্ত সকল বিষয়গুলো এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

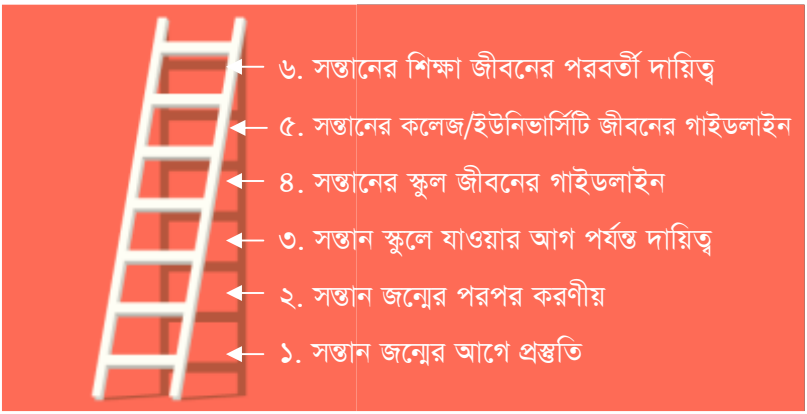

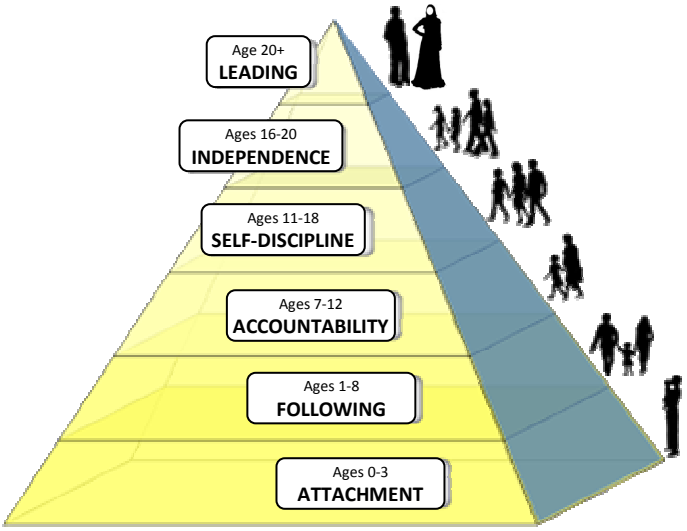

সন্তান জন্মের পূর্বে ও পরে

চ্যাপ্টার ২

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সন্তান জন্মের পূর্বে প্রস্তুতি এবং পরে করণীয়

যারা নতুন মা-বাবা হতে যাচ্ছেন তারা সাধারণত বাজার থেকে শিশুর নামের দুই একটা বই কেনেন কিন্তু শিশুর যত্ন বা লালন-পালন সংক্রান্ত বই কেনেন না। আলহামদুলিল্লাহ বাজারে শিশুর লালন-পালন সংক্রান্ত বেশ কিছু বই রয়েছে। এই বইগুলো গাইনি বিভাগের বা শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা লিখেছেন। আমরাও আমাদের সন্তানের জন্মের আগে সেই একই কাজ করেছি, এই ধরনের দুই- একটা বই কিনে নিয়েছি যা আমাদের অনেক কাজে লেগেছে। তবে এই বইগুলো শিশুর লালন-পালনের শুধু একটি দিক নিয়েই আলোচনা করেছে আর তা হচ্ছে মেডিক্যাল বিষয়গুলো। এই বইগুলোর প্রতিটি বিষয় যদি ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করে লেখা হতো তাহলে নতুন মা এবং বাবারা আরো বেশী উপকৃত হতো। কারণ একজন ডাক্তার যখন ইসলামের রেফারেন্স দিয়ে শিশুর সমস্যার সমাধান দিবেন তখন সেটা হবে পরিপূর্ণ সমাধান এবং মুসলিম পাঠক সেটা খুব গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করবেন। আমরা এই বইতে শিশুর লালন-পালনের বিষয়গুলো বিজ্ঞান ও ইসলামের সাথে সমন্বয়সাধণ করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

গর্ভবতী মায়ের পড়াশোনা

একটি শিশু এসে একটি নারীর জীবনকে ধন্য করে তোলে। একজন নারী আর এক জীবনে পদার্পণ করেন মাতৃস্নেহ নিয়ে। প্রকৃত মা সেই, যে সঠিকভাবে সন্তান প্রতিপালন করেন। মা হওয়ার জন্য কেবল জন্মদাত্রী হওয়াই যথেষ্ট নয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যখন একজন নারী প্রেগন্যান্ট হন তখন তিনি

এই বিষয়ের উপর কোন প্রকার পড়াশোনা করেন না। কিন্তু বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাপক। আমাদের দেশে প্রেগন্যান্ট মা শুধু খাওয়া-দাওয়া নিয়েই চিন্তিত থাকেন আর অন্য কোন বিষয় নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামান না। আমরা আগেই দেখেছি যে নর্থ-আমেরিকায় প্রেগন্যান্ট মহিলাদের জন্য নানা রকম কোর্স রয়েছে। এই বিষয়ের উপর বাজারে অনেক বই এবং ডিভিডি পাওয়া যায় যা প্রেগন্যান্ট হওয়ার আগ থেকেই পড়া ও দেখা শুরু করা উচিত। এছাড়া ইন্টারনেটে এ বিষয়ে প্রচুর সাইট রয়েছে যেখান থেকে ঘরে বসেও পড়াশোনা করা যেতে পারে। এতো গেল একজন সাধারণ মায়ের কথা।

কিন্তু একজন মুসলিম মায়ের দায়িত্ব অন্যান্য মায়েদের চেয়ে আরো অনেক বেশী। ঐসকল পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি আরো অতিরিক্ত পড়াশোনা করবেন কিভাবে তার সন্তানকে আদর্শ মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলবেন, কিভাবে তার সন্তানের অন্তরে সঠিক দ্বীনের আলো প্রবেশ করবে। সেজন্য প্রয়োজন ইসলামী শিশু সাহিত্য পড়া, আল কুরআনের তাফসীর পড়া, রসূল ﷺ-এর জীবনী পড়া, সাহাবাদের জীবনী পড়া। এছাড়া এখন প্রচুর ইসলামিক ডিভিডি পাওয়া যায় এবং ইন্টারনেট থেকেও আমরা অনেক ভিডিও দেখার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে পারি। প্রেগন্যান্ট অবস্থায় মায়েরা সাধারণত হাতে অনেক সময় পান বা চাকুরীরত মায়েরা সন্তান জন্মের পর সাধারণত বাসাতেই থাকেন। এই সময়ে মায়েরা ইসলামের উপর পড়াশুনা করে উপযুক্ত জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। এতে অনেক মানসিক শান্তিও পেতে পারেন।

মায়ের গর্ভে শিশুর শিক্ষা পর্ব

প্রত্যেক মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্য আকারে অবস্থান করে; অতঃপর পরবর্তী চল্লিশ দিন জমাট রক্তে পরিণত হয়; এরপর এমনিভাবে তা আরো চল্লিশ দিনের মধ্যে মাংসের টুকরায় পরিণত হয়; অতঃপর আল্লাহ একজন ফিরিশতাকে প্রেরণ করেন যাকে মানব শিশুটির ব্যাপারে চারটি বিষয় অর্থাৎ তার রিযিক, আয়ুষ্কাল, ভাগ্যের ভালো ও মন্দ সম্পর্কে লিখতে বলা হয়। এরপর উক্ত মানব ভ্রুনের মধ্যে আত্মা (জীবন) দিয়ে দেয়া হয়। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

মেডিক্যাল সায়েন্স বলে গর্ভবতী হওয়ার পর প্রথম মাসেই শিশুর হৃৎপিন্ড তৈরী হয় এবং গর্ভধারণের দেড় মাসের মধ্যে শিশুর হৃৎপিন্ড কাজ করতে শুরু করে। পরবর্তী দু'মাসের ভেতর তার হাত-পা এবং অন্যান্য অঙ্গসমূহ তৈরী হয়ে যায়।

তিন মাস পর থেকে সে ধীরে ধীরে বড় হতে শুরু করে এবং পাঁচ মাস বয়স থেকে সে শুনতে পায়। তাই তৃতীয় মাস থেকে মায়ের উচিত আস্তে আস্তে পড়ার পরিবর্তে জোরেজোরে কুর'আন হাদীস পড়া, সুন্দর করে শব্দ করে কুরআন তিলাওয়াত করা। পঞ্চম মাস থেকে গর্ভের সন্তানের সাথে একা একা কথা বলা যেতে পারে, তাকে ভালো ভালো কথা শুনানো যেতে পারে ইত্যাদি। যদি এটা প্রথম সন্তান হয় তবে গর্ভধারণের বিশ সপ্তাহ পর শিশুর প্রথম নড়াচড়া টের পাওয়া যায়। আর প্রথম গর্ভ না হয়ে যদি দ্বিতীয় বা তৃতীয় অথবা আরও পরবর্তী গর্ভ হয়, তাহলে গর্ভধারণের ষোল থেকে আঠারো সপ্তাহ পরপরই মা শিশুর নড়াচড়া টের পায়।

মায়ের গর্ভে সন্তান নাভীর মাধ্যমে খাদ্যগ্রহণ করে তিল তিল করে বড় হতে থাকে। তাই মায়ের চরিত্রের যথেষ্ট প্রভাব সন্তানের উপর পড়ে। কোন মা যদি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সলাতে নিয়মিত হয়ে না থাকেন, তাহলে এসময় থেকেই তাকে (পাঁচ ওয়াক্ত সলাতে) নিয়মিত হয়ে যাওয়া উচিত। মায়ের মধ্যে যেসকল দোষ-ত্রুটিগুলো রয়েছে সেগুলো এসময় থেকেই আস্তে আস্তে কমিয়ে নিয়ে আসা উচিত।

সন্তান জন্মের পূর্বে সতর্কতা

অতি দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাস্তবে দেখা গেছে যে প্রেগন্যান্ট মায়েরা নয় মাস দশ দিন (৪০ সপ্তাহ) সময় কাটায় অনৈসলামী কর্মকান্ড করেন। সন্তান আল্লাহ দিয়েছেন আমাদেরকে নিয়ামতস্বরূপ, এ জন্য আমাদের সবসময় মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার কথা কিন্তু আমরা করি তার উল্টোটা। আল্লাহ তা'আলা যে সকল কাজ হারাম করেছেন এবং যেসকল কাজ করা পছন্দ করেন না সেগুলো আমরা প্রেগন্যান্ট অবস্থায় করে থাকি। তখন অবসর সময় কাটানোর জন্য দেখা গেছে অনেক মায়েরাই রিমোট হাতে টিভির সামনে বসে সময় কাটায়, অশ্লীল নাচ, গান, সিরিয়াল, নাটক, হিন্দি সিনেমা, ইত্যাদি উপভোগ করে থাকেন।

আমরা যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখি যে, পেটে যে সন্তান আছে সে সবই শুনতে পায় এবং মায়ের কাজকর্ম বুঝতে পারে। একজন মা যদি ঠিক মতো পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করেন, এই সময় ভাল বই পড়েন, কুরআন তিলাওয়াত করেন, কুরআন তিলাওয়াত শুনেন, কুরআনের তরজমা শুনেন, হাদীস পড়েন, কুরআনের তাফসীর পড়েন, ইসলামিক লেকচার শুনেন এবং

দেখেন তাহলে সেই পেটের সন্তানের উপর কেমন শুভ প্রভাব পড়বে? আর তার ঠিক উল্টোটা যদি কোন মা করেন, ইসলাম যার অনুমোদন দেয় না তা করেন, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা করেন, নাবী মুহাম্মাদ ﷺ যা অপছন্দ করেন বা করতে নিষেধ করেছেন তা ঐ গর্ভবতী মা করেন, তাহলে তার পেটের সন্তানের উপর কী ধরনের প্রভাব পড়বে? একবার চিন্তা করি আল্লাহর দেয়া নিয়ামত পেটে নিয়ে আল্লাহর অপছন্দ সব কাজ করছি!

যিনি সন্তান দিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা এই সন্তান সুস্থ হবে নাকি অসুস্থ হবে? এই সন্তান শেষ পর্যন্ত জীবিত থাকবে নাকি মরে যাবে? এই সন্তান বোবা হবে নাকি বিকলাঙ্গ হবে? এ সকল কিছু নির্ভর করছে মহান সৃষ্টিকর্তার উপর। তিনি চাইলে কাউকে সন্তান দেন আবার কাউকে সন্তান দেন না, আবার কাউকে ছেলে দেন আবার কাউকে মেয়ে দেন। তাই আমাদের সবসময় সন্তানের বিষয়ে মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য চাওয়া উচিত, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, তাঁর পছন্দ মতো কাজকর্ম করা উচিত।

যদি নিজেকে কন্ট্রোল করা না যায় তাহলে বাসা থেকে TV'র dish অথবা cable-এর কানেকশন কেটে দেয়া উচিত। তাহলে মন চাইলেও অন্ততপক্ষে অশ্লীল নাচ, গান, সিরিয়াল, নাটক, হিন্দি সিনেমা ইত্যাদি হারাম কাজ থেকে দূরে থাকা যাবে।

সন্তান জন্মের আগে দু'আ

رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

রব্বি ইন্নি নাযারতু লাকা মা-ফী বাত্বনী মুহাররারান্ ফাতাক্বব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আন্তাসসামিউল 'আলীম।

হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমার গর্ভে যা রয়েছে, তা আমি মুক্ত করে (জন্মের পর) আপনার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম, সুতরাং আপনি আমা হতে তা গ্রহণ করুন, নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৫)

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

রব্বি হাবলী মিল্লাদুন্কা যুররিইয়াতান্ তয়্যিবাতান ইন্নাকা সামি'উদ দু'আয়ি।

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনার নিকট হতে পবিত্র সন্তান প্রদান করুন; নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী। (সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ ৩৮)

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

রব্বানা- হাবলানা মিন আযওয়া-জিনা- ওয়া যুররিইইয়া-তিনা-কুররতা আ'ইউনিওঁ ওয়াজ'আলনা- লিলমুত্তাক্বীনা ইমা-মা-।

হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন। (সূরা ফুরকান ২৫ ঃ ৭৪)

সন্তান জন্মের আগের নৈতিক দায়িত্ব

১. মা-বাবা উভয়ে উত্তম ও ভাল কাজের নিয়্যত করা।
২. মা-বাবা উভয়ে হালাল উপার্জন করা।
৩. মা-বাবা উভয়ে হালাল খাবার খাওয়া।
৪. ওয়াক্ত মতো দৈনিক পাঁচ সলাত আদায় করা।
৫. সম্ভব হলে মাঝে মাঝে তাহাজ্জুদ সলাত আদায় করা।
৬. সলাতের পর তাসবীহ পাঠ করা।
৭. দু'জনেই খুব বেশীবেশী ভাল কাজ করা।
৮. প্রতিদিন আল-কুরআন অর্থসহ তিলাওয়াত করতে চেষ্টা করা।
৯. নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত শুনা।
১০. ইসলামের উপর অন্যান্য বই অধ্যয়ন করা।
১১. মানুষের সাথে আরো বেশী ভালো আচরণ করা।
১২. গরীবদের মাঝে দান-সদাকা করা।
১৩. গীবত বা পরনিন্দা, কুৎসা রটনা, অহংকার ও দাম্ভিকতাপূর্ণ অসুন্দর বা খারাপ কথা বলা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা।
১৪. টিভি/ইন্টারনেটে অশ্লীল নাচ, গান, সিরিয়াল, নাটক, সিনেমা না দেখা।

সন্তান জন্মের আগের স্বাস্থ্যগত দায়িত্ব

১. ডাক্তার দ্বারা নিয়মিত চেকআপ করানোর চেষ্টা করা।
২. গর্ভবতীর উপর কোন প্রকার মানসিক বা দৈহিক চাপ সৃষ্টি না করা।

৩. পারিবারিক কলহ থেকে দূরে থাকা।
৪. সবার সাথে হাসি-খুশীভাবে কথা বলা।
৫. নিজের বাচ্চাদের মারধর না করা, তাদের সাথে ভাল আচরণ করা।
৬. মাঝেমধ্যে চিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যে বাইরে কোথাও বেড়াতে যাওয়া।
৭. প্রতিদিন অবশ্যই গোসল করা এবং এবং শরীরের প্রতি যত্ন নেয়া।
৮. সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা।
৯. এ সময় বেশীবেশী পানি পান করা।
১০. গর্ভাবস্থায় সব সময় ঢিলাঢালা পোশাক পরা।
১১. ঝগড়া-ঝাটি না করা, কাউকে গালাগালি না করা।
১২. রাগ কমিয়ে হাসিখুশী থাকার চেষ্টা করা।

সন্তান জন্মের পরপর দায়িত্ব

১. সন্তানের ভাল নাম রাখা (সুন্দর অর্থ দেখে)।
২. সন্তানের মর্যাদা রক্ষা করা।
৩. সঠিক উপায়ে সন্তান লালন-পালন করা।
৪. সন্তানের সাথে সুন্দর আচরণ করা।
৫. সন্তানকে স্নেহ ও ভালবাসা দেয়া।
৬. সন্তানকে উত্তম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া।
৭. বিবাহযোগ্য হলে সন্তানকে উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রীর নিকট বিবাহ দেয়া।

সন্তান জন্মের পর প্রথম দিনের দায়িত্ব

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে অন্য কোন কথা বা শব্দ শিশুর কানে প্রবেশ করার পূর্বেই তার কানে আল্লাহর নাম প্রবেশ করানো উত্তম। তারপর যা করণীয় তা হলো ঃ

১. গোসল দেয়া ঃ নবজাতক শিশুকে আপনজন বা নার্স বিসমিল্লাহ পড়তে পড়তে হালকা গরম পানি দ্বারা গোসল দিয়ে গা, হাত, পা মুছে কাঁথা বা তোয়ালে বা নরম কাপড় দ্বারা আবৃত করে কোলে নিতে হবে।

২. আযান শোনানো ঃ নবজাতক সন্তান ছেলে হোক আর মেয়ে হোক উভয়ের ক্ষেত্রেই ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ডান কানে আযান বলা সুন্নাত। এই সময় আযান মসজিদের মুয়াজ্জিনের মতো সুর করে জোরে জোরে দিতে হবে না, আযানের

প্রতিটি শব্দ তার কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করে বললেই হবে।

"আবু রাফে ﷺ বলেন, ফাতিমা ﷺ হাসান ইবনে আলী ﷺ-কে প্রসব করলে আমি রসূলুলাহ ﷺ -কে হাসানের কানে সলাতের আযানের অনুরূপ আযান দিতে দেখেছি।" (জামে আত-তিরমিযী, আবু দাউদ)

৩. তাহনীক করা ঃ ভূমিষ্ট শিশুর মাতা সামান্য কোন মিষ্টি দ্রব্য চিবিয়ে রস বের করে শিশুকে মুখের লালার সাথে মিশ্রিত করে তা আঙ্গুল দ্বারা মুখের ভেতর জিহ্বার তালুতে লাগিয়ে দেয়া সুন্নাহ। (সহীহ বুখারী) তবে যাদের মুখে অসুখ রয়েছে বা যারা পান-সিগারেট খান তাদের এই কাজটি করা উচিত নয়।

৪. দুধপান করানো ঃ সন্তানের জন্য মায়ের পক্ষ থেকে প্রথম উপহার হলো মায়ের দুধ। এটি ভূমিষ্ঠ হওয়া সন্তানের জন্য পরিপূর্ণ খাদ্য। এতে আল্লাহ তা'আলা শিশুর যা প্রয়োজন তার সকল উপাদান দিয়ে দিয়েছেন। আজকাল কিছু কিছু মায়েরা অনেক খোঁড়া যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে শিশুকে এ দুধ পান করা থেকে বঞ্চিত করে থাকেন অর্থাৎ এখান থেকেই শুরু হয় মায়ের দ্বারা সন্তানের অধিকার হরণ। অথচ একটু চিন্তা করা উচিত– মায়ের স্তনে এ দুধ কে দিল? কেন দিল? কেন এ সময়ে দিল? কেন মায়ের স্তনে ন্যাচারালি অন্য সময়ে দুধ আসে না ইত্যাদি। সুতরাং বিষয়টি পরিষ্কার, এমন মায়েদের আচরণে লংঘিত হচ্ছে ঃ ক) সন্তানের অধিকার। খ) মহান আল্লাহ তা'আলার আদেশ।

সন্তান জন্মের পর সপ্তম দিনের দায়িত্ব

১. উত্তম নাম রাখা ঃ সন্তান পুত্র বা কন্যা যাই হোক না কেন তাদের উত্তম ও সুন্দর অর্থবোধক নাম থাকা বাঞ্ছনীয়। এটি মা-বাবার কাছে সন্তানের হক। মুসলিম নামের বই বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। এছাড়া ইন্টারনেটে সার্চ দিলেই শত শত নামের লিস্ট পাওয়া যাবে। সেখান থেকে বাছাই করে একটি সুন্দর অর্থবহ নাম রাখা উচিত। খুব ভালো হয় যে, কিছু নাম পছন্দ করে কোনো যোগ্য আলেমের কাছ থেকে যাচাই করে নেয়া। কারণ অনেক সময় অনলাইনে সঠিক তথ্য নাও থাকতে পারে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন তোমাদের ডাকা হবে তোমাদের স্ব-স্ব নাম ও বাবার নামসহ। অতএব তোমরা ভাল নাম রাখবে। (আবু দাউদ)

২. মাথার চুল কাটা ঃ সপ্তম দিনে শিশুর মাথার চুল কামিয়ে (মুণ্ডন) দেয়া শিশুর অধিকার। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম) আলী ইবনে আবু তালিব ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল ﷺ একটি ছাগল দিয়ে হাসানের আকীকা করেন এবং বলেন ঃ হে ফাতিমা! তার মাথা কামাও এবং তার চুলের ওজনের সমপরিমাণ রূপা দান কর। তদানুযায়ী আমি তার চুল ওজন করলাম এবং তার ওজন এক দিরহাম বা তার কাছাকাছি হল। (জামে আত-তিরমিযী)

কোন কোন ডাক্তার শিশুর মাথার চুল কামাতে নিষেধ করেন। যদিও মেডিকেল সায়েন্স অনুযায়ী এর কোন জোড়ালো ক্ষতিকারক কারণ নেই। যেসব ডাক্তারের ইসলামের সঠিক জ্ঞান নেই তারা হয়ত এই সুন্নাহ পালনে গুরুত্ব দেন না। চুল ছেটে দেয়ার ফলে শিশুর দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ এবং চিন্তা শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

৩. আকীকা করা ঃ নবজাতক সন্তান ছেলে হলে দু'টি ছাগল অথবা ভেড়া আর কন্যা হলে একটি ছাগল অথবা ভেড়া তার নামানুসারে যবেহ করা উত্তম। আকীকা করতে হয় সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে, সেদিন সম্ভব না হলে ১৪তম দিনে এবং সেটিও সম্ভব না হলে ২১তম দিনে আকীকা দিতে হবে। এই কুরবানী আল্লাহর হক। অর্থাৎ সন্তান হয়েছে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পশু কুরবানী দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। আকীকার জন্য অনুষ্ঠান করে সেই মাংস রান্না করে আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং গরীব-দুঃখীদের খাওয়ানো যেতে পারে। আর অনুষ্ঠান করতে না চাইলে ঐ মাংস আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং গরীব-দুখীদের মাঝে বিতরণ করে দেয়া যেতে পারে।

রসূল ﷺ বলেছেন ঃ ছেলেদের আকীকা কর অর্থাৎ তার পক্ষ থেকে কুরবানীর মাধ্যমে রক্ত বইতে দাও; এবং কষ্টদায়ক বস্তু (মাথার চুল) মুন্ডন করে দাও। (সহীহ বুখারী)

আকীকা প্রসঙ্গে রসূল ﷺ বলেছেন ঃ পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে সমবয়সী দু'টি ছাগল এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি ছাগল আকীকা দাও। (জামে আত-তিরমিযী)

ছেলে সন্তানের মুসলমানি (খতনা) কখন করাবো?

ছেলে সন্তানকে মুসলমানি করানো সুন্নাহ। রসূল ﷺ হাসান ও হুসাইন উভয়ের আকীকা ও খতনা সপ্তম দিনে করেছিলেন। (বায়হাকী) অবশ্যই এই কাজটি ভাল ডাক্তার দিয়ে হসপিটাল বা ক্লিনিকে নিয়ে করাতে হবে। উন্নত দেশে

ছেলের মুসলমানি জন্মের কিছু দিনের মধ্যে হসপিটালে ডাক্তাররা করিয়ে দেন। উন্নত দেশের অমুসলিমরাও মুসলমানি করায় স্বাস্থ্যগত উপকারিতার জন্য। আমাদের দেশে একটি অনৈসলামী প্রথা প্রচলন আছে যে, মুসলমানির অনুষ্ঠান করা এবং সবাইকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো ও উপহার গ্রহণ করা। এই ধরনের কোন অনুষ্ঠান বা নিয়ম ইসলামে নেই। আমরা না জানার কারণে আকীকা করি না কিন্তু মুসলমানির অনুষ্ঠান করি, অর্থাৎ যেটা করার কথা সেটা করি না কিন্তু যেটা করার কথা না সেটা করি।

কেউ কেউ মনে করতে পারে যে, ছেলেকে মুসলমানি করালে সে ঐ দিন থেকে মুসলিম হয়। এই ধারণা ঠিক না। প্রতিটি শিশু মুসলিম হয়েই জন্মগ্রহণ করে, এমনকি সে হিন্দু বা খৃষ্টানের ঘরে জন্ম নিলেও। পরবর্তীতে তার মা-বাবা ঐ শিশুকে হিন্দু, খৃষ্টান বা নাস্তিক বানায়। (এই কথাগুলি রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সহীহ হাদীসে আছে।)

ভূমিষ্ট শিশু কি রাতে জেগে থাকে আর দিনে ঘুমায়?

অনেক শিশু জন্মের পর রাতে জেগে থাকে আর দিনে ঘুমায়। আবার অনেক শিশু সাধারণ নিয়মেই রাতে ঘুমায় এবং দিনে জেগে থাকে বা ঘুমায়। যে সকল শিশু রাতে জেগে থাকে তাদের মা এবং বাবাদের জন্য খুবই কষ্ট। আর বাবার যদি সকালে অফিস থাকে তা হলে তো আরো কষ্ট। এই বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে হবে, শিশুর প্রতি বিরক্ত হওয়া যাবে না, তাকে নিয়ে আজেবাজে মন্তব্য করা যাবে না। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে, যেন তিনি সব কিছু সহজ করে দেন। এই অভ্যাস কোন পদ্ধতির মাধ্যমে সাধারণত পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, কারণ এটি ঐ শিশুর জন্য স্বাভাবিক। শিশুর বয়স যখন ৬ মাস বা তার বেশী হবে তখন দিনের বেলা তাকে কিছু সময়ের জন্য জাগিয়ে রেখে রাতে ঘুমানোর অভ্যাস করাতে হবে।

ভূমিষ্ট শিশু নিয়ে কুসংস্কার মুক্ত থাকা

সন্তান জন্ম নিয়ে আমাদের দেশে অনেক কুসংস্কার প্রচলিত আছে। এই সকল কুসংস্কার থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে এবং অন্যদেরকে বুঝাতে হবে। কারণ অনেক কুসংস্কার শিরকে পরিণত হয়ে যায় যা আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। গ্রামাঞ্চলে এখনো প্রচলিত আছে যে প্রেগন্যান্ট মাকে নিজ ঘর থেকে আলাদা করে দেয়া হয়, তাকে নিম্নমানের একটি আলাদা ঘরে রাখা হয়,

তার থেকে বাড়ির মানুষজন দূরে দূরে থাকে, তার ঘরে গেলে ক্ষতি হতে পারে এমন মনে করে। এগুলো সবই ইসলামবিরোধী। একটি শিশু যখন ভূমিষ্ট হয় তখন সে এক জগত থেকে অন্য জগতে আসে, তার পরিবেশ পরিপূর্ণভাবে পরিবর্তন হয়ে যায়, সেজন্য তার নানা রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। অনেকে শিশুর কোন বিষয়ে একটু এদিকসেদিক দেখলেই বলে ফেলে যে তাকে জ্বীনে ধরেছে। এই ধারণা করা ঠিক না বরং অতিসত্বর শিশুকে ডাক্তার দেখাতে হবে, এবং কোন কবিরাজের বা কোন মৌলভীর নিকট যাওয়া অনুচিৎ। ওরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ওরা চিকিৎসার কিছুই জানে না।

শিশু সন্তানকে শিরক থেকে মুক্ত রাখা

তারপর সন্তান জন্ম হলে তার কপালে কালো টিপ দেয়া হয়, পায়ে কালো টিপ দেয়া হয়, এগুলোও কুসংস্কার, এগুলো করা গুনাহর কাজ। অনেকে কথায় কথায় বলে থাকে শিশুরা হচ্ছে ফিরিশতা। এই ধরনের কথাও ঠিক না। শিশুরা হচ্ছে মানুষ, তারা ফিরিশতা হতে পারে না। তবে হ্যাঁ, তারা নিষ্পাপ। কিন্তু তারা ফিরিশতাদের মতো নিষ্পাপ এই কথা বলাও ঠিক না। ফিরিশতাদের জায়গায় ফিরিশতারা এবং মানুষের জায়গায় মানুষ, এই দু'টি আল্লাহর আলাদা আলাদা সৃষ্টি, কারো সাথে কারো তুলনা করা ঠিক না। মনে রাখা প্রয়োজন যে মানুষের সৃষ্টি মাটি থেকে কিন্তু ফিরিশতাদের সৃষ্টি নূর থেকে।

আরো একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। কেউ কেউ সন্তানের গলায় তাবিজ ঝুলিয়ে দেয় সন্তানকে জিন-ভূত থেকে রক্ষা করার জন্য বা কোন বদ নজর থেকে দূরে রাখার জন্য। মনে রাখতে হবে যে কোন ধরনের তাবিজ শরীরে ঝুলানো শিরক এমনকি যদিও সেটি কোন মাওলানা থেকে কুরআনের আয়াত দিয়ে লেখা তাবিজও হয়। শিশুর শরীরে কোন প্রকার কালো সূতা বা কড়ি ঝুলানো যাবে না। এমনকি কুরআনের আয়াতসহ স্বর্ণের বা অন্য কোন ধাতব পর্দাথের লকেট গলায় ঝুলানো যাবে না। এগুলো সুস্পষ্ট গুনাহর কাজ।

শিশুর লালন-পালনে দাদী-নানীর অবদান

আমাদের দেশে অনেক পরিবারেই দেখা যায় সন্তান নানীর বাড়িতে ভূমিষ্ট হয়, নানী বেশ কিছুদিন শিশুকে লালন-পালন করে তারপর মেয়ের স্বামীর বাড়িতে পাঠান। আবার যারা নিজ মায়ের বাড়িতে না যান তাদের শিশুকে দাদীই প্রাথমিক লালন-পালন করেন। এই ক্ষেত্রে নানী-দাদীর অবদান অনেক যার

কোন তুলনা হয় না। সাধারণত দাদী-নানীরা বয়স্ক হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে আধুনিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থাকে, এছাড়া তাদের মধ্যে থাকে আমাদের দেশের প্রচলিত কিছু কুসংস্কার। আবার অনেকেরই আধুনিক মেডিক্যাল সায়েন্স সম্পর্কে ধারণা থাকে না। যার কারণে তারা তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকেই শিশুকে লালন-পালন করেন। শিশুর এই লালন-পালনের ক্ষেত্রে তাদের কিছু ভুলত্রুটি থাকতে পারে যা মেডিক্যাল সায়েন্স অনুমোদন করে না বা ইসলামও অনুমোদন করে না। তাই আগে থাকতেই এই বিষয়ে শিশুর মা এবং বাবা দু'জনকেই পড়ালেখা করে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে নিতে হবে।

মা বা শাশুড়ী কোন ভুল উপায়ে শিশুর পরিচর্যা করলে তাকে সুন্দর করে বুঝিয়ে বলতে হবে, তিনি যেন মনে কোন প্রকার কষ্ট না পান। মনে রাখতে হবে এই মা বা শাশুড়ীই কিন্তু আমাদের শিশুকালে লালন-পালন করে বড় করেছেন। যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে অনেক কিছু আবিস্কার হয়েছে যা আগের মানুষরা জানতো না। তাদেরকে সুন্দরভাবে জানাতে হবে। ইসলাম কুসংস্কার অনুমোদন করে না, অনেক কুসংস্কারই শিরকের অন্তর্ভুক্ত। দাদী-নানীরা শিশুকে অনেক সময় ভুল ইসলামী শিক্ষা দেন সে বিষয়েও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। তবে তাদের সাথে কোন প্রকার খারাপ আচরণ করা যাবে না যাতে তারা মনে কষ্ট পান, কারণ তারা শিশুকে খুবই ভালবাসেন এবং তাদের ভালবাসার অংশ হিসেবেই তারা শিশুকে লালন-পালন করেন।

এবার আসি নানা এবং দাদার কথায়। শিশু যখন হাঁটতে শিখে, বুঝতে শিখে তখন তারা নানা-নানী এবং দাদা-দাদীদেরকে খুব পছন্দ করে, তাদের সাথে যথেষ্ট সময় কাটায়। শিশুর শৈশব কাটে নানা-নানী এবং দাদা-দাদীর সাথে। সেজন্য একটি শিশুর প্রাথমিক লালন-পালন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে মা-বাবার পাশাপাশি নানা-নানী এবং দাদা-দাদী এই চারজনের ভূমিকাও কম নয়। তাই মা-বাবার পাশাপাশি নানা-নানী এবং দাদা-দাদীরও সঠিক জ্ঞান অর্জন এবং সঠিক ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজন। এজন্য আমরা তাদেরকে ডিভিও ডকুমেন্টারী এবং লেকচার দেখাতে এবং শুনাতে পারি। যারা ধৈর্যসহকারে বই পড়তে পারেন তাদেরকে এই বিষয়ে নানা রকম বইও কিনে দিতে পারি। তাদের সাথে শিশুর নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনাও করতে পারি। তবে আমাদের নিজেদেরই যদি সঠিক ইসলামের জ্ঞান না থাকে তাহলে কীভাবে বুঝবো যে কোনটি সঠিক আর কোনটি সঠিক নয়? তাই নানা-দাদার পাশাপাশি নিজেদেরও সঠিক ইসলামী জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

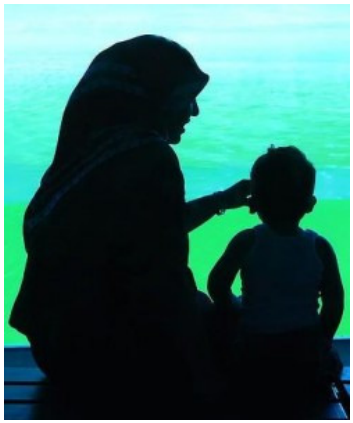

শিশুর লালন-পালন এবং শিশুর শিক্ষা

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবারের লোকদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। (সূরা আত তাহরীম ঃ ৬)

চ্যাপটার ৩

শিশুর বেড়ে উঠা এবং ক্রমবিকাশ

১ থেকে ৬ মাস বয়স পর্যন্ত

এক মাস বয়সের শিশু শব্দ শুনলে চমকে উঠে এবং কোন কিছুর দিকে নির্দিষ্টভাবে তাকায়। ২ মাসের সময় কাৎ করে শুইয়ে দিলে চিৎ হতে পারে এবং মানুষের গলার শব্দে আনন্দ বা দুঃখ পায়। ৩ মাসের সময় উপুড় অবস্থায় মাথা ও ঘাড় তোলে, শব্দের উৎস খোঁজে এবং হাসির জবাবে হাসি দিতে চেষ্টা করে। ৪ মাসের সময় কোন জিনিস দেখলে তার দিকে হাত বাড়ায়, পরিচিত চেহারা এবং গলার স্বর চিনতে পারে। ৫ মাসের সময় দু'হাত ধরে টানলে উঠে বসে এবং আয়নায় নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে কথা বলতে চায়। ৬ মাসের সময় স্বল্প অবলম্বনে বসতে পারে এবং কথা বলতে চেষ্টা করে।

৭ থেকে ১২ মাস বয়স পর্যন্ত

৭ মাসের সময় দু'হাতে খেলনা ধরতে পারে এবং কোন কিছু পড়ে গেলে তা অনুসরণ করে। ৮ মাসের সময় হামাগুড়ি দেয় এবং লুকোচুরি খেলতে পছন্দ করে। ৯ মাসের সময় ধরে দাঁড়াতে পারে এবং কারো মুখে শোনা ছন্দ বা সংকেত অনুকরণ করে। ১০ মাসের সময় কাউকে ধরে হাঁটতে পারে এবং একাধিক শব্দ উচ্চারণ করে। ১১ মাসের সময় হাঁটু গেড়ে বসে কোন কিছু অবলম্বন করে মাটি থেকে খেলনা তুলতে পারে এবং বাবা, মামা, দাদা ইত্যাদি শব্দ বলতে চেষ্টা করে। ১২ মাসের সময় বেয়ে বেয়ে উঠানামা করতে পারে, হাততালি দেয় এবং দু' তিনটা শব্দ বুঝতে ও বলতে পারে।

২ থেকে ৩ বছর বয়স পর্যন্ত

২৪ মাসের মধ্যে শিশুরা দুই তিনটা জিনিসের মধ্যে থেকে তার পছন্দের জিনিসটা খুঁজে বের করতে পারে। দুই বছর বয়সে একটি শিশু ৫০টির মতো শব্দ শিখে ফেলে। যখন সে প্রথম কথা বলতে শিখে তখন দু'টি অথবা তিনটি শব্দের বাক্য তৈরী করতে পারে, যেমন ঃ আরো চাই, উঠো, চলো, বাইরে যাবো, খাবো না ইত্যাদি। চব্বিশ মাসের সময় তারা দৌড়াতে পারে, বলে লাথি দিতে পারে। তিন বছর বয়সে ৩০০ পর্যন্ত শব্দ মনে রাখতে পারে।

৪ থেকে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত

এই বয়সে বিভিন্ন রংয়ের নাম শিখে, সাধারণ গুনতে পারে এবং সময় বুঝতে পারে। চার বছর বয়সে গিয়ে ১৫০০ পর্যন্ত শব্দ মনে রাখতে পারে এবং পাঁচ বছর বয়সে গিয়ে ২৫০০ শব্দ পর্যন্ত মনে রাখতে পারে। এই শব্দগুলো দিয়েই সে কথা বলে, বাক্য তৈরী করে। এই সময়ে ছবি আঁকতে পারে। এই বয়সে আল্লাহকে চিনে, পরিবারের মর্ম বুঝে, অন্যদের সাথে খেলতে পছন্দ করে। কিছু কিছু সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে।

৭ থেকে ৯ বছর বয়স পর্যন্ত

এই বয়স থেকে তারা কে ছেলে আর কে মেয়ে তা বুঝতে পারে। ছেলেরা ছেলেদের সাথে এবং মেয়েরা মেয়েদের সাথে খেলতে পছন্দ করে। এই বয়সে মনের মধ্যে নানা ধরনের প্রশ্নের উদয় হয়। এই বয়সে যে যার কালচার বুঝে। এই বয়সে তাদের মধ্যে মানসিক অনুভূতিও জন্ম নেয়।

১০ থেকে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত

এই বয়সে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। এই বয়সেই ছেলেমেয়েরা সাধারণত বালেগ হয়ে থাকে। এই বয়সে তারা মানসিক দুঃখ এবং আনন্দ অনুভব করে। ব্যক্তিগত বিষয়গুলো কিছুটা বুঝতে থাকে। তারা বড়দের মতো চিন্তা করে কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এ সময় তারা নানা রকম মানসিক বিষন্নতায়ও ভুগে থাকে।

১ বছর ২ বছর ৩ বছর ৪ বছর ৫ বছর ৬ বছর ৭ বছর

নিম্নে আমরা শিশুর লালন-পালন এবং শিশু শিক্ষার উপর কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

শিশুকে ঘুম পাড়ানো ঃ অনেক মায়েরা শিশুকে যখন ঘুম পাড়ান তখন আজেবাজে কবিতা এবং গান গেয়ে ঘুম পাড়ান যেগুলোর কোন সুন্দর অর্থ হয় না। যেমন আয় আয় চাঁদ মামা শিশুর কপালে টিপ দিয়ে যা অথবা আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাঝে অথবা হাট্টিমাটিম টিম তারা মাঠে পাড়ে ডিম তাদের খাড়া দুটো শিং ইত্যাদি। সর্বপ্রথমে আমাদের উচিত শিশুর ঘুমের জন্য দু'আ বলা জোরে জোরে যা শিশু শুনতে পায়, তারপর তাকে আল্লাহর প্রশংসামূলক গান গেয়ে ঘুম পাড়ানো যেতে পারে যা শুনে শিশু উপকৃত হবে, এবং শিশুর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে। এছাড়া কুরআন থেকে ছোট ছোট সূরা এবং অন্যান্য দু'আও তাকে শুনানো যেতে পারে। এভাবে একদিন দেখা যাবে ছোট ছোট সূরা এবং দু'আগুলো তার মুখস্থ হয়ে গেছে।

শিশুর সাথে কথা বলা ঃ যে শিশু এখনো কথা বলতে পারে না তার সাথেও কথা বলা উচিত। সে কথা বলতে না পারলেও ঠিকই শুনতে পারে। তাকে এখন যা ভাল ভাল কথা শুনানো হবে এর প্রভাব তার মধ্যে পড়বে। তাই শিশুর সাথে কুরআন হাদীস থেকে সুন্দর সুন্দর কথা বলা উচিত।

শিশুকে গল্প বলা ঃ আমাদের দেশে দাদী-নানীরা নাতী-নাতনীর সাথে নানা রকম গল্প করে থাকেন। কিন্তু তারা সাধারণত শিশুদের সাথে রাজা-রানী, রাজকুমারী, রাজপুত্র আর রাক্ষসের গল্প করে থাকেন যার সাথে বাস্তবের কোন সম্পর্কে নেই। এগুলো সবই বানানো গল্প, শিশুদের এসব না বলাই ভালো। এই ধরনের রূপকথার গল্প থেকে আমাদের দূরে থাকা উচিত।

শিশুদের বই কিনে দেয়া ঃ শিশুদের সাথে ভূত প্রেতের গল্প বলা ঠিক নয়। অনেক মা-বাবারা শিশুদের ভূত-পেতনীর গল্পের বই কিনে দেন যা মোটেও ঠিক না। এই সকল আজগুবি বই-পত্র থেকে সন্তানদেরকে দূরে রাখতে হবে। আজকাল বাজারে শিশুদের ইসলামী শিক্ষামূলক এবং জেনারেল নলেজভিত্তিক অনেক বই পাওয়া যায়। আমাদের শিশুদের এই ধরনের বই কিনে দেয়া উচিত এবং তাদেরকে সাথে নিয়ে পড়া উচিত। শিশুরা দেখে দেখে শেখে বেশি। আমরা যদি চাই আমাদের সন্তান বই পড়ুক তাহলে আমাদেরকেও বই পড়তে হবে তাদের সামনে।

শিশুর সাথে খেলাধুলা করা ঃ খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুদের মানসিক এবং শারীরিক বৃদ্ধি হয়ে থাকে। তাই তাদের খেলার সুযোগ করে দিতেই হবে। মা-বাবার উচিত শিশুদের সাথে খেলাধুলা করা, সামর্থ অনুযায়ী তাদেরকে খেলাধুলার সামগ্রী কিনে দেয়া উচিত। আজকাল বাজারে অনেক প্রকার খেলনা পাওয়া যায় যা শিশুর মানসিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। অধিকাংশ মা-বাবাদের প্রশ্ন এই যে, কোন বয়সের বাচ্চার জন্য কোন ধরনের খেলনা দেবো? এছাড়াও অনেক মা-বাবা আছেন যে, বাচ্চা পছন্দ করলেই খেলনা কিনে দেন। কিন্তু হতে পারে ঐ খেলনার গায়ে উপযোগি বয়স লিখাই আছে। তারা সেটা মানতে চান না। তাতে একটু পরে বাচ্চাও আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং পয়সাও নষ্ট হয়। ওদিকে চকিং হ্যাজার্ড (choking hazard) তো আছেই। তাই মা-বাবাদের উচিত বাচ্চার বয়স অনুযায়ী খেলনা কিনে দেয়া। আরও একটি বিষয় হচ্ছে শিশুদেরকে শুধু কোলে কোলে না রেখে তাদেরকে ধুলা-বালি-মাটি-কাদার সাথে মিশতে দেয়া। প্রাকৃতিক জিনিস দিয়ে তাদেরকে খেলতে দেয়া উচিত।

শিশুকে টিভির সামনে বসিয়ে দিয়ে আবদ্ধ/অকেজো (engaged) না রাখা ঃ কোন কোন শিশুর মা নিজে হয়তো কারো সাথে ফোনে গল্প করছেন অথবা কোন একটা কাজ করছেন তখন শিশুকে নিজের থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য টিভি ছেড়ে দিয়ে তার সামনে বসিয়ে দেন। শিশুকে একটা আপদ মনে করেন। এতে ধীরে ধীরে এক সময় শিশু টিভিতে আসক্ত হয়ে যায়। তারপর থেকে মা যখনই সুযোগ পান শিশুর যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে এই সহজ কাজটি প্রায় প্রতিদিনই করে থাকেন। তিনি জানেন না তিনি শিশুর কতবড় ক্ষতি করছেন। আজকাল অহরহই বাড়িতে বা গাড়িতে দেখা যায় ছোটছোট শিশুদের হাতে একটা video game ধরিয়ে দিয়ে মা-বাবা গল্পে মত্ত। এতে কথা বলার

সুযোগ হারিয়ে শিশুরা অসামাজিক (unsocial) এবং অন্তর্মুখী (introvert) হয়ে পড়ে।

টিভি ছেড়ে শিশুকে খাওয়ানো ঃ প্রায় মায়েরাই শিশুকে খাওয়ানোর জন্য একটি পদ্ধতির আশ্রয় নেয় আর তা হচ্ছে শিশুর সামনে টিভি ছেড়ে দিয়ে তাকে ঐ দিকে তার দৃষ্টির মনোযোগ দিয়ে তাকে আহার করান। এই কাজটি করা উচিত নয় কারণ খাবারের প্রতি মনোযোগ দিয়ে খাবার না খেলে সেই খাবার তেমন একটা কাজে লাগে না। আরও ক্ষতিকারক বিষয় হচ্ছে যখন মায়েরা এই শিশুর সামনে হিন্দি-বাংলা নাচ-গান ছেড়ে দিয়ে কাজটি করেন। আমরা কি একবার ভেবে দেখেছি যে আমরা নিজ সন্তানের কতবড় ক্ষতি করছি?

শিশুর সঙ্গী কে হবে? বড়দের যেমন সঙ্গ প্রয়োজন তেমনি শিশুরও সঙ্গ প্রয়োজন। তাকে শুধু বড়দের কোলে কোলে বা স্ট্রোলারে করে না রাখা। যদি এমনটি করা হয় তাহলে সে বড়দের মাঝে থাকতে থাকতে একসময় একমুখি হয়ে যায়, জেদী হয়ে যায়, অন্য শিশুদের পছন্দ করে না, তাদের সাথে মিশতে চায় না, ভয় পায়। এতে তার ব্রেইন ডেভেলপ করে না সে অসামাজিক হয়ে পড়ে। তাই অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে তাকে মেলামেশা করতে দেয়া উচিত।

শিশুর প্রশ্নের জবাব দেয়া ঃ শিশুরা যখন কথা বলতে শিখে তখন তারা নানা রকম প্রশ্ন করে। একই প্রশ্ন হয়তো বার বার করে, হয়তো খুবই সহজ প্রশ্ন করে, হয়তো খুব কঠিন প্রশ্ন করে, হয়তো বড়দের মতো প্রশ্ন করে। এতে কিছুতেই বিরক্ত হওয়া যাবে না। তাদের প্রশ্নকে গুরুত্ব দিয়ে তার উত্তর দিতে হবে। বাচ্চাদের কথার উত্তর ঠিকমতো না দিয়ে এটাসেটা বলে তাকে প্রবোধ দেয়া ঠিক না। একটু বড় শিশু যারা কিছুটা বুঝে তারা আরো স্পর্শকাতর। তাদের প্রশ্নের উত্তর ঠিক মতো জানা না থাকলে ধামাচাপা দিয়ে বা দায়সারা গোছের কথা বলা উচিত নয়। হয়তো বলা যেতে পারে, "আমি জেনে নিয়ে পরে তোমাকে জানাব", এবং সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে হবে। শিশুরা কোন প্রশ্ন করে যেন অবহেলিত না হয় সেদিকে রক্ষ্য রাখতে হবে।

একটা সত্য ঘটনা উল্লেখ করা যাক। একজন বাবা চেষ্টা করেন তার জমজ সন্তানদ্বয়কে সঠিক নির্দেশনায় গড়তে। তো, একদিন তারা আত্মীয়-স্বজনসহ দীর্ঘ ভ্রমণে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একজন আত্মীয় উক্ত বাবাকে বলেছিলেন "আমি বিগত দেড় দুই ঘন্টা ধরে খেয়াল করলাম তুমি তোমার দুই বাচ্চার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিলে। একটা প্রশ্নের উত্তরও বিরক্তির সাথে দিলে না। একটিবারও

বললে না যে চুপ করো, বিরক্ত করো না।" ঐ বাবা জবাবে বলেছিলেন "আমি খুশী হয়েছি আপনি এটা খেয়াল করেছেন। আমি এটা ইচ্ছে করেই করি। আমি যদি আমার বাচ্চাদের প্রশ্নের জবাব না দেই, ওরা অন্যের কাছে জবাব খুঁজবে এবং অন্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। অন্য কেউ ওদের কাছে ইন্টারেস্টিং হয়ে যাবে। আমি বাবা হয়েও ওদের কাছে ইন্টারেস্টিং কারেক্টার হতে পারবো না।"

আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া ঃ শিশু যখন একটু একটু বুঝতে শিখে তখন তাকে মহান আল্লাহ তা'আলার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তা তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে। তিনি আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করেছেন তা সুন্দর করে উপস্থাপন করতে হবে। তাদেরকে বুঝতে দিতে হবে যে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হতে পারেন এমন কোন কাজ করা যাবে না। এমনকি যদি লুকিয়েও কিছু করা হয় তাও আল্লাহ দেখবেন এবং পরে শাস্তি দেবেন। আর আল্লাহর কথা শুনলে তিনি খুশী হবেন এবং যা চাওয়া হবে তাই তিনি দিবেন।

কুরআনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া ঃ আমাদের দেশে মুসলিমদের মাঝে কুরআনের প্রতি এক প্রকার ভীতি দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসছে। একে ধরা যাবে না, ছোঁয়া যাবে না, মখমলের কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে রাখতে হবে, শেলফের সবচেয়ে উঁচু তাকে রাখতে হবে, মাঝেমধ্যে তাকে চুমু খেতে হবে ইত্যাদি। এগুলো সবই ভুল আচরণ এবং কুরআন থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য ইবলিস শয়তানের কারসাজি (প্ররোচনা)। শিশুদেরকে কায়দা, আমপারা পড়ার পাশাপাশি কুরআনের আরবী কপিও হাতে দিতে হবে যেন তাদের এর প্রতি কোন ভয়-ভীতি না থাকে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলা ঃ শিশুদের সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়েও কথা বলা যেতে পারে। এটা মনে করা ঠিক না যে তারা এগুলোর কি বুঝবে? বিজ্ঞানের এমন অনেক বিষয় আছে যা শিশুর উপযোগী। বাজারে শিশুতোষ বিজ্ঞানের বইও পাওয়া যায়, তা সংগ্রহ করা যেতে পারে। তবে এই বিজ্ঞানের বিষয়গুলোকে আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত করে কুরআন-হাদীস দিয়ে উপস্থাপন করতে হবে। তাহলে তাদের মনে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে ভালবাসা এবং শ্রদ্ধাবোধ জাগবে।

শিশুদের পুতুল খেলা ঃ শিশুরা পুতুল খেলতে পারবে কিনা এই বিষয়টা অনেকের কাছেই পরিষ্কার না। কারণ পুতুলের সাথে শিরকে একটি সম্পর্ক রয়েছে, হিন্দুরা মূর্তি অর্থাৎ পুতুলকে পূজা করে। শিশুদের খেলার জন্য বাজারে যে পুতুল পাওয়া যায় তা সাধারণত প্লাষ্টিকের বা কাপড়ের, বা মাটির বা অন্য কোন উপকরণ দিয়ে তৈরী করা হয়। এই পুতুলগুলো আসলে পূজার জন্য তৈরী করা হয় না। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে শিশুরা একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত ছোট সাইজের পুতুল দিয়ে খেলতে পারবে। সহীহ বুখারীর হাদীসে রয়েছে আয়িশা ﵂ ছোট বয়সে মাটির তৈরী পুতুল দিয়ে খেলা করতেন।

বিশেষ পরামর্শ ঃ শিশুরা যখন ছোট, তখন থেকেই অল্প অল্প করে ওদের ব্রেইনে দিতে হবে যে, ওরা যখন বড় হতে থাকবে ধীরে ধীরে পুতুল খেলা বাদ দিতে হবে। তাহলে ওরা বড় হতে হতে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকবে যে, বড় হলে পুতুল খেলা যাবে না। ওদের সাথে আলোচনা করে প্রতি বছর ওদের কিছু পুতুল ওদের হাত দিয়েই গরীব বাচ্চাদের (বা কোনো হাসপাতালের শিশু বিভাগে) উপহার দেয়া যেতে পারে। এতে ওদের বড় বয়সে গিয়ে পুতুলগুলিও শেষ হবে এবং ওদের দান করার মানসিকতা তৈরি হবে।

বাচ্চাদের সাথে গ্রামের গল্প করা ঃ অনেক মা-বাবারাই সন্তানদেরকে গ্রাম থেকে দূরে রাখেন, তাদেরকে গ্রামের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন না। আমাদের উচিত হবে তাদেরকে মাঝেমধ্যেই গ্রামে নিয়ে যাওয়া, তাদেরকে গ্রামের সাথে, গ্রামের আত্মীয়-স্বজন ও পরিবেশের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া; কৃষক, রাখাল, গবাদী পশু, ফসল, ক্ষেত-খামার ইত্যাদির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া। তেমনি গ্রামের মানুষজন বেড়াতে এলে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা উচিত। নইলে সন্তানরা মনে করবে গ্রামের মানুষদের সাথে খারাপ আচরণ করতে হয়। আর ইসলামেও খারাপ আচরণ করার কোনো অনুমতি নেই।

Sharing (ভাগাভাগি) করতে শেখানো ঃ অনেক শিশুরা একজন আরেকজনের সাথে কিছু ভাগাভাগি করতে রাজী হয় না। যে সকল শিশুরা এক সন্তান তারা অনেক সময় শেয়ার করা শিখে না, আবার কয়েকজন ভাইবোনের মধ্যে থেকেও কোন কোন শিশু শেয়ার করতে শিখে না, এটি মূলতঃ মা-বাবার দুর্বলতা, তারা শিশুকে এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেননি। মা-বাবা গোড়া থেকেই সচেতন হলে শিশুর জন্য এই বিষয়টা কোন সমস্যা হবে না।

ভাইবোনদের প্রতি দায়িত্ববোধ শেখানো ঃ যে সকল মা-বাবার কয়েকটি সন্তান তাদের উচিত সন্তানদের মধ্যে দায়িত্ববোধ গড়ে তোলা। যে বড় সে তার ছোট ভাই বা বোনকে বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করবে। এই দায়িত্ববোধ কোন কোন শিশু নিজে নিজেই শিখে নেয় কিন্তু এই বিষয়েও মা-বাবার সচেতন থাকা এবং সাহায্য করা প্রয়োজন। শিশু সব কিছু একা একা শিখে না, এজন্য তাকে গাইড করতে হয়। আমরা জেনে অবাক হবো যে, পাহাড়ী এলাকায় উপজাতি বড় ভাই-বোনেরা তাদের ছোট ভাইবোনদের দেখাশুনা করে। এমন কি পিঠে করে ছোট ভাইবোনকে বেঁধে নিয়েও সংসারের টুকটাক কাজ করে থাকে।

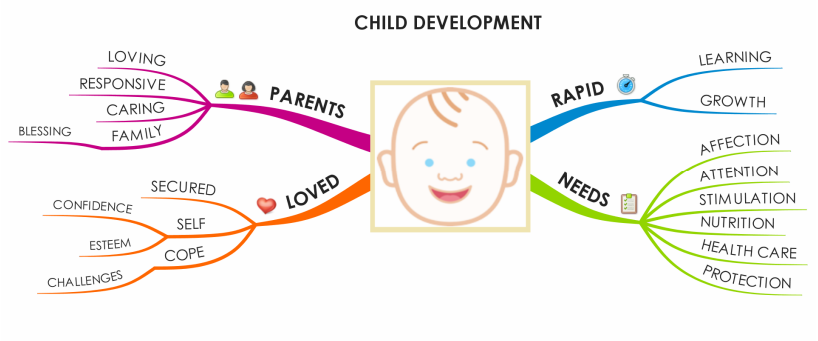

শিশুদের নিয়ে সতর্কতা

কত বছর পর্যন্ত শিশুকে বুকের দূধ পান করানো যাবে? আমাদের দেশের অনেক মায়েরাই (এবং বাবারাও) জানেন না যে শিশুকে কত বছর পর্যন্ত বুকের দুধ পান করানো যাবে। এই বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের সূরা বাকারার ২৩৩ নং আয়াতে পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, দুই বছর পর্যন্ত। অর্থাৎ একটি শিশুকে জন্মের পর থেকে দুই বছর বা ২৪ মাস পর্যন্ত বুকের দুধ পান করানো যাবে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন ঃ

"যে স্তন্য পানকাল পূর্ণ করতে চায় তার জন্য মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর বুকের দুধ পান করাবে।" (সূরা বাকারা ২ ঃ ২৩৩)

"তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে, তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস"
(সূরা আহকাফ ঃ ১৫)

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন যে, যদি কোন নারী নয় মাসে সন্তান প্রসব করে তবে তার দুধ পান করানোর সময়কাল একুশ মাসই যথেষ্ট। আর যদি সাত মাসে সন্তান ভূমিষ্ট হয় তবে দুধ পানের সময়কাল হবে তেইশ মাস। আর যদি ছয় মাসে সন্তান প্রসব করে তবে দুধ পান করানোর সময়কাল হবে পূর্ণ দুই বছর। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময়কাল হলো ত্রিশ মাস। (ইবনে কাসীর)

২য় সন্তান হলে ১ম সন্তানকে গুরুত্ব কম দেয়া ঃ এই কাজটি মোটেও ঠিক নয়। কিন্তু বেশীরভাগ মা-বাবারা এবং পরিবারের অন্যান্যরা এই ভুল কাজটি করে থাকেন। ১ম সন্তান এবং ২য় সন্তান যদি কাছাকাছি বয়সের হয়ে থাকে তাহলে এই সমস্যা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করে। ১ম সন্তান নিজেকে অসহায় মনে করে, তাকে অবহেলার কারণে সে দিন দিন ক্ষেপে যায়, ছোট ভাই বা বোনকে শত্রু মনে করে, তাকে সহ্য করতে পারে না, সুযোগ পেলে তাকে আঘাতও করে। ১ম সন্তানকে গুরুত্ব কম দেয়ার কারণে দিন দিন তার মনমানসিকতার উপর প্রচন্ড চাপ পড়ে। এতে সে অসুস্থ হয়ে যেতে পারে, তার পড়ালেখারও ক্ষতি হতে পারে, মা-বাবার প্রতিও তার ভালবাসা কমে যেতে পারে।

২য় সন্তান গর্ভে এলে তখন থেকেই ১ম শিশু সন্তানকে বোঝাতে হবে যে, তার একটা ছোট ভাই বা বোন আসছে। সে তাকে অনেক ভালোবাসে, তার সাথে খেলবে ইত্যাদি। এভাবে ১ম সন্তানকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে। ১ম সন্তানের বয়স যদি ৫+ বছর হয়, তাহলে তাকে দিয়ে নবজাতকের কিছু কাজে যুক্ত করানো যেতে পারে। তবে মা-বাবার চেষ্টা করা উচিত নবজাতকের পাশাপাশি পূর্বের শিশু সন্তানগুলিকেও আলাদা করে একটু সময় দেয়া। তা না হলে তারা হিংসাত্মক মনোভাব ধারণ করবে।

বাচ্চারা খেলতে গিয়ে ব্যাথা পেলে ঃ অনেক সময় খেলতে গিয়ে বাচ্চারা ব্যাথা পায়, হয়তো হাত-পায়ের কোথাও ছিলে যায়, হয়তো রক্ত বের হয় অথবা মচকে যায়। কোন কোন মা-বাবারা সন্তানের এই দুর্ঘটনার জন্য তার প্রতি সহানুভূতিসূলভ আচরণ না করে বরং তাকে বকাঝকা করেন। যেমন বলে ঃ

ভাল হয়েছে, তুই মর, মর, আরো বেশী করে কর ইত্যাদি। মা-বাবা সন্তানের চিকিৎসা ঠিকই করেন কিন্তু একই সাথে এই অমানবিক আচরণও করেন। শিশু দুষ্টামী করতে গিয়ে বা খেলতে গিয়ে ব্যাথা পেতেই পারে। তখন তাকে সহানুভুতি না দেখিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করাটা মোটেও ঠিক না। এতে সে মানসিকভাবেও প্রচন্ড আঘাত পায়। নিম্নে একটি ভিডিও লিংক দেয়া হলো যা দেখে আমরা এ বিষয়ে খুবই উপকৃত হতে পারি।

YouTube Link: https://youtu.be/XHc9lBR6cOU
Facebook link:
https://www.facebook.com/shishu.lalon.palon/videos/787926311319946/

সন্তানদের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব করা ঠিক নয় ঃ মা-বাবাদের আরো একটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে, আর তা হচ্ছে সন্তানদের মধ্যে যেন পক্ষপাতিত্ব না করা। যাদের কয়েকটি সন্তান তারা অনেক সময় নিজ সন্তানদের একেকজনকে একেক রকম চোখে দেখে থাকেন, একেকজনকে একেক রকম ভালবাসেন বা একেকজনকে একেক রকম গুরুত্ব দেন। যেমন, ডাইনিং টেবিলে খেতে বসেছে সব ছেলেমেয়েরা এক সাথে, সেখানে হয়তো ভাল ভাল আইটেমগুলো প্রায় সময়ই একটি সন্তানকে দেয়া হয়, এতে অন্য সন্তানরা মনে কষ্ট পায়। মনে রাখতে হবে সন্তান সবগুলোই একই মা-বাবার। মা-বাবা যদি তাদের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব করেন তাহলে তা তারা অনায়াসেই বুঝতে পারে এবং মনে প্রচন্ড কষ্ট পায়। এতে সন্তানের পড়ালেখার ক্ষতি হয় এবং মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসা কমে যায়।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের সন্তানদের সম-অধিকার ও সম-ব্যবহারের অধিকার রয়েছে যেমন তোমাদের অধিকার রয়েছে সন্তানদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভের। (আবু দাউদ)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহকে ভয় কর, আর তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ কর। (সহীহ বুখারী)

ছোট বাচ্চাদেরকে একা বাসায় রেখে বাইরে যাওয়া ঠিক নয় ঃ আমার সন্তান কি একা একা বাসায় থাকার উপযোগী হয়েছে? মা-বাবাদের অনেক সময় সন্তানদেরকে একা বাসায় রেখে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। বাসায় যদি বড় কেউ না থাকে এবং সন্তান যদি একা থাকার মতো উপযোগী না হয় তাহলে তাকে একা বাসায় রেখে যাওয়া অবশ্যই ঠিক না। আমেরিকা এবং ক্যানাডায় এ

সম্পর্কে আইন রয়েছে। কোন মা-বাবা ১২ বছরের নীচের কোন বাচ্চাকে বাসায় একা রেখে যেতে পারবে না, এটা একটা অপরাধ। যদি কোন মা-বাবা এই অপরাধ করেন তাহলে তাদের জেল অথবা জরিমানা হতে পারে। এই বিষয়ে কড়াকড়ির অনেক কারণ আছে। বাচ্চা একা বাসায় থাকলে নানা রকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বাচ্চারা হচ্ছে অবুঝ, তারা খেলার ছলে ও কৌতুহলবশতঃ কত কিছুই না করতে পারে।

একটি সত্য ঘটনা উল্লেখ করা যাক। আমরা টরন্টো শহরের যে বিল্ডিংটাতে বাস করি সেটার ৮ তলায় এক পরিবারে দু'টি ছেলে- একটির বয়স পাঁচ এবং অপরটির বয়স ছয়ের কাছাকাছি। একদিন ওদের মা বাচ্চাদেরকে বাসায় রেখে একই ফ্লোরে পাশের ফ্লাটে গেছেন কোন কাজে। ইতিমধ্যে বাচ্চা দু'টি খেলার অংশ হিসেবে তাদের ছোট ছোট দু'টি ছাতা কিচেনে ওভেনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ওভেন অন করে দিয়েছে। ফলে যা হবার তাই হয়েছে, কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন ধরে গিয়েছে এবং ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি এসে সেই আগুন নিভিয়েছে।

বাচ্চা একা বাসায় রেখে গেলে আরো অনেক রকম দুর্ঘটনাই ঘটতে পারে যেমন, দা-বঁটি বা ছুরি-কাঁচি দিয়ে খেলতে পারে, বারান্দার রেলিংয়ে উঠতে পারে, ছাদে যেতে পারে, দিয়াশলাই নিয়ে খেলতে পারে। বাচ্চাদের common sense এতোটুকু কাজ করে যে বড় কেউ বাসায় থাকলে তারা বড়দের কোন জিনিস দিয়ে সাধারণত খেলে না। এই কাজগুলো সাধারণতঃ তখনই করে যখন বাসায় কেউ থাকে না, তখন তারা নিজেদেরকে স্বাধীন মনে করে।

শিশুদের গায়ে হাত তোলা ঠিক নয় ঃ আমরা ছোটবেলায় মা-বাবার হাতে অনেক মার খেয়েছি। স্কুলে তো শিক্ষকের বেতের বাড়ির কথা মনে পড়লে এখনো গা শিউরে উঠে। যাহোক, তারা আমাদের ভালোর কথা চিন্তা করেই হয়তো গায়ে হাত তুলেছেন। তৎকালীন সময়ে শিশুদের সংশোধন প্রক্রিয়া অমানবিক ছিল যা শিশু মনোবিজ্ঞান বা ইসলাম কেউ সমর্থন করে না। নর্থ-আমেরিকায় শিশুর গায়ে হাত তোলা দন্ডনীয় অপরাধ, সেটা মা-বাবা হোক কিংবা স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা হোক। এছাড়া ইসলামে কারো মুখে আঘাত করা সম্পূর্ণরূপে নিষেধ।

দশ বছর বয়স হলে শিশুদের বিছানা আলাদা করে দিতে হবে ঃ আমাদের দেশের কালচারে শিশুরা সাধারণত মা-বাবার সাথেই ঘুমায়। এখন প্রশ্ন ঃ শিশুরা কত বছর বয়স পর্যন্ত মা-বাবার সাথে ঘুমাতে পারবে? আবু দাউদের সহীহ

হাদীসে রসূল ﷺ বলেছেন দশ বছর বয়স হলে শিশুদেরকে আলাদা বিছানা করে দিতে, সে যেন আর মা-বাবার সাথে না ঘুমায় ।

শিশুদের সাথে কথা বলা

শিশুদের কথা বলার সময় প্যারেন্টদের উপস্থিত থাকা উচিত

- শিশুরা সাধারণত যে বয়সে বেশী কথা বলে । যেমন ঃ ঘুমানোর আগে শুয়ে শুয়ে, ডাইনিং টেবিলে খাওয়ার আগে, গাড়িতে কোথাও যাবার সময় ।
- তাদেরকে এটা বুঝতে দিতে হবে যে, সে যে বিষয়ের গুরুত্ব দিচ্ছে তা তার মা-বাবাও গুরুত্ব দিচ্ছে ।
- শিশুরা যে কাজগুলো করে তার সাথে সপ্তাহে অন্ততপক্ষে একদিন মা-বাবার উচিত সময় দেয়া এবং সেই কাজগুলো করা ।
- শিশুদের কাছে যে বিষয়গুলো বেশী আগ্রহ সেই বিষয়গুলোর উপর মা-বাবার উচিত দক্ষতা অর্জন করা ।

শিশুদের বুঝতে দিতে হবে যে প্যারেন্ট তার কথা গুরুত্বসহকারে শুনছে

- শিশুরা যখন কোন একটি বিষয়ে কথা বলা শুরু করে তখন মা-বাবার উচিত তাদের নিজের কাজ বন্ধ করে দিয়ে শিশুর কথা শুনা ।
- তাকে বিরক্ত না করে বা তাকে কথার মাঝখানে বন্ধ করে না দিয়ে তার কথার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে ।
- যদি তার কথা ঠিক মতো বুঝাও না যায় তবুও তার কথা মনোযোগ সহকারে শুনা উচিত ।
- তাদের কথা পুরোপুরি শেষ না হওয়া পর্যন্ত মা-বাবা কোন কথা বলা ঠিক নয় ।
- তার কোন কথা বুঝা না গেলে তাকে আবার জিজ্ঞেস করা উচিত ।

এমনভাবে শিশুদের সাথে আচরণ করতে হবে যেন তারা কথা শুনে

- তাদের সাথে শক্ত কথাও নরম করে বলতে হবে, তাদের সাথে রাগান্বিত কণ্ঠে অথবা প্রতিরোধের কণ্ঠে কথা বলা যাবে না ।

- তাদেরকে ছোট করে বা হেয় করে কোন কথা বলা যাবে না। স্বীকার করতে হবে যে তার দ্বিমত করার অধিকার আছে।
- তাদের সাথে দ্বিমত নিয়ে তর্ক করা ঠিক নয়। বরং এভাবে বলা যেতে পারে যে, "আমি জানি তুমি আমার সাথে একমত নও কিন্তু আমি এটা মনে করি"।
- শিশুর সাথে কথোপকথনের সময় শ্রোতার নিজের অনুভূতির কথা বাদ দিয়ে শিশুদের অনুভূতির দিকে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে।

প্যারেন্টদের আরো মনে রাখা উচিত

- শিশুর সাথে কথোপকথনের সময় তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, সে কি কিছু চায়? বা তার কি কিছুর প্রয়োজন আছে?
- শিশুরা সাধারণত মা-বাবাকে নকল (অনুকরণ) করে। তারা দেখে মা-বাবা কিভাবে সমস্যার সমাধান করেন।
- শিশুদের সাথে তাদের মতো করে কথা বলতে হবে। তাদেরকে লেকচার দেয়া যাবে না, তাদেরকে বিরূপ সমালোচনা করা যাবে না, তাদেরকে ধমক দিয়ে কথা বলা যাবে না এবং তারা মনে কষ্ট পেতে পারে এমন কোন কথাই বলা যাবে না।
- শিশুরা নিজের পছন্দ অনুযায়ী নতুন নতুন বিষয় শিখতে থাকে। যদি তার শিক্ষার মধ্যে ক্ষতিকারক কিছু না থাকে তাহলে তাকে বাধা দেয়া উচিত নয়।
- শিশুরা অনেক সময় বাবা-মাকে পরীক্ষা করে যে বাবা-মা তার কথা শুনে কিনা। সে যে বিষয়ই নিয়ে আসুক না কেন তার গুরুত্ব দিয়ে শুনতে হবে। তা না হলে সে কথা বলার আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে।

শিশুদের নিয়ে আরো কিছু মূল্যবান টিপ্‌স

১. শিশুরা যেন কখনো শুয়ে শুয়ে না খায়।
২. শিশুরা যখন ঘুমায় তার সাথে মা অথবা বাবারও ঘুমানো উচিত।
৩. শিশুদের সামনের কখনো উঁচু গলায় কথা বলা ঠিক নয়।
৪. দুই বছরের আগে শিশুদের টিভি দেখতে দেয়া ঠিক নয়।
৫. শিশুদের দিনে দুই ঘন্টার বেশী টিভি দেখতে দেয়া ঠিক নয়।

৬. গানে গানে যে সকল শিক্ষণীয় বিষয় আছে তা তিন বছর বয়স থেকে দেখতে দিলে ভাল ।
৭. শিশুদের দেহ কখনো ঝাঁকানো ঠিক না বা তাদেরকে ছুঁড়ে মারা ঠিক নয় ।
৮. মা-বাবারা শিশুদের সামনে কখনো ঝগড়া করতে নেই ।
৯. মা-বাবারা শিশুদের সামনে কখনো তর্ক করাও উচিত নয় ।
১০. শিশুদের শাস্তি দেয়া মোটেও ঠিক নয় ।
১১. দিনে অন্তত পক্ষে ২০ মিনিট শিশুদের কিছু একটা পড়তে দেয়া উচিত ।
১২. শিশুদের সাথে নিয়ে প্রতিদিন কিছুক্ষণ ব্যায়াম করা উচিত ।
১৩. শিশুদের একেবারেই মারামারির কোন কার্টুন দেখতে দেয়া উচিত নয় ।
১৪. শিশুদের কোন সাহায্য ছাড়া নিজে থেকেই দাঁড়াতে উৎসাহ দেয়া উচিত ।
১৫. শিশুদের কোন আজেবাজে নামে ডাকা ঠিক নয় ।
১৬. শিশুদের নতুন একটা খেলনা দেয়ার আগে পুরোনোটা সরিয়ে ফেলা উচিত ।
১৭. শিশুদের অভ্যাস করানো উচিত সে যেন নিজের ময়লা করা জায়গা নিজেই পরিষ্কার করে ।
১৮. শিশুদের সার এবং কেমিক্যালমুক্ত শাক-সবজি এবং অন্যান্য খাবার খাওয়ানো উচিত ।
১৯. দুই বছরের শিশু দায়িত্ববোধ করে এবং নিজের কাজ নিজে করা শিখে ।
২০. প্রত্যেক শিশুকে কিছু সময় একা একা থাকতে দেয়া উচিত, এতে তার প্রতিভার বিকাশ ঘটে । তবে সেই একাকীত্বটা মা-বাবার দৃষ্টির আড়ালে নয় ।
২১. শিশুরা বাবা এবং মা দু'জনের কাছ থেকেই যেন গিফ্‌ট বা উপহার পায় ।
২২. স্কুলে যাওয়ার আগে থেকেই তারা যেন খেলাধুলা করে ।
২৩. শিশুদের বিভিন্ন কালচারের সাথেও পরিচয় করিয়ে দেয়া প্রয়োজন ।
২৪. তাদের নিজেদেরকেই নিজের জিনিস পছন্দ করতে দেয়া উচিত ।
২৫. শিশুদেরকে সাথে নিয়ে সবাই এক টেবিলে খেতে বসা উচিত ।
২৬. শিশুদেরকে সাথে নিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করা অতি উত্তম অভ্যাস ।
২৭. সবসময় তাদেরকে পজিটিভভাবে উৎসাহ দেয়া উচিত ।
২৮. শিশুদেরকে খেলায় হারতে দেয়া উচিত এবং এভাবে শিক্ষা দেয়া উচিত যে কিভাবে খেলায় ভাল করতে হয় ।

২৯. শিশুদের কখনো চড়-থাপ্পড় দেয়া উচিত নয়।
৩০. তাদেরকে বুঝতে দিতে হবে যে খারাপ কাজের ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।
৩১. সময় সময় তাদেরকে অন্যান্য শিশুদের সাথেও খেলতে দেয়া উচিত।
৩২. শিশুদের আগুন নিয়ে অথবা ধারালো কিছু নিয়ে কখনো খেলতে দেয়া মোটেও ঠিক নয়।
৩৩. শিশুদের কখনো খেলনা পিস্তল বা বন্দুক দিয়ে খেলতে দেয়া উচিত নয়।
৩৪. খেলার শেষে তার খেলনাগুলো যেন সে গুছিয়ে এক জায়গায় রাখে এই শিক্ষা দেয়া।
৩৫. শিশুরা যখন কাঁদে তখন তাদেরকে কাঁদতে দেয়া উচিত, জোড় করে থামিয়ে দেয়া উচিত নয়।
৩৬. শিশুদেরকে কাদা, মাটি, ধুলা ইত্যাদি দিয়েও খেলতে দেয়া উচিত।
৩৭. মেয়ে শিশুদেরকে নিজ মায়ের বড় বড় ড্রেসগুলো পড়তে বাধা দেয়া উচিত নয়।
৩৮. একইভাবে ছেলে শিশুদেরকে নিজ বাবার জুতা, শার্ট ইত্যাদি পড়তে বাধা দেয়া উচিত নয়।
৩৯. শিশুদের জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করা উচিত নয়।
৪০. পটি (potty) ট্রেনিং ছেলে শিশুদের তিন বছর বয়সে এবং মেয়ে শিশুদের দুই বছর বয়সে দেয়া উচিত।
৪১. শিশুদের গায়ে মাথা রেখে কখনো শোয়া ঠিক নয়।
৪২. শিশুদের নতুন নতুন কাজ করতে দেয়া উচিত, তাদের কাজে বাধা না দিয়ে উৎসাহ দেয়া উচিত।
৪৩. শিশুদের সাথে প্রতিদিন ফান (fun) করা এবং হাসাহাসি করা উচিত।
৪৪. তাদেরকে নিজের ভুল নিজেই সংশোধন করতে দেয়া উচিত।
৪৫. মা-বাবা যখন কোন ভুল করবেন, তখন শিশুদেরকে সরি (sorry) বলা উচিত।
৪৬. শিশুরা যেন দেখে যে মা-বাবাকে এবং বাবা মাকে ভালবাসে।
৪৭. শিশুদেরকে মা-বাবার প্রতিদিন বলা উচিত যে আমরা তোমাকে খুব ভালবাসি।
৪৮. শিশুদের যখন দাঁত উঠা শুরু করে তখন তাদেরকে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজী অথবা আরবী ভাষাও শিক্ষা দেয়া উচিত।
৪৯. শিশু বয়সে একটি শিশু এক সাথে চারটি ভাষা আয়ত্ত করতে পারে।

৫০. স্বামী-স্ত্রীর গোপনীয় মুহূর্তগুলো যেন শিশুর সামনে প্রকাশ না পায় কখনো।

৫১. তাদের সাথে সবসময় ধৈর্যধারণ করতে হবে।

কাজের বুয়ার মাধ্যমে শিশু লালন-পালন ঠিক নয়

সন্তানের বেড়ে উঠার বয়সে আমরা বাবা-মায়েরা একটা বড় ধরণের ভুল করে থাকি আর তা হচ্ছে ছোট সন্তানকে কাজের বুয়ার মাধ্যমে লালন-পালন করা। স্বাভাবিকভাবেই একজন কাজের বুয়ার কতটুকু জ্ঞান রয়েছে একটি শিশুকে নীতি-নৈতিকতা দিয়ে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে। বুয়াদের সাধারণত সাধারণ শিক্ষাই থাকে না তার উপর আবার ইসলামী শিক্ষা থাকা তো দূরের কথা। আমরা যদি খুব গভীরভাবে চিন্তা করে দেখি বিষয়টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

বাস্তবে দেখা গেছে যে বাংলাদেশের ডে-কেয়ারগুলোতে মুলতঃ কাজের বুয়ারাই শিশুদের লালন-পালন করে থাকে যেখানে উন্নত দেশগুলোর ডে-কেয়ারে বেবীসিটার হিসেবে চাকুরী করতে হলে আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেশনের উপর ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েশন নিতে হয় এবং এই সার্টিফিকেশন ছাড়া কেউ বাচ্চা ধরতেই পারে না। সেখানে আমাদের দেশে উচ্চবিত্তদের সন্তানরাও বুয়ার হাতে মানুষ হয়। তাই এই বিষয়ে বিশেষ করে সন্তানের মায়ের এগিয়ে আসা উচিত। একটি শিশুর সর্বপ্রথম গৃহ শিক্ষীকা হচ্ছেন তার মা। সন্তান আল্লাহর দেয়া আমানত, এই মহামূল্যবান আমানত বুয়ার হাতে ছেড়ে না দিয়ে মায়ের উচিত সেই দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করা। যারা চাকুরী করেন তাদেরও এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে একটি উপায় বের করে আনা।

কিছু প্রশ্ন,
কিছু চিন্তা, কিছু ভাবনা

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবারের লোকদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। (সূরা আত তাহরীম ঃ ৬)

চ্যাপ্টার ৪

মনে রাখা উত্তম

১. এখনকার অধিকাংশ স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছেলেমেয়েদের আদব-কায়দা শিখানোর তেমন কোন ব্যবস্থা নেই ।
২. আমার সন্তান কি কো-এডুকেশনে পড়ে?
৩. স্কুল এবং কোচিং মিলিয়ে আমার সন্তান কি ৮-১০ ঘন্টা বাসার বাইরে থাকে?
৪. আমরা কি জানি তাদের মনে নানারকম কালচার এবং কুসংস্কার বিশ্বাস স্কুল বয়স থেকেই ঢুকাচ্ছি?
৫. আমি কি জানি ১০ বছর বয়স থেকে আমার সন্তানের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরয?
৬. স্কুলে যোহর এবং আসর সলাতের সময় হলে তারা কি করে? সলাত না আদায় করার দায়-দায়িত্ব কি আমার উপর আসবে না?

আমার সন্তানকে কিভাবে গাইড করবো?

১. আমি কি চাই আমার সন্তান একজন ভাল মুসলিম হবার পাশাপাশি একজন ভাল প্রফেশনাল হোক?
২. আমি কি চাই আমার সন্তানের মনে ভাল উপাদানগুলো বেশী করে ঢুকুক?
৩. আমি কি চাই দুনিয়া এবং আখিরাত দুই দিকেরই সফলতা?
৪. আমরা কি জানি ঈমানের অন্যতম দাবী হলো দ্বীনের জ্ঞানার্জন করা?
৫. আমার যদি নূন্যতম জ্ঞানই না থাকে তাহলে কিভাবে নিজ পরিবারকে দ্বীনের আলোকে গাইড করবো?
৬. কিভাবে সন্তানদের অন্তরে সামান্য হলেও দ্বীনের আলো ঢুকাবো?

৭. আমরা কি সচেতন? যুগ পরিবর্তন হয়ে গেছে, আমার ভাসাভাসা আর আবোলতাবোল দ্বীনি জ্ঞান দিয়ে নিজ সন্তানদের বুঝ দিতে পারবো না।
৮. আমরা কি জানি তারা এখন লজিক চায়, তারা দ্বীন ইসলামের ইনটেলেকচুয়াল ব্যাখ্যা চায়?

সত্যিকার মানুষের সংজ্ঞা কী?

সন্তানের ভবিষ্যতের জন্যে, সন্তানকে মানুষ করার জন্যে আমরা সবাই চিন্তিত, সবাই ব্যস্ত। এখন আমাদের প্রশ্ন এই মানুষের সংজ্ঞা কি? আমার সন্তান ভাল ইউনিভার্সিটিতে পড়বে, একজন ব্যাংকার বা ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হবে আর এতেই সে মানুষ হয়ে গেল? আসলে মানুষের সঠিক সংজ্ঞা হলো আমার সন্তান একজন ভাল মুসলিম হবার পাশাপাশি একজন ভাল প্রফেশনাল হবে, সে দুনিয়া এবং আখিরাত দুইদিকেই সফলতা অর্জন করবে।

তাহলে এবার দেখি কিভাবে একজন পরিপূর্ণ মুসলিম হওয়া যায়। মা হচ্ছেন সন্তানদের বুনিয়াদী শিক্ষক, বাবার পাশাপাশি সন্তানকে মানুষ করার পিছনে মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে আধুনিকতার নামে সন্তানকে আগুনের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছি, আর বলছি ঠিক থাকতে! আমরা নিজেও এই বয়সে এই পরিবেশে কী ঠিক থাকতে পারতাম? আমরা খুব ভাল করেই জানি যে আমাদের দেশে আর আগের মতো পরিবেশ নেই, সকলেই কেমন যেন ওয়েষ্টার্ন আর ইন্ডিয়ান কালচার ফলো করছে, ক্যাবল কানেকশনের বদৌলতে ঘরে ঘরে চলে এসেছে অনৈসলামী কার্যক্রম। একটা সাধারণ ফর্মূলা আমরা জানি, আগুনের পাশে ঘি রেখে ঘি কে বলছি না গলতে, কিন্তু ঘি একসময় গলবেই।

একটি বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টা পরিষ্কার হওয়া যাক। যেমন ক্যানাডায় শীতকালে প্রচন্ড শীতে (-২০°/-৩০° সেন্টিগ্রেডে) আমরা যখন বাইরে যাই তখন সারা শরীর খুব ভালভাবে প্রটেক্শন দিয়ে যাই, সবই ঢাকা থাকে শুধু চোখ দুটো খোলা থাকে, কারণ ঠান্ডা এতো যে কোথাও একফোঁটা পানি থাকলেও তা বরফ হয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আমাদের চোখের পানি বরফ হয় না, এর কারণ আমাদের চোখের পানির মধ্যে লবণ দেয়া আছে, তাই এতো শীতেও তা বরফ হয় না। সেরকম আমার সন্তানের ভিতর এমন কোন উপাদান ঢুকিয়ে দিতে হবে যার কারণে এই প্রতিকূল পরিবেশে থেকেও

সে নষ্ট হবে না, আর তা হলো মজবুত ঈমান এবং তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। সন্তানের ঈমান মজবুত করতে আর তাকওয়া তৈরি করতে হলে আগে মা-বাবার ঈমান ও তাকওয়া উন্নত করতে হবে এবং বাসায় একটা সুন্দর ইসলামী পরিবেশ তৈরি করতে হবে। রসূল ﷺ বলেছেন মানুষ যখন মরে যায় তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমলের সুফল সে কিয়ামত পর্যন্ত পেতে থাকে।

(১) সদকায়ে জারিয়া
(২) এমন সৎ জ্ঞান যা সে বিতরণ করেছে এবং তা মানুষের উপকারে লাগছে
(৩) নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করবে। (সহীহ্ মুসলিম)

এবার আমাদের আলোচনা ৩নং পয়েন্ট নিয়ে। নেক সন্তান কিভাবে রেখে যাব? আমাদের অনেকেরই ধারণা যে সন্তানকে বিকেলে হুজুরের কাছে কায়দা বা কুরআন পড়তে পাঠালেই সব হয়ে গেল, সে পাক্কা মুসুল্লি হয়ে গেল, সে ইসলাম শিখে ফেললো। আসলে ধারণাটা ভুল, সাধারণত ওখানে তিলাওয়াত ছাড়া আর তেমন কিছুই শেখানো হয় না। আমার সন্তানকে একজন পরিপূর্ণ মুসলিম বানানোর জন্য আমাকেই স্পেশাল প্রজেক্ট হাতে নিতে হবে। শুধু টাকা আর খ্যাতির পেছনে দৌড়ালে সব হারাবো, একসময় আফসোসের আর সীমা থাকবে না, তাই সময় থাকতে এখনই সচেতন হওয়া উচিত। আসুন চিন্তা করি,

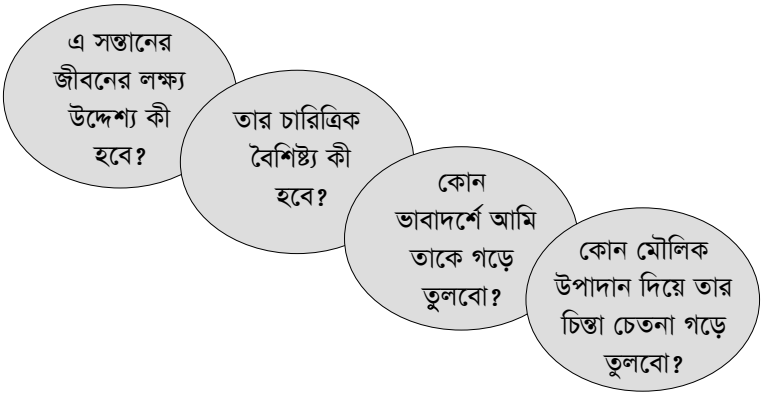

আমি কি চাই না আমার সন্তানের মনে ভাল উপাদানগুলি বেশী করে ঢুকুক?

শিশু, বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলের মন এক চলমান মেশিন। এ মেশিন সর্বদা সচেতন ও অবচেতনমনে ইনপুট গ্রহণ করছে। সে ইনপুট প্রসেস হয়ে আউটপুট বেরোয় মানুষের কর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে। ফলে কেউ হয় দানশীল, কেউ উদ্ধত, কেউ হয় আল্লাহর শোকরগুজার বান্দা আবার কেউ হয় বিপথগামী। আমার শিশু কোন না কোন কিছু শিখছে। প্রতিদিন সে নিত্য নতুন কায়দা রপ্ত করছে। এটা ভাবা যাবে না যে আমি যদি কিছু না শেখাই তাহলে কোথা হতে সে শিখবে? আসলে এই ধারণা ভুল, আশেপাশের পরিবেশ, টিভি, রেডিও, বাবা-মায়ের আচরণ সবকিছু হতে প্রতিনিয়ত সে ইনপুট সংগ্রহ করছে।

সুতরাং আমি কি সতর্ক হবো না? আমি কি চাই না আমার সন্তানের মনে ভাল উপাদানগুলি বেশী করে ঢুকুক? আমি কি চাই না আমার সন্তান একজন ভাল প্রফেশনাল হওয়ার পাশাপাশি একজন ভাল মুসলিম হোক? আমি কি চাই না সে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হয়ে মা-বাবার মুখ উজ্জ্বল করার পাশাপাশি কুরআন হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে দ্বীনের উপর অনর্গল বক্তৃতা দিয়ে অমুসলিমদের হিদায়াতের নূর দেখাক?

আসুন চোখ বন্ধ করে খানিক চিন্তা করি। হলিউড-বলিউড বা এর অন্ধ অনুসারী অন্য টিভি চ্যানেলগুলি প্রতিনিয়ত মুভি আর বিচিত্র অনুষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছে। বলিউডের প্রভাব এখন প্রযুক্তির আশীর্বাদে সর্বত্রই দৃঢ়ভাবে প্রসারিত। আমি এবং আমার সন্তানেরা প্রতিনিয়তই এগুলি হতে মনের খোরাক নিচ্ছি। শিশুরা অনুকরণ প্রিয় হবার কারণে এসব বিনোদনের মৌলিক বিষয়গুলির সাথে খুব সহজে পরিচিত হয়ে যায়। এভাবেই তাদের মননশীলতার উপর ঐসব উপাদানগুলির স্থায়ী প্রভাব পড়ে। আসুন এবার চিন্তা করি এসব অখাদ্য কুখাদ্যের বিপরীতে আমি নিজে ও আমার শিশু কী ইনপুট নিচ্ছি? খোদ হলিউডের জন্মস্থান হতেই এখন এর কুরুচি আর বিকৃত সংস্কৃতির বিরুদ্ধে শ্লোগান উঠেছে। এর বদৌলতে শিশুরা বইয়ের চাইতে বন্দুকের প্রতি বেশী আগ্রহী হয়ে উঠেছে। ড্রাগ, ভায়োলেন্স, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব, পারিবারিক বন্ধন শিথিল হওয়া ইত্যাদির অবদানে হলিউড বেশ নাম করেছে।

হলিউড সংস্কৃতি আজ এমন এক টর্ণেডোর নাম যা সারা বিশ্বের আনাচে কানাচে লজ্জা শরমের অবশিষ্টাংশ ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে ফেলতে চায়। এক আমেরিকান আইডলই দুনিয়া কাঁপানোর জন্য যথেষ্ট। আমি এবং আমার পরিবারকে এগুলি হতে বিরত রাখার দায়িত্ব আমার নিজের। এটি আমার একান্ত বুঝ ও বিশ্বাসের গভীরতার উপর নির্ভর করে। তবে সন্তানের চরিত্র গঠনে একটি ভারসাম্যপূর্ণ স্ট্রাটেজীর অংশ হিসেবে হলিউড, বলিউডের কুখাদ্যের পাশাপাশি যদি কিছু সুস্থ খাবার সরবরাহ না করা হয় তাহলে এ সন্তানটি যে কি হবে তা ভবিষ্যতে টের পাওয়া যাবে যখন আমার বয়স ৫০/৬০ এর কোঠায় গিয়ে পৌঁছবে। তখন চিন্তা করে কোন কুলকিনারা করা যাবে না। কারণ আমার শিশু তখন বড় হয়ে যুবক হয়ে গেছে। তার নিজস্ব মূল্যবোধ তৈরী হয়ে গেছে। এখন তার নতুন বিশ্বাস (ঈমান) ও মূল্যবোধের দাওয়াতী কাজের প্রথম টার্গেট হবো আমরা নিজে।

একটি সত্য ঘটনার মাধ্যমে শিক্ষণীয় হিসেবে একজন অধ্যাপকের চিন্তা-চেতনা এখানে তুলে ধরা হলো। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর। তিনি এখন সন্তানদের মূল্যবোধ নিয়ে চিন্তাক্লিষ্ট। কেবল ভাবেন আর ভাবেন। ইতিমধ্যে সন্তানগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শুরু করেছে। তিনি কি পারবেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া সন্তানদের মন আর বিশ্বাসের উপর নতুন কোন প্রলেপ দিয়ে নিজের মত করে নিতে? এটা সহজ হতো যদি তিনি শিশু বয়স থেকে সন্তানকে একজন আধুনিক মানুষ ও আল্লাহর একজন খাঁটি বান্দা হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করতেন।

আরেকটি সত্য ঘটনা ঃ আমাদের পরিচিত একটি পরিবার, ভাই ভাবী দু'জনেই উচ্চ শিক্ষিত, দুই ছেলে এক মেয়ে, মেয়েটি বড় এবং হাইস্কুলে পড়ে। একদিন ভাইকে পরামর্শ দিলাম মেয়েটিকে সপ্তাহে বন্ধের একদিন ইসলামিক স্কুলে দেয়ার জন্য, পাঁচ ঘন্টা ক্লাস। যেন সে সাধারণ পড়ালেখার পাশাপাশি ইসলাম শিখতে পারে। এই প্রস্তাব শুনে বাবা বললেন, "আমার মেয়ে তো খুব ভাল স্টুডেন্ট, এই ইসলাম শিখতে গিয়ে তার পড়ালেখার কোন ক্ষতি হবে না তো?" শেষ পর্যন্ত বাবা মেয়েটিকে সপ্তাহে একদিন কয়েক ঘন্টার জন্য ইসলাম শিখতে দেননি। অনেক পরিবারেরই ভুল ধারণা, তাদের ভয় ইসলাম শিখতে গিয়ে সন্তানের পড়ালেখার ক্ষতি হতে পারে, সে যদি আবার ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হতে না পারে!

অথচ বাস্তবতা ভিন্ন। হাইস্কুল পাস মেয়েরা আজকাল নিজেরাই একটা আদর্শ তৈরী করে নেয়। সেটি হতে পারে Rock n Roll এর আদর্শ, কিংবা আমেরিকান আইডলের আদর্শ, কিংবা ইন্ডিয়ান কোন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী গায়ক বা গায়িকার আদর্শ। শুধু তাই নয়, এর বাইরে কোন কিছুকে তারা সেকেলে বা নিম্নস্তরের জিনিস মুখে না বললেও ভাবে তা প্রকাশ করে দেয়। অন্যদের সে আদর্শের অনুসারী বানানোর চেষ্টা করে। আফসোস, এই পরিবারটি বিষয়টি বুঝলেন না। তাই আসুন শিশুদের উপযোগী ইসলামী ডিভিডি ইত্যাদি সংগ্রহ করি। সন্তানদের সেগুলি উপভোগ করার জন্য উৎসাহিত করি। হিকমতের সাথে ও তাদের স্বতন্ত্র সত্তার কথা বিবেচনা করে ধীরে ধীরে এগুতে থাকি। এসব ইসলামী শিক্ষামূলক বই, ডিভিডি খুব সহজেই আজকাল পাওয়া যায়। এছাড়া ইউটিউবতো রয়েছেই।

আমি কি চাই এই প্রতিকূল পরিবেশে আমার সন্তানের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি হোক?

একসময় আধুনিক ছেলেমেয়েরা রেডিও শুনতো না। কিন্তু যুগ পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন ছেলেমেয়েরা নিয়মিত রেডিও শুনে মোবাইলের মাধ্যমে। বাংলাদেশে এখন কয়েকটি রেডিও চ্যানেল চালু হয়েছে। এই চ্যানেলগুলো উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। কারণ এই চ্যানেলগুলো ছেলেমেয়েদের অবাধ প্রেম নিবেদনের মিডিয়া হিসেবে কাজ করে। এর মাধ্যমে তারা তাদের ভালবাসা-ভালোলাগার কথা ব্যক্ত করতে পারে। এছাড়া টিভি চ্যানেলগুলোতেও এই জাতীয় প্রোগ্রামও চালু হয়েছে যার মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা তাদের প্রথম (ক্রাস) ভালোলাগার কথা ব্যক্ত করে। এছাড়া আরো রয়েছে মোবাইল কোম্পানীগুলোর রাত বারটার পর ফ্রী টক টাইম ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাসহ প্যাকেজ যার মাধ্যমে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের অবাধ এবং সীমাহীন কথোপকথোন। এরপর তো রয়েছে ফেইসবুকের মাধ্যমে অবাধ বুন্ধুত্ব। সারাদিন স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি এবং বাইরের পরিবেশ তারপর ডিসের মাধ্যমে ঘরে ঘরে হিন্দি চ্যানেলে সিনেমা, নাচ, গান, সিরিয়াল।

চারিদিক দিয়ে আমাদের সন্তানদের আক্রমণ করছে! কোথায় যাবে তারা? পালাবার কোন রাস্তা নেই! কুরআনের ইতিহাস থেকে আমরা দেখেছি যে, পূর্বে যখন একেকটা জাতি এভাবে পাপের সীমা ছাড়িয়ে গেছে তখন আল্লাহ সেই

জাতিগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছিল, যেমন আদ জাতি, সামুদ জাতি, লুত জাতি। আমাদের সামনেও মহাবিপদ! চারিদিকে আগুন, আমাদের সন্তানরা এই আগুনের মধ্যে বসবাস করছে।

আমাদের সন্তানদেরকে এই আগুন থেকে রক্ষা করতে হলে একটিই পথ আর তা হচ্ছে তাদের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি করতে হলে সর্বপ্রথমে তাদেরকে ঈমানের উপর সঠিক জ্ঞান দিতে হবে। এর পাশাপাশি তাদের মধ্যে আল্লাহ ভীতি এবং আল্লার প্রতি ভালবাসা বাড়াতে হবে। এই দু'টি বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য আমাদের ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ সিরিজের প্রকাশিত ১ম ও ২য় বই ঈমানের স্বচ্ছ ধারণা ও তাকওয়া জোগাড় করে খুব ভালভাবে পড়তে হবে। ইনশাআল্লাহ এর মাধ্যমে আমরা শিখতে পারবো কীভাবে ঈমানকে মজবুত করা যায়, কীভাবে ঈমানকে renew করা যায়, কীভাবে ঈমানের উপর টিকে থাকা যায় ইত্যাদি। আর তাকওয়ার মাধ্যমে জানতে পারবো কীভাবে আল্লাহকে ভালবাসা যায় এবং তাঁর ভালবাসা অর্জন করা যায়, কীভাবে আল্লাহর প্রতি ভয় বাড়ানো যায়, কীভাবে আল্লাহর প্রতি সচেতনতা বাড়ানো যায় ইত্যাদি।

আমি কি এখনও সাবধান হবো না?

১. আমি কি জানি সন্তানদের মনে নিয়মিত কালচার আর ফ্যাশনের নামে আল্লাহবিরোধী বিশ্বাস ঢুকছে?
২. আমি কি জানি স্কুল-কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি থেকেই তারা নানা রকম শিরকে লিপ্ত হচ্ছে?
৩. আমি কি জানি কী ধরনের বই তারা পড়ে? এবং এই গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে স্লো-পয়জনে তারা কিভাবে আক্রান্ত হচ্ছে?
৪. আমি কি জানি তাদের কাছে এডাল্ট ডিভিডি বা পর্নগ্রাফী আছে কি না?
৫. আমি কি জানি তারা কী ধরনের গান শুনে? আর অনেক গানের কথাই তো শিরক মিশ্রিত!
৬. আমি কি জানি ইসলামী অনুষ্ঠানের নামে আমি এবং আমার সন্তানেরা নানা রকম সুন্নাতের বিপরীত "বিদ'আতী" কাজ করে যাচ্ছি?
৭. বেশীরভাগ স্কুল-কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিগুলোতে শিক্ষার এমন কোন ব্যবস্থা নেই যেখানে ইসলামী নীতি-নৈতিকতা শেখানো হয়।

৮. আমি কি জানি ১৩ (সাবালিকা) বছর বয়স থেকে আমার মেয়ের উপর পর্দা ফরয?
৯. আমার কন্যা পর্দা না করার কারণে যারা তাকে দেখে চোখ ও মনের জিনায় লিপ্ত হচ্ছে তাদের এ কবীরা গুণাহের জন্য আখিরাতে আমি দায়ী হবো সে কথাটা ভেবে দেখেছি কখনো?

আমাদের প্রয়োজন আগেই মানসিক প্রস্তুতি

এই অধ্যায় পড়ে আমরা কেউ কেউ ঘাবড়ে যেতে পারি বা মনের মধ্যে নানা রকম চিন্তা এবং প্রশ্ন আসতে পারে। হতে পারে সেটা ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা। যেমন ঃ

- আমার সন্তানতো অনেক ভাল এবং ভদ্র। আমার সন্তানের মধ্যে তো এ সকল দোষত্রুটি নেই, কেন এসব কথা বলা হচ্ছে?
- আমার সন্তানতো ইসলামিক মাইন্ডের, আমার সন্তানতো আমার বাধ্য। আমরা মা-বাবারাও ইসলামিক মাইন্ডের। আমরা সবাই সলাত আদায়কারী। তাহলে সমস্যা কোথায়?
- এতো নেগেটিভ কথা বলা হচ্ছে কেন? আমাদের সন্তানদের মধ্যে তো অনেক ভাল গুণও আছে। আর নেগেটিভ কথাগুলো এতো সরাসরি বা এতো কঠিন করে বলা হচ্ছে কেন?

ভুল ধারণার অবসান

মা-বাবাদের প্রতি অনুরোধ এই অধ্যায় পড়েই যেন কেউ ভুল ধারণা পোষণ না করি। হয়তো এই সমস্যা আমার সন্তানদের নিয়ে নেই, হয়তো আমার সন্তান এখনো অনেক ছোট, বা আমার সন্তান স্কুল কলেজ পাশ করে ফেলেছে অথবা আমার এখনো সন্তান হয়নি। এই সমস্যাগুলো যে শুধু আমার একার তা হয়তো না, হতে পারে এটা অন্য কারো। আসলে এ চিত্র শুধু যে মুসলিমদের মাঝে তাও নয়, হতে পারে এটা মুসলিম-অমুসলিম সব দিকেই আছে। আমাদের সকলের দায়িত্ব একে অপরকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করা।

আমাদের সন্তানেরা এই প্রতিকূল পরিবেশে ইসলামিক স্কুলে পড়তে পারলে ভাল, না পারলে অবশ্যই সাধারণ স্কুলে পড়বে। সাধারণ স্কুল থেকে সব ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে ইসলামিক স্কুলে ভর্তি করে দিতেও বলা হচ্ছে না।

এটাই বুঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে সাধারণ স্কুলে পড়েও আমাদের সন্তানরা কিভাবে একজন ভাল একাডেমিক হওয়ার পাশাপাশি একজন ভাল মুসলিম হতে পারে। এটাই স্বাভাবিক, কোন মা-বাবা নিজ সন্তানদের সম্পর্কে নেগেটিভ কথা শুনতে পছন্দ করেন না। কিন্তু কিছু কিছু সত্য কথা সরাসরি না বললে ভালভাবে বুঝা যায় না এবং অনুধাবনও করা যায় না।

তাই বুঝার সুবিধার্থে এই বইতে অনেক সত্য কথা এবং সত্য ঘটনাই সরাসরি উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এই কথাগুলো যে সবাইকে বলা হচ্ছে ব্যাপারটাও তা নয়। একজন সচেতন মুসলিম হিসেবে আমাদের সকলেরই দায়িত্ব সমাজের কল্যাণের কথা চিন্তা করা। ঘটনা ঘটবার আগে নিজেরা সচেতন হওয়া এবং অপরকে সচেতন করা। আর এটাই আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে প্রতিটি মু'মিনের দায়িত্ব। তাই আসুন পুরো বইটি খুব মনোযোগের সাথে পড়ার চেষ্টা করি এবং বাস্তব ভিত্তিক সমাধানের চিন্তা করি।

মা-বাবার আচরণ সন্তানদের মনে প্রভাব ফেলে

১) আমরা স্বামী-স্ত্রী কি সন্তানদের সামনে ঝগড়া-ঝাটি করি?
২) আমরা কি একে অপরকে রাগের মাথায় গালাগালি করি বা জিনিসপত্র ভাঙ্গি?
৩) আমরা স্বামী-স্ত্রী কি সন্তানদের সামনে মিথ্যা কথা বলি?
৪) আমরা কি একজন আরেক জনের বদনাম সন্তানদের নিকট বা অন্যের নিকট করি?
৫) আমরা কি প্রতিবেশী বা আত্মীয়-স্বজনের গীবত করি?
৬) আমরা কি অন্যের হক নষ্ট করি?
৭) আমরা কি অবৈধ ইনকাম বা ব্যবসার সাথে জড়িত?
৮) আমরা কি টিভিতে আপত্তিকর মুভি বা অনুষ্ঠান দেখি?
৯) আমরা কি সন্তানদের সাথে দুর্ব্যবহার করি বা গায়ে হাত তুলি?
১০) আমরা সন্তানদেরকে দিয়ে কি মিথ্যা কথা বলাই?

নিম্নের ভিডিও লিংকটি থেকে আমরা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারি যে, কিভাবে আমাদের সন্তানদেরকে দিয়ে মিথ্যা কথা বলাই।

Shishu Lalon Palon:
https://www.youtube.com/watch?v=ib-a0a0_sdk

মা-বাবাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন

১. সন্তানের বন্ধুদের যেন বাসায় আসতে দেই এবং আমিও তাদের সাথে নিয়মিত মেলামেশা করি।
২. সন্তানের পারসোনাল রুমে টিভি বা কম্পিউটার না দিয়ে কমোন জায়গায় রাখার চেষ্টা করি। (যেমন ড্রইং রুমে বা লিভিং রুমে)
৩. মাঝে মাঝে স্কুল এবং কলেজে গিয়ে খোঁজ-খবর নিতে পারি এবং শিক্ষক-শিক্ষকাদের সাথে কথা বলতে পারি।
৪. টিভিতে আজেবাজে হিন্দি মুভি এবং সিরিয়াল দেখা বাদ দেই এবং শয়তানের হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করি।
৫. কখনো অন্য কোন পরিবারের সাথে দুনিয়াবি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় না করি।
৬. মা-বাবারা ইসলামিক মাইন্ডেড পরিবারের সাথে বন্ধুত্ব করি।
৭. বাড়িতে নিয়মিত কুরআন-হাদীসের আলোচনা ও সলাত আদায় করার পরিবেশ তৈরী করি।
৮. সন্তানদেরকে কখনো মিথ্যা আশ্বাস না দেই। যেমন ঃ এই কাজটা করলে ঐ জিনিসটা দিব কিন্তু দেখা গেল যে সে কাজটি করল কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা ঠিক রাখলাম না। এই ধরনের আচরণ সন্তানদের মনে প্রভাব ফেলে।

আমার সন্তানের শিক্ষা কিন্তু থেমে নেই

আমাদের হিউম্যান ব্রেইন কম্পিউটারের মতোই কাজ করে। কম্পিউটার আসলে আমাদের ভাষা বুঝে না, তার নিজস্ব কোড ল্যাংগুয়েজ রয়েছে সিপিউতে (Central Processing Unit) যাকে বলে মেশিন ল্যাংগুয়েজ। আমরা যখন কিবোর্ডের মাধ্যমে কম্পিউটারকে ইনপুট দেই তখন তা সিপিউতে গিয়ে তার নিজস্ব কোড ল্যাংগুয়েজে প্রসেস হয় এবং তারপর তা মনিটর দিয়ে আমাদেরকে সুন্দর আউটপুট দেখায়। ঠিক তেমনি আমার সন্তানকে আমি কিছু শিখাচ্ছি না বলে এটা ভাবা যাবে না যে সে কিছু শিখছে না। সে আশেপাশের পরিবেশ, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, টিভি, রেডিও, ইন্টানেট হতে সচেতন ও অবচেতন মনে প্রতিনিয়ত কোন না কোন কিছু শিখছে। তারপর সেগুলো তার ব্রেইনে গিয়ে কম্পিউটারের সিপিউর মতো প্রসেস হচ্ছে এবং শেষে তার চরিত্র দিয়ে আউটপুট বের হচ্ছে।

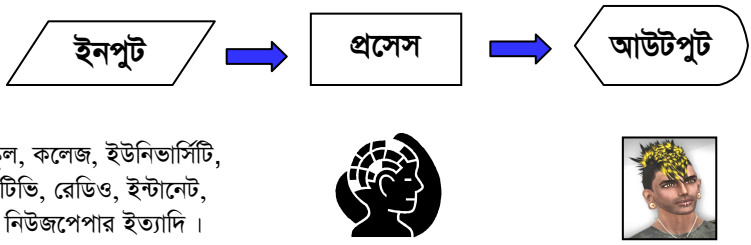

ইসলাম হলো Complete Code of Life, আমি যদি কোডগুলি না-ই জানি তাহলে সে কোড মানবো কিভাবে? অন্তত দৈনন্দিন জীবনের কোডগুলি না জানলে যে কোন সময় মহান আল্লাহর কাছ থেকে যে কোন শাস্তি আসতে পারে। তখন যদি বলি আমি তো কোডগুলি জানি না তাহলেও কোনভাবেই রেহাই পাওয়া যাবে না। ইসলামের কোডগুলির চূড়ান্ত সোর্স হলো আল-কুরআন ও সুন্নাহ। আর আমরা সলাতে প্রতিনিয়তই সে কোডগুলি পড়ছি। এখন দরকার কোডগুলি অর্থসহ পড়া। এর জন্য প্রয়োজন তাফসীরের এবং সংকলিত সহীহ হাদীসের বিস্তারিত অধ্যয়ন।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার করে বোঝানো যাক। 'ক' নামের একটি ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া ছেলে শপিং মলে একটি দোকানে তার সামনে একটি মেয়েকে দেখে তার রূপে মোহিত হয়ে সে রূপ অবগাহনে লিপ্ত হলো। মেয়েটির শরীর আংশিক খোলা থাকার কারণে তার নজর বার বার সেই মেয়েটির দিকে ফিরে যাচ্ছে। অপর একটি ছেলের নাম 'খ'। একই শপিং মলে ঐ দোকানে মেয়েটিকে একবার দেখে তার দৃষ্টিকে অবনত করে নিল। আরেকবার দৃষ্টি দেয়ার সাথে সাথে তার একটি কোড (হাদীস) এর কথা মনে পড়ল। যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রী ব্যতীত অপর কোন নারীর দিকে কুদৃষ্টিতে তাকায় তাহলে পরকালে তার চোখে গলিত সীসা ঢেলে শাস্তি দেয়া হবে। এ কোড মনে আসার সাথে সাথে 'খ' তার দৃষ্টিকে একেবারে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসল, আর তাকালোনা। এখানে 'ক' কোড ভঙ্গ করল আর 'খ' কোড মেনে খারাপ কাজ হতে বিরত থাকলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"মু'মিন পুরুষদেরকে বলুন, যেন তারা নিজেদের চোখ নিচু রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। এটাই তাদের জন্য বেশি পবিত্র নিয়ম। তারা যা কিছু করে আল্লাহ এর খবর রাখেন।" (সূরা নূর ২৪ ঃ ৩০)

এভাবে জীবনের প্রায় সকল অঙ্গনে একজন ঈমানদার আল্লাহ নির্ধারিত আচরণ বিধির সম্মুখীন। আল্লাহ এ আচরণবিধি দিয়ে যুগে যুগে নাবী-রসূলদের পাঠিয়েছেন। নাবী-রসূলগণ এ আচরণবিধির কেবল থিওরীই বলে যাননি, সঙ্গে এর প্রাকটিক্যালও করিয়ে দেখিয়ে গেছেন। মানুষ সেসব বিধি মেনে নিজেকে অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুত করেছে। অথবা কোড ভঙ্গ করে শাস্তির যোগ্য হয়েছে। সারাজীবন এ আচরণ বিধি মেনে আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করে পরকালীন পাথেয় অর্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। আসুন আত্মগঠনের প্রক্রিয়ায় আমরা নিজেদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমগুলি মেনে চলতে চেষ্টা করি, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ইত্যাদি ক্যাটাগরীর কাজগুলি মেনে নিজেদের মেধা ও চরিত্রকে তৈরী করি।

এ যুগের ছেলেমেয়েদের ধারণা

১. এখনকার ছেলেমেয়েরা মা-বাবার চেয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সিদ্ধান্তকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে।
২. এখন তারা ইন্টারনেটকেই সকল রিক্রিয়েশনের আঁধার মনে করে।
৩. বলিউড-হলিউডকে সকল বিনোদনের হেডকোয়ার্টারস মনে করে।
৪. টিভি চ্যানেলগুলোকে একমাত্র সুস্থ স্বাভাবিক শিক্ষার উৎস মনে করে।
৫. আমেরিকান আইডল আর ইন্ডিয়ান আইডলকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও অবশ্যই দর্শনীয় অনুষ্ঠান মনে করে।
৬. ইউরোপ আমেরিকাকে সভ্যতা আর মানবাধিকারের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত তীর্থস্থান মনে করে।
৭. তারা ফ্যাশন শোতে অংশগ্রহণ এবং মডেল হওয়াকে খুব গর্বের কাজ মনে করে।
৮. তারা ইসলামকে টেররিজম ভাবে, এবং ইসলাম পালন করাকে ব্যাকডেইটেড বা অপশনাল বলে মনে করে।
৯. তারা ব্যান্ড মিউজিক এবং হ্যাভিমেটাল মিউজিককে একপ্রকার ইবাদত মনে করে।
১০. তারা বিভিন্ন স্টার ও ক্রিকেট খেলোয়াড়কে অনুসরণ করে এবং তাদেরকে গুরু মনে করে।
১১. তারা উল্টা-পাল্টা কাজ কারবারকে আধুনিকতা মনে করে।

১২. তারা শবে কদর-এর রাত্রির চাইতেও 31st December night-কে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে ।

১৩. তারা Happy New Year এবং Valentines Day পালন করা জরুরী মনে করে ।

১৪. আরো ভয়ংকর কথা এই যে, তারা তাদের ছোট-বড় সকল অপকর্মগুলিকে অনলাইনে বিনা দ্বিধায় প্রচার করে । এই প্রচার হয়ে থাকে লিখিত আকারে, ছবি পোস্ট করে, অনেক সময় ভিডিও প্রচার করে ।

আমাকে একদিন চরম মাশুল দিতে হবে

এ যুগের মা-বাবারা সন্তানদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ব্যর্থ হলে এর জন্যে একদিন চরম মাশুল দিতে হবে । সন্তানরা দ্বীনি শিক্ষার অভাবে নিজেদের মস্তিষ্কে মা-বাবার ব্যাপারে এমন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে যার জন্য সেসব মা-বাবাকেই দোষ দিতে হয় । কারণ সকল মানুষই জীবনের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন না কোন নিয়ম অনুসরণ করে । মা-বাবা যদি জীবনের কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষা না দিয়ে থাকেন তাহলে সন্তানেরা সে বিষয়ে যেখানে যা পায় তাকেই শ্রেষ্ঠ নীতিমালা হিসেবে গ্রহণ করে নেয় ।

ছোট বয়সের সন্তানদের কিছু ভাল দিক

আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সন্তানদের মধ্যে ছোট বয়স থেকে কিছু ভাল চারিত্রিক গুণ থাকে । কিন্তু সে দিন-দিন বড় হওয়ার পাশাপাশি নিজ ঘর থেকে এবং আশে পাশের পরিবেশ থেকে খারাপ অভ্যাসগুলো আয়ত্ত করতে থাকে । বড়দের মধ্যে যে দোষ-ত্রুটিগুলো থাকে তা সাধারণত ছোটছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে থাকে না । যেমন ছোট বয়সে-

- তারা কারো গীবত, পরনিন্দা, পরচর্চা করে না ।
- তারা কারো পিছনে গোয়েন্দাগীরি করে না ।
- তারা সাধারণত অহংকার বা গর্ব করে না ।
- তারা সামাজিক স্ট্যাটাস নিয়ে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠে না ।
- তারা শাড়ি গহনা নিয়ে প্রতিযোগিতা বা একে অপরে হিংসা করে না ।
- তারা অন্যের ভাল দেখলে হিংসা করে না ।
- অন্যের উন্নতি দেখলে তাদের গা-জ্বালাপোড়া করে না ।
- তারা অন্যের উন্নতি ঠেকানোর জন্য পিছন দিক থেকে টেনে ধরে না ।
- তারা কাজে ফাঁকি দেয়া শিখে না ।

আমাদের চাওয়া

তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ (ফিৎনা)।
(সূরা আত-তাগাবুন ঃ ১৫)

চ্যাপ্টার ৫

আমরা সবাই চাই সন্তানরা ভাল হোক, ভাল পথে চলুক

প্রতিটি মা-বাবাই চান তাদের সন্তানরা ভাল হোক, সঠিক পথে থাকুক, তারা ইসলামী মনমানসিকতার হোক। কিন্তু আমাদের এই চাওয়াটা শুধু "One way", অর্থাৎ আমরা মা-বাবারা সবাই চাই সন্তান ভাল হোক কিন্তু আমরা নিজেদের ভাল হওয়ার ব্যাপারে তেমন সচেতন এবং সচেষ্ট নই। আমরা নিজেরা যেভাবে ইচ্ছে চলবো, যেখানে ইচ্ছে যাবো কিন্তু সন্তানদের বেলায় চাই বিনা চেষ্টাতেই তারা সঠিক পথে চলুক যা কখনো সম্ভব নয়।

মাটি যখন নরম থাকে তখন তা দিয়ে যেমন ইচ্ছে তেমন পাত্র তৈরী করা যায়। কিন্তু মাটি শক্ত হয়ে গেলে তখন তা দিয়ে যেমন ইচ্ছে তেমন পাত্র তৈরী করা খুবই কঠিন। পাত্র যদিও তৈরী করা যেতে পারে সেজন্য যথেষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। তাই আমাদের সন্তান যখন কম বয়সের থাকে তখন থেকেই উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। অন্যথায় বড় হয়ে গেলে এই পরিবেশে সঠিক পথে নিয়ে আসা খুবই কঠিন। যাদের সন্তান বড় হয়ে গেছে তাদের তাই বলে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

উদাহরণ ১ ঃ টরন্টোর একটি বাস্তব ঘটনা। একটি ইসলামিক প্রোগামে মা তার ক্লাস নাইনে পড়ুয়া মেয়েকে নিয়ে এসেছেন কিছু ইসলামী কথা শুনানোর জন্যে। প্রোগ্রাম চলছে কিন্তু এক মুহূর্তে এসে ঐ মেয়ের আর এসব কুরআন-হাদীসের কথা ভাল লাগছে না। সে কোনভাবেই বসে থাকতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে না পেরে দুই হাত দিয়ে নিজের দুই কান চেপে ধরে বসে আছে যেন ইসলামের কথা শুনতে না হয়। এখানে মেয়ের কোন দোষ নেই, কারণ সে

ছোটবেলা থেকে এই ধরনের কোন কথা শুনেনি। তাই তার কাছে কুরআনের কথাগুলো ভাল লাগছে না, অসহ্য মনে হচ্ছে। এখানে দোষ মা-বাবার।

উদাহরণ ২ ঃ এটিও টরোন্টর একটি ঘটনা। একটি পরিবার তার সন্তানদের ইসলামের কথা শুনানোর জন্য তার নিজের বাসায়ই একদিন ইসলামিক প্রোগ্রামের আয়োজন করেছেন। ড্রইংরুমে প্রোগ্রাম চলছে কিন্তু বাড়িওয়ালার হাইস্কুলে বা কলেজে পড়ুয়া ছেলেটি প্রোগ্রামে না বসে নিজের রুমে বসে আছে। বাবা বারবার তাকে ডাকছেন কিন্তু আসছে না। এক সময় বাবা ছেলের এক বন্ধুকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন ছেলেকে আনতে। ছেলেটি এবার এসে সকলের সামনে বাবাকে একটি ধমক দিয়ে বলে গেল "বারবার ডাকছো কেন"? তারপর সে প্রোগ্রামে না বসে আবার তার রুমে চলে গেল, বাবা কিছুই বলতে পারলেন না। এই ঘটনায়ও সন্তানের কোন দোষ নেই, সে ছোটবেলা থেকে ইসলামিক গাইড পায়নি। এখন তাকে জোর করে একদিন ইসলামিক প্রোগ্রামে বসিয়ে অ্যান্টিবাইয়টিক দিয়ে লাইনে আনা যাবে না। বিষয়টা একদিনের না।

এমন অনেক মা-বাবা আছেন যারা তাদের সন্তানকে সঠিকভাবে গড়ে তুলেননি কিন্তু সন্তান বড় হবার পর তাকে সঠিক বানাতে চান, ইসলামের পথে আনতে চান। সন্তানকে ইসলামের পথে আনতে চেয়ে সন্তানকে জোর করে হাজ্জে পর্যন্ত পাঠান এই আশায় যে, হাজ্জ থেকে ফিরে এসে সন্তান ভালো সন্তান হয়ে যাবে। অথচ হাজ্জে যাবার সময় ঐ সন্তান ওযূর ফরয কয়টি তাও জানে না, ফরয গোসলের নিয়মও জানে না, সলাতে শুধু উঠা বসাই করতে জানে। যে সকল মা-বাবাদের সন্তানরা এখনো শিশু, তারা অবহেলা করে নিজ জীবন দিয়ে অভিজ্ঞতা নেবার সাহস যেন না করি। এখুনি সচেতন হই।

তাই সকল মা-বাবাদের প্রতি অনুরোধ, আমরা আমাদের সন্তানদের যদি ভাল চাই তাহলে তাদের পাশাপাশি আমাদের নিজেদেরকেও ভাল হওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। তাদেরকে গাইড করার পাশাপাশি নিজেদেরকেও ইসলামিক গাইড অনুযায়ী চলতে হবে। তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা দেয়ার পাশাপাশি নিজেরাও নিয়মিত পড়াশোনা করে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। কারণ আমরা নিজেরা যদি সঠিক পন্থায় না চলি, কুরআনের দেখিয়ে দেয়া পদ্ধতিতে জীবনযাপন না করি তাহলে শুধু সন্তানদের ভাল চাওয়ায় সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাবে না।

বেশীরভাগ মা-বাবার ভুল ধারণা

যদি মনে করি যে ভাল স্কুলে বা ভাল কলেজে বা ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলেই আমি চিন্তা-মুক্ত, এখন কেবল সন্তানের ভাল রেজাল্ট আর ভাল চাকুরীর অপেক্ষা, আর এভাবেই আমার সন্তান একজন বড় কর্মকর্তা হবেন। এভাবে একমুখী (ওয়ান ওয়ে) চিন্তা করলে আমার সন্তান একজন বড় কর্মকর্তা হওয়ার পাশাপাশি একজন অমানুষ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কারণ এখনকার স্কুল কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার এমন কোন ব্যবস্থা নেই যেখানে নীতি নৈতিকতা শেখানো হয় যা ইসলামের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মা-বাবাদের মধ্যে কোন কোন সময় একটি ভুল হিসেব কাজ করে। আমরা মনে করি আমার সন্তান সবসময় আমার কথা শুনবে। এটা সবসময় ঠিক নয়। আমার সন্তান এক স্বাধীন সত্তা। তার নিজস্ব অভিরুচি, ধ্যানধারণা, কল্পনা শক্তি, বোধশক্তি, পছন্দ-অপছন্দের স্বতন্ত্র তালিকা রয়েছে। আমি চাইবো আর সে তা মেনে নেবে এটা সবক্ষেত্রে আশা করা ঠিক নয়। সুতরাং তার জন্য মা-বাবাদের উদাহরণ সৃষ্টি করতে হবে। তাকে কেবল ভাল হওয়ার Theory শিক্ষা দেয়া যাবে না। সাথে Practical ও করাতে হবে। নিজে একটি ভাল কাজ করে তাকে তা উপলব্ধি করার সুযোগ দিতে হবে।

যেমন ঃ আমার গরীব আত্মীয়ের খোঁজ খবর যেন নেই। সামর্থানুযায়ী তাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করি। সন্তানকেও এর গুরুত্ব বুঝিয়ে বলি। নিজে ঘরে ঢুকার সময় সালাম দিয়ে প্রবেশ করি। সন্তানকে প্রতিদিন সালাম দেই। আমাদের সমাজে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ভুল প্রত্যাশা হলো ছোটদের কাছ থেকে সালাম আশা করা। এটা এক জঘন্য বিকৃতি ও সত্যের খেলাফ। আসলে সালামের মাধ্যমে আমি দু'আ করি। আমি তো চাই সন্তানের কল্যাণ। সুতরাং সন্তানকে দেখা মাত্রই যেন সালাম দেই। তাহলে সে খুব সহজে শিখে নেবে। রসূলুল্লাহ ﷺ বেশী বেশী সালামের প্রচলনের জোর তাগিদ দিয়েছেন। এতে করে সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয়। সম্মান বৃদ্ধি পায়।

দ্বীন সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা

ঈমানের অন্যতম দাবী হলো দ্বীনের জ্ঞানার্জন করা। আমার যদি দ্বীন সম্পর্কে নূন্যতম জ্ঞানই না থাকে তাহলে কিভাবে নিজ পরিবারকে দ্বীনের আলোকে

গাইড করবো? কিভাবে সন্তানদের অন্তরে সামান্য হলেও দ্বীনের আলো ঢুকাবো? যুগ পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমার ভাসাভাসা দ্বীনি জ্ঞান দিয়ে উঠতি বয়সের সন্তানদের আর বুঝ দিতে পারবো না।

আমাদেরকে কিছু কুরআনের তাফসীর, সহীহ হাদীস গ্রন্থ, হারাম-হালালের বিধান সম্বলিত বই, কিছু ইসলামী সাহিত্য, রসূল ﷺ -এর জীবনী, সাহাবীদের জীবনী ইত্যাদি জোগাড় করে অধ্যয়ন করে নিতে হবে। তাহলে পরবর্তী জেনারেশনকে দ্বীনের চির-আধুনিক চিত্রটি তুলে ধরা সম্ভব হবে। তা না হলে আমাদের এই চরম সীমাবদ্ধতা ও কেবল বাপদাদার রসম রেওয়াজের জ্ঞান দিয়ে আমরা আমাদের পরবর্তী বংশধরদের দ্বীন হতে দূরে ঠেলে দেবো। আসুন জ্ঞানের সবচাইতে বিশুদ্ধ মাধ্যম কুরআন ও সহীহ হাদীস হতে যাবতীয় সবকিছু জানার ও বুঝার চেষ্টা করি। এভাবে জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পাবো। জীবনকে নতুনভাবে উপভোগ করতে পারবো। তখন উপলব্ধি হবে যে জীবন মানে কেবল সকালে ঘুমঘুম চোখে অফিসে দৌড়ানো নয়। জীবন মানে কেবল সংসারের ঘানি টানা নয়। জীবন মানে শুধু অর্থ কামাই করাই নয়। এর বাইরে জীবনের বিশাল ক্ষেত্র রয়ে গেছে। সেগুলি আরো আনন্দদায়ক, আরো চ্যালেঞ্জিং, আরো কালারফুল। তখন বুঝবো আসল মানবপ্রেম কাকে বলে। দেখবো দুনিয়াটা কতগুলি সূদী মহাজনের নেতৃত্বে চলছে। বুঝবো তারা আমাদের যে মূল্যবোধ গিলাচ্ছে তা কতগুলি অখাদ্য আর কুখাদ্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ রয়েছে আল কুরআনে। মানুষ পরিচালনার জন্য রয়েছে উন্নত মানবিক পদ্ধতি। তখন আফসোস করবো বর্তমানের অর্থহীন বস্তুপূজার জন্য। সময় নষ্ট করার অভিযোগে নিজেকে তিরস্কার করবো। দ্বীনের বিশাল এ নিয়ামত হতে বঞ্চিত করার জন্য নিজেকে নিজে ভর্ৎসনা করবো। কেবল ৩৩ মার্কস পেয়ে পাশ করার ছোট মনের চিন্তা হতে বেরিয়ে লেটার মার্কস পেয়ে আল্লাহর প্রিয় হবার লোভনীয় বাসনা জাগবে। দেখবো জীবনের রুটিন ও স্টাইল আগাগোড়া পরিবর্তন হয়ে গেছে। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন। আমিন।

আমরা সন্তানদের সবসময় ছোট মনে করি

আমার সন্তান একটি স্বতন্ত্র সত্ত্বা। মা-বাবাদের একপেশে স্বভাব হলো সন্তানদের সবসময় ছোট মনে করা। আমরা প্রায় এরকম মন্তব্য করি যে,

আমার ছেলে এখনো অল্প বয়স্ক, সে আর একটু বড় হোক তারপর নিয়মকানুনের ব্যাপারে কঠোর হওয়া যাবে। আমরা মা-বাবারা মনে করি সন্তানগণ সবসময় আমাদের কথা শুনবে। এ একটি ভুল ধারণা। আমার দৃষ্টির আগোচরে সন্তানগণ বড় হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একদিন টের পাওয়া যাবে যে সে আর আমার কথা শুনছে না। আমার যৌক্তিক দাবীগুলিও মানছে না। আমাকে হেয় করা শুরু করেছে। তখন আর কিছু করার সময় থাকবে না। পারিবারিক, ধর্মীয় ও সামাজিক কোন মূল্যবোধে যদি আমি বিশ্বাস করি তাহলে সেগুলিতে ছোটকাল হতেই অভ্যাস করাতে হবে।

বিত্তবান মা-বাবাদের অবস্থা আরো করুণ। তাদের জন্য আফসোস। যে অর্থের পেছনে ছুটে তারা সন্তানদের সময় দেন না, পরবর্তীতে সে অর্থকে অনর্থের মূল বলে মনে করতে থাকেন। বেলাশেষে আফসোস করেন কিন্তু তখন বেশ দেরী হয়ে যায়। বিত্তশালী পরিবারগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্তানদের অতিরিক্ত স্বাধীনতা দিয়ে ক্ষতি করেন। কিন্তু শেখার এ সময়টিতে মা-বাবারা সন্তানদের প্রাচুর্যে ভাসিয়ে দেন। ফলে সন্তানদের মধ্যে প্রতিকূল পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা সৃষ্টি হয় না। কঠিন অবস্থায় নিজেকে সামলিয়ে চলার শিক্ষার অভাবে সে খেই হারিয়ে ফেলে।

কিছু পারিবারিক নিয়ম থাকা উচিত

ভুক্তভোগী মা-বাবারা নিজেদের বিষয়গুলির ব্যাপারে যতটা আপোস করেন তার চাইতে বেশী আপোস করেন সন্তানদের বিষয়াদিতে। আর খারাপ কাহিনীর শুরু এখান হতে। প্রাত্যহিক জীবনের চাহিদা পূরণে আপোস, পারিবারিক মূল্যবোধ ধরে রাখার ক্ষেত্রে অবহেলা, সন্তানদের বন্ধুবান্ধব নির্বাচনে একেবারে লাগামহীন স্বাধীনতা দান, করণীয়সমূহের লিষ্টে ধর্মীয় শিক্ষাদানকে সবকিছুর পেছনে রাখা, মা-বাবাদের একান্ত নিজস্ব বিষয়গুলির প্রতি উদাসীন থাকা, সন্তানদের আলাদা সত্তার স্বীকৃতি না দেয়া, সন্তানদের অন্যায় আবদার মেনে নেয়া ইত্যাদি হলো পরিবার নামক দেহে ক্যান্সারের প্রাথমিক লক্ষণ।

প্রত্যেকটি পরিবারের কিছু অলিখিত মূল্যবোধ বা ঐতিহ্য রয়েছে। পরিবারের কর্তাগণ যদি সে মূল্যবোধগুলির ব্যাপারে মনোযোগী হন তাহলেই একটা বড় ধরনের লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যায়। যেমন কোন কোন পরিবারে এ নিয়ম রয়েছে যে স্কুল পড়ুয়া সন্তানগণ কোন অবস্থাতেই অনুমতি ছাড়া মাগরিবের পর ঘরের

বাইরে থাকতে পারবে না। এটিও কম নয়। এ বিষয়টিও এমন যে আমেরিকার সরকার কোন কোন অঙ্গরাজ্যে কার্ফিউ জারী করে স্কুল পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের ঘরের ভেতর থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে। আর এ সংক্রান্ত গবেষণায় ৫৩৪টি আমেরিকান শহরে সান্ধ্যকালীন কারফিউ সম্পর্কে জনতার যে মতামত পাওয়া গেছে তা এই ঃ শতকরা ৯৭ ভাগ শহরবাসী বলেছেন কারফিউর ফলে শিশু অপরাধ অনেক কমেছে; ৯৬ ভাগ বলেছেন কারফিউর কারণে ফাঁকিবাজী কমেছে; ৮৮ ভাগ বলেছে কারফিউ মাস্তানি কমিয়েছে; কারফিউর ফলে ৫৬ ভাগ শহরে বড় ধরনের অপরাধ কমেছে। অতএব আমার পরিবারে যদি এ ধরনের কোন ঐতিহ্য থেকে থাকে তাহলে তা শিথিল যেন না করি। বরং আরো কড়াকড়িভাবে সন্তানদের এ নিয়ম পালনে উৎসাহিত করি। তারা যদি এ নিয়ম পালন করে তাহলে পুরস্কৃত করতে পারি।

পারিবারিক সিটিং বা বৈঠক

পারিবারিক শিক্ষা একজন মানুষের ভিত তৈরী করে। এ শিক্ষা এত শক্তিশালী যা একজন ব্যক্তির সারাজীবনের জন্য দিক নির্দেশনার কাজ করে। সাপ্তাহিক বন্ধের দিন সকালে নাস্তার টেবিলে সম্ভব হলে দুই ঘন্টা সময় নিয়ে বসা উচিত। সাথে পরিবারের সকল সদস্য। স্ত্রী, সন্তান ও অন্য কেউ যদি থেকে থাকে। সকলকে নিয়ে সুন্দর আনন্দঘন পরিবেশে নাস্তা শুরু করা যেতে পারে। পারিবারিক বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে। খোলামনে, আন্তরিকতার সাথে। পরস্পরকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে কোন সমস্যা আছে কিনা। সন্তানদের একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা যেতে পারে।

এরপর কুরআনের তাফসীর নিয়ে বসা যেতে পারে। সূরা ফাতিহা দিয়ে শুরু। সূরা ফাতিহার সরল অর্থ সবাইকে শুনানোর পর এর তাফসীর শুরু করতে হবে। সকলকে প্রতিটি আয়াতের অর্থ ও এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এক এক করে শুনানো যেতে পারে। জিজ্ঞেস করতে হবে কারো কোন কিছু যোগ করার আছে কিনা। সকলকেই বলার সুযোগ দিতে হবে। তারপর সূরা ফাতিহার শিক্ষা বাস্তব জীবনের আলোকে মিলানোর চেষ্টা করতে হবে। এ কাজটি প্রতি সপ্তাহে করতে হবে। একেক সপ্তাহে একেক সূরা নিয়ে আলোচনা হবে। পারিবারিক বৈঠকের উদ্দেশ্য থাকবে পরস্পর সম্পর্ক বৃদ্ধি ও আদর্শ পরিবার গঠন।

বাসায় সন্তানদের জন্য লাইব্রেরী করে দেয়া

মুম্বাইতে ডা. জাকির নায়েক-এর একটি কোয়ালিটি সম্পন্ন ইসলামিক স্কুল আছে। ডা. জাকির নায়েক তার একটি প্রোগ্রামে বলেছিলেন যে, এই স্কুল থেকে তার চেয়েও আরো উন্নতমানের শতশত জাকির নায়েক বের হবে ইনশাআল্লাহ। এই স্কুলে সন্তান ভর্তি করার পূর্বশর্ত হচ্ছে "বাড়ি থেকে ডিশ এন্টেনার লাইন আগে কাটতে হবে"। সন্তানের চরিত্র গঠনে একটি ভারসাম্যপূর্ণ স্ট্রাটেজীর অংশ হিসেবে হলিউড, বলিউডের কুখাদ্যের বিপরীতে যে সামান্য কিছু নৈতিকতার উপকার আমরা পেতে পারি তার মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ হলো একটি "ফ্যামিলি লাইব্রেরী" প্রতিষ্ঠা। এছাড়া ইসলামিক টিভি চ্যানেলগুলোর মেম্বার হতে পারি। ইন্টারনেট থেকেও নিয়মিত ফ্রী Peace TV দেখতে পারি।

ছোটদের উপযোগী ইসলামিক ডিভিডি, ভিসিডি ইত্যাদি সংগ্রহ করতে পারি। আল-কুরআনের তাফসীর, সহীহ হাদিস গ্রন্থ, রসূল ﷺ এর জীবনী, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী সমাজ, চার খলিফার বিস্তারিত জীবনী, সাহাবীদের জীবনী, অন্যান্য নাবীদের জীবনী, Comparative religion, ইসলামী শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ের বই দিয়ে নিজ ঘরে একটি পারিবারিক লাইব্রেরী তৈরী করতে পারি। নিজে যেন পড়ি ও সন্তানদের পড়ার উৎসাহ প্রদান করি।

সন্তান প্রতিপালনে মুসলিম ও অমুসলিম মায়ের পার্থক্য

ইসলাম থেকে বঞ্চিত মা (অমুসলিম মা) তার সন্তান প্রতিপালন সম্পর্কে যা কিছু চিন্তা করে তা এ নশ্বর দুনিয়া পর্যন্তই সীমিত। মৃত্যুর সীমানা পার হয়ে তার দৃষ্টি অনন্ত জগত পর্যন্ত প্রসারিত হয় না। নিজের সন্তান হওয়ার কারণে সে তার শিশুর লালন-পালন করে। তার অন্তরে সন্তানের প্রতি মমত্ববোধের সীমাহীন আবেগ রয়েছে। সে এ চিন্তা করে যে, সন্তানের মাধ্যমে তার বংশ টিকে থাকবে অথবা সন্তান বড়ো হয়ে তাকে আরাম ও শান্তি দেবে এবং তার সাহায্যকারী হবে। এ ধ্যানধারণার বশবর্তী হয়ে সে নিজের সন্তানকে এমনভাবে প্রতিপালন করে যাতে সে পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে সার্থক জীবনযাপন করতে পারে। আমাদের সমাজে এমন অনেক মা আছেন অর্থাৎ যারা ইসলাম প্র্যাকটিস করেন না তাদের মধ্যে আর অমুসলিম মায়ের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা আর কাজের মধ্যে তেমন একটা পার্থক্য দেখা যায় না।

কিন্তু মুসলিম ও অমুসলিম মায়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। একজন প্রকৃত মুসলিম মা (যিনি ইসলাম প্র্যাকটিস করেন) সন্তান প্রতিপালনকে তিনি একটি দ্বীনি দায়িত্ব এবং আখিরাতের মুক্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম মনে করেন। সন্তানকে প্রাচুর্যপূর্ণ আরামদায়ক একটি জীবন উপহার দেবার লক্ষ্যে তারা সন্তানকে প্রতিপালন করেন না। তারা নিজের অভিভাবকত্বে এমন মু'মিন তৈরী করেন যাদের দৃষ্টি সুদূর প্রসারী হবে, যারা দুনিয়ায় আল্লাহর মর্জি মুতাবেক জীবন কাটানো এবং আখিরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেকে ঐভাবে পরিচালিত করবে।

তাই একজন প্রকৃত মুসলিম মায়ের নিকট সন্তান প্রতিপালনের প্রশ্নটি শুধু পার্থিব দুনিয়ার ব্যাপারই নয়, বরং তার ভালোমন্দের প্রভাব সে জীবনেও প্রতিভাত হবে। তার চিন্তা ভাবনা হলো, তিনি যদি সন্তানকে ইসলামী ধ্যানধারণায় গড়ে তোলেন এবং ইসলামী নির্দেশ মোতাবেক লালন-পালন করেন তা হলে তার এই জীবন এবং পরকালীন জীবন দুই-ই সুন্দর হবে। আল্লাহ তার উপর খুশী হবেন এবং তাকে এই পৃথিবীতে শান্তি দেবেন এবং পরকালে জান্নাত দান ও পুরস্কারের বারি বর্ষণ করবেন। যদি তিনি এ দায়িত্ব পালনে দুর্বলতা দেখান অথবা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সন্তানদের গড়ে না তোলেন তাহলে পরকালে লজ্জিত হবেন এবং আখিরাত নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হবেন এবং শাস্তি দেবেন।

এ ধরনের চিন্তা ও কর্মের সবচেয়ে বড় উপকারী দিক হলো যে, সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি সন্তান মায়ের আকাঙ্ক্ষা পূরণে অক্ষম হন, তাহলেও সে মা লজ্জিত হন না। তিনি নিরাশও হন না এবং তার কাজে ভাটা পড়ে না। বরং এ আস্থায় তিনি সবসময় বলীয়ান থাকেন যে, দুনিয়ায় যদি সন্তান তার আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থও হয় তবুও তিনি আল্লাহর নিকট যে প্রতিদানের প্রত্যাশী তা তিনি পূরণ করবেন। তিনি বড়ো শক্তিশালী। তিনি বান্দার সুন্দর কাজের পুরোপুরি প্রতিদান দেন এবং কখনো বান্দাকে প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করেন না।

"স্ত্রী স্বামীর ঘরের তত্ত্বাবধায়ক এবং জিম্মাদার। যেসব ব্যক্তি ও বস্তুর তত্ত্বাবধায়ক তাকে বানানো হয়েছে সে ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

সন্তানকে মানুষ করার পিছনে মায়ের কর্তব্য

অতি ছোট অবস্থা হতে সন্তানদের লালন-পালনে মায়ের উপস্থিতি ও সঙ্গ খুবই প্রয়োজন। পশ্চিমা সংস্কৃতি ও সভ্যতার গুরুরা মহিলাদের সমঅধিকারের কথা বলে এক প্রকার উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এতে কোন কোন শিক্ষিতা মহিলা শুধুমাত্র ঘর-সংসার করাটাকে সময় ও শ্রমের অপচয় বলে মনে করে থাকেন। এটি একটি সামাজিক উম্মাদনা ও শোষণ। আর মহিলারা নিজেদের স্বকীয়তা ভুলে কেবল প্রচারণা আর অপসংস্কৃতির ফাঁদে পড়ে একই শ্লোগান শুরু করেন। তারা ঘরে থাকাটাকে অপেক্ষাকৃত নীচু কাজ মনে করেন। এতে কয়েকটি ধীরগতির বিপর্যয় শুরু হয়। একটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, একজন শিশু সন্তান ক্ষতিগ্রস্ত হয়, একজন মা শোষিত হন (যদিও তিনি তা মনে করেন না)। পরিণতিতে সমাজের সকল শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে গোটা জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

যে পশ্চিমা সংস্কৃতি এ সমঅধিকার নামক আগুনের স্রষ্টা তারাই আবার প্রমাণ করছে যে শিশু সন্তানগণ মায়ের অনুপস্থিতি-তে চরম মানসিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। একটি উন্নত দেশ যেখানে শতকরা সর্বোচ্চ হারে মেয়েরা পুরুষের পাশাপাশি সর্বত্রই কাজ করে, সম্প্রতি একটি সমীক্ষা চালিয়ে নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেছে।

দুই হাজার শিশুর উপর জরিপ চালানো হয়। এ জরিপ চলে টানা তিন বছর ধরে। এতে দেখা যায়, যেসব শিশু দিনভর তাদের মা ছাড়া অন্য কারো দ্বারা লালিত-পালিত হয়, যেমন ঃ ডে কেয়ার সেন্টার, মেইড ইত্যাদি - তাদের সার্বিক বেড়ে উঠা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা অন্যদের তুলনায় দ্বিগুণ। Doctor Bernadine Woo (যিনি এ জরিপ পরিচালনা প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন) বলেন, দিনের সিংহভাগ সময় মায়ের অনুপস্থিতিতে শিশুরা যথাযথ মনস্তাত্বিক সাপোর্ট পায় না, ফলে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ঠিকমত গড়ে উঠে না। Institute of Mental Health-এর Deputy Chief Dr. Daniel বলেন, শিশুদের দেখাশুনার জন্য প্রথম ৬ বছর একজন সঙ্গী বা তদারককারী দরকার যিনি নিয়মিত/সার্বক্ষণিক শিশুর পরিচর্যা করবেন, শিশুকে সঙ্গ দেবেন ও তার যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। আর এটি সম্ভব মাকে দিয়ে। এ জরিপে আরো বলা হয়, শিশুদের মনস্তত্ব দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় যখন তারা একেক সময় একেকজনকে মূল পরিচর্যাকারী হিসেবে দেখতে পায়। ফলে অন্যদের তুলনায় তারা নিম্ন IQ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তিনগুণ।

এটি মাত্র একটি জরিপের ফলাফল। এ ধরনের সকল জরিপ একই কথা বলে। মূল কথা একটাই। শিশুদের পরিচর্যার জন্য মায়ের কোন বিকল্প নেই। এখন সিদ্ধান্ত আমার। আমার শিশুর অধিকার রক্ষা করে তার সার্বিক উন্নতিতে ভূমিকা রাখবো নাকি বাইরে চাকুরী করে সংসারের স্টেটাস ঠিক রাখার জন্য টাকা কামাবো?

মহিলাদের চাকুরী করার কারণে সংসারে উপরি আয় হয়। রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সূচক উর্ধে উঠে। ঘরে ও বাইরে যন্ত্র আর বাহ্যিক চাকচিক্যের সমাগম ঘটে। কিন্তু এরজন্য যে মূল্য দিতে হয় তা কি একেবারে কম? সর্বপ্রথম এ বিষয়টি মহিলারা বুঝেন না যে, চাকুরী করে তারা শোষণের শিকার হচ্ছেন। পুরুষরা চাকুরী করে একটি। তাদের প্রাকৃতিক স্বভাবই ঘরের বাইরের কর্মচাঞ্চল্য। শতকরা ১জন পুরুষও পাওয়া যাবে না যিনি সারাদিন অফিস বা ব্যবসায়ের কাজ করে ঘরের কাজে যথাযথ ভূমিকা পালন করে স্ত্রী ও পরিবারকে সহায়তা করছেন। কেউ কেউ আবার যুক্তি দেখান যে পুরুষরা বাহির হতে বাসায় এসে ক্লান্তশ্রান্ত দেহে ঘরের কাজে সহযোগিতার শক্তি থাকে না।

এবার আসি স্ত্রীদের কথায়। স্ত্রীগণ কোন অবস্থাতেই নিজ বাসার সার্বিক দায়-দায়িত্ব হতে মুক্ত হতে পারবেন না। স্ত্রী যত বড় চাকুরীই করুক না কেন, বাইরে যত ব্যস্ত সময়ই কাটান না কেন, তিনি সন্তান পালন, রান্না, তার ঘরের সৌন্দর্য রক্ষা, বাসা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও সার্বিক অবস্থার দেখভাল করার সহজাত মানসিকতা হতে কখনো মুক্ত হতে পারবেন না। এবার দেখি, পুরুষ কয়টি চাকুরী করছেন আর স্ত্রী কয়টি চাকুরী করছেন? পুরুষ আসলে চাকুরী করছেন একটি। আর স্ত্রী করছেন তিনটি। একটি অফিসের চাকুরী, একটি ঘর দেখাশুনার সার্বিক চাকুরী, আরেকটি সন্তানদের দেখাশুনার চাকুরী । এটি কি নারী শোষণ নয়?

অতএব সন্তানের মা যাই করেন না কেন, সন্তানদের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যদি তিনি কাছে থাকতে না পারেন তাহলে এটা একটা বিরাট অবিচার। সন্তানদের সঠিকভাবে বেড়ে উঠার জন্য, প্রকৃত শিক্ষালাভের স্বার্থে, একজন প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার লক্ষ্যে মাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সন্তানদের সামনে অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত থাকা

আরো একটি ক্ষতিকর বিষয় হলো সন্তানদের সামনে অন্যায় কাজ করা ও তা নিয়ে আলোচনা করা। এতে কচি ছেলেমেয়েদের কোমল মনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়ে। ফলে তারা অন্যায় কাজ করার মনমানসিকতা নিয়ে বড় হয়। পরবর্তীতে মা-বাবারা অবাক হয়ে দেখেন কিভাবে সন্তানরা অন্যায় কাজ করছে। প্রকৃত কথা হলো সন্তানগণ এ অন্যায়গুলি শিখেছে তাদের মা-বাবার কাছ থেকে। যেমন ঃ মা-বাবারা অবৈধ ইনকাম করে থাকেন, সরকারকে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে থাকেন, মিথ্যা কথা বলে থাকেন, সবসময় অন্যের সমালোচনা বা গীবত করে থাকেন, অন্য পরিবারের ক্ষতি করে থাকেন, স্বামী-স্ত্রী প্রায়ই ঝগড়া-ঝাটি করে থাকেন, টিভিতে আপত্তিকর অনুষ্ঠান দেখে থাকেন ইত্যাদি।

উদাহরণ ১ ঃ যেমন কেউ একজন ফোন করেছে আমার কাছে, আমার সন্তান ফোন রিসিভ করে আমাকে বলছে বাবা তোমার ফোন। আমি আমার সন্তানকে বলছি 'বল বাবা বাসায় নেই'। এতে সন্তান অবাক হয়ে চিন্তা করে এটা কেমন কথা! বাবা বাসায় থেকে বলছে সে নেই! সন্তান তখন অংক মিলাতে পারে না।

উদাহরণ ২ ঃ যেমন কেউ একজন আমাকে ফোন করেছে রাত ১১টার দিকে। আমি ফোন রিসিভ করেছি এবং যিনি ফোন করেছেন অপর প্রান্ত থেকে তিনি বলছেন 'এতো রাতে ফোন করে বিরক্ত করলাম না তো?' আমি উত্তরে বলছি 'না না বিরক্ত হইনি'! কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ফোনে কথোপকথোন শেষে স্ত্রী-সন্তানদের সামনে বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করছি যে 'ব্যাটা ফোন করার আর সময় পেল না!' এখানেও সন্তান অবাক হয়ে বাবাকে দেখে যে বাবা ভদ্রলোককে ফোনে বলল 'না বিরক্ত হইনি' কিন্তু এখন বলছে পুরো বিপরীত! এখানেও সে জীবনের অংক মিলাতে পারে না।

উদাহরণ ৩ ঃ বাসায় সাধারণত মেহমান আসলে ছেলেমেয়েরা খুশি হয়। কিন্তু কোন কোন মা-বাবারা বিরক্ত হন। মেহমানদের সামনে এক রকম আচরণ করেন এবং মেহমান চলে গেলে সন্তানদের সামনে মেহমানদের নিয়ে খারাপ মন্তব্য করেন। এতে সন্তানরা অবাক হয়, কেন এমন আচরণ? মেহমানদের সামনে বাবা বলছেন 'আপনারা আসাতে আমরা খুব খুশি হয়েছি, আবার আসবেন কিন্তু'। আবার মেহমান চলে যাওয়ার পর সন্তানরা দেখছে আসলে বাবা অখুশি!

রাগ নিয়ন্ত্রণ কিভাবে করবো?

সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে রাগ বা ক্রোধকে দমন করে সহনশীলতা ও কোমলতা অবলম্বন করতে পারা মা-বাবাদের একটি বিশেষ গুণ। ক্রোধ আসে শয়তানের পক্ষ হতে। শয়তান মানুষের চরম শত্রু। সে কারণে কখনো কেউ ক্রোধ বা রাগের বশীভূত হলে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে হয়। কেননা ক্রোধ মানুষের হিতাহিত জ্ঞানকে নিঃশেষ করে দেয়। ফলে ক্রোধ মানুষকে যে কোন বড় ধরনের দুর্ঘটনায় ফেলে দিতে পারে। তাইতো আল কুরআনুল কারীম ও হাদীসে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ক্রোধের অপকারিতা বর্ণিত হয়েছে এবং সহনশীলতা, ধৈর্য ও কোমলতার নীতি অবলম্বন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"তাঁদের (মু'মিনদের) বৈশিষ্ট্য হলো তাঁরা ক্রোধকে হজম করে এবং লোকদের সাথে ক্ষমার নীতি অবলম্বন করে চলে।" (সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ ১৩৪)

অনেক সময় আমরা মা-বাবারা নিজ সন্তানদের কিছু কার্যকলাপ দেখে খুবই অস্থির হয়ে যাই এবং নিজেদের রাগকে কন্ট্রোল করতে পারি না। আমরা পত্র-পত্রিকায় এরকমের কয়েকটি দুর্ঘটনা দেখেছি। বাবা রাগের বশবর্তী হয়ে নিজ সন্তানকে আঘাত করতে গিয়ে মেরেই ফেলেছেন। আবার নিজ মেয়েকে শাসন করতে গিয়ে নিজেকেই শেষে জেলে যেতে হয়েছে। যাহোক সবসময় একটা কথা মনে রাখতে হবে যে সন্তানদেরকে শাসন করতে হবে ধৈর্যের মাধ্যমে। কিছুতেই তাদের উপর অত্যাচার করা যাবে না। শিশুদের শাস্তির নামে অত্যাচার করা এক প্রকার child abuse। সঠিক সংশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুকে শুধরাতে হবে। নিম্নে রাগ দমনের কিছু টিপ্‌স দেয়া হলো। রাগ হলে ঃ

১. ওযূ করা অথবা গোসল করে নেয়া আর বুঝতে হবে এখানে শয়তান উপস্থিত।
২. নফল সলাত আদায় করা, এমতাবস্থায় আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া। নিশ্চয়ই আল্লাহ সাহায্যকারী, আমাদের প্রতিপালক ও সর্বনিয়ন্তা মালিক।
৩. দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়া, বসে থাকলে শুয়ে যাওয়া।
৪. চোখ বন্ধ করা, দীর্ঘ নিশ্বাস নেয়া।
৫. উল্টো দিক থেকে গণনা করা।
৬. নিজে নিজে পজিটিভ কথা বলা, নিজের কাছে নিজে আপিল করা।

পরিবারের সাথে সময় কাটানো

আমি যে পেশায়ই নিয়োজিত থাকি না কেন সর্বদা সুযোগ খুঁজতে হবে স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে সময় কাটানোর। এমন অনেক কেতাদুরস্ত লোকের সন্ধান পাওয়া যায় যারা সারাদিন বন্ধুদের সাথে আড্ডা মেরে যখন রাতে বাসায় ফেরেন তখন তার সন্তানদের গায়ে হাত বুলানোর আর কোন শক্তি বা আগ্রহ থাকে না।

ছোট সন্তানদের হাত ধরে রাস্তায়, পার্কে বেড়াতে যাওয়া উচিত। মনে রাখতে হবে আর কিছুদিন পর আমি চাইবো কিন্তু সন্তানরা আর আমার হাত ধরে হাঁটতে চাইবে না। মেয়ে কিছু বড় হলে তো সেই আমার কাছ হতে দূরে সরে থাকবে। সুতরাং এখনই সময়। বেশী বেশী করে তাদের সাথে সময় কাটানো উচিত। সপ্তাহান্তে তাদের পার্কে, যাদুঘরে, চিরিয়াখানায়, বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে নিয়ে যাওয়া উচিত। যেখানেই যাই সবাই যেন সলাত আদায়ের ব্যাপারটি ভুলে না যাই। তা না হলে সন্তানরা মনে করবে সলাত কেবল ঘরের ভেতরের বিষয়।

আল্লাহ, রসূল ﷺ ও ইসলামকে আমরা সবচেয়ে বেশী ভালবাসবো

ইসলাম যেমনিভাবে আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করা, সলাত, সিয়াম, হাজ্জ, যাকাত প্রভৃতি আদায় করা এবং বিশ্বস্ততা, আল্লাহভীতি, সদাচার ও সুন্দর চালচলন অবলম্বনের নির্দেশ দেয়, তেমনিভাবে ইসলামের আরেকটি বিশেষ শিক্ষা হল আমরা যেন আল্লাহ, রসূল ও দ্বীনকে দুনিয়ার সকল জিনিস তথা নিজেদের বাবা-মা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ ও ইজ্জত সম্মান এমনকি নিজের প্রাণের চেয়েও অধিক ভালবাসি।

অতএব যদি কখনো এমন কোন নাযুক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে যে, দ্বীনের উপর টিকে থাকা এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মোতাবেক চলার ক্ষেত্রে আমাদের ধন-সম্পদ, ইজ্জত-সম্মান ও জীবনের উপর ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয়, তখনও আমাদের জন্য উচিত, আল্লাহ, রসূল ও দ্বীনের পক্ষ পরিত্যাগ না করা। তাতে আমাদের জান-মাল, ইজ্জত-সম্মান বিনষ্ট হলেও আমরা যেন তা নীরবে মেনে নেই। কুরআনের একাধিক জায়গায় বলা হয়েছে, যারা মুখে ইসলামের দাবী করে অথচ আল্লাহ, রসূল ও দ্বীনের প্রতি তাদের হৃদয়ে সেই পরিমাণে

ভালবাসা নেই, তারা প্রকৃত মু'মিন নয়। বরং তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তির উপযুক্ত। আল্লাহ বলেন ঃ

"হে রসূল! লোকদেরকে বলে দিন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের বাবা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের বংশ, তোমাদের উপার্জিত ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দাভাবকে তোমরা ভয় করে থাক এবং তোমাদের বাড়ী যা তোমরা খুবই ভালোবাস এগুলো যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর পথে একান্ত চেষ্টা-সাধনা (জিহাদ) করা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় জিনিস হয়ে থাকে, তা হলে আল্লাহর সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাক। মনে রেখ, আল্লাহ সত্যত্যাগী অবাধ্য সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।" (সূরা তাওবা ৯ ঃ ২৪)

Positive Parenting

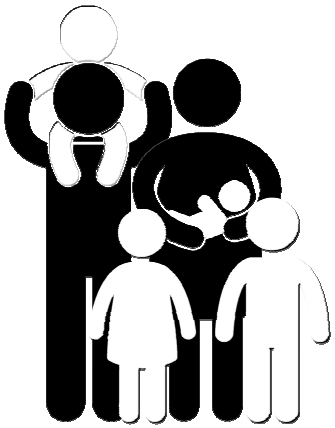

আমার সন্তানের অধিকার

নিজের পরিবার-পরিজনকে সলাতের আদেশ দাও এবং নিজেও তা দৃঢ়তার সাথে পালন করতে থাক। (সূরা ত্ব-হা ঃ ১৩২)

চ্যাপটার ৬

সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তম নিয়ামত এবং আমানত। নারীদেরকে মায়ের মর্যাদার আসনে আসীন আর পুরুষদের বাবা হিসেবে শ্রদ্ধার সাথে সমাজে পরিচিত হওয়ার এ এক অন্যতম মাধ্যম। এ সন্তান পুত্র কি কন্যা তা বিচার্য নয়, এতে মা-বাবার কারোর কোন হাত নেই। এটি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তা'আলার ফায়সালায় হয়ে থাকে। তবে মা-বাবা যদি নেককার তাকওয়াবান, হকের ব্যাপারে অত্যন্ত শক্তিশালী ও মজবুত ঈমানের অধিকারী হন তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে নেককার ও বরকতময় সন্তান লাভ করবেন।

আল্লাহ কুরআনে নির্দেশ দিচ্ছেন

- *"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবারের লোকদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।" (সূরা আত তাহরীম ঃ ৬)*

- *"আর সে সব লোক যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে অতঃপর তাদের সন্তানগণও ঈমানের সাথে তাদের পথ অনুসরণ করেছে, তাদের সাথে তাদের সন্তানদেরকে আমি মিলিত করব। আর আমি তাদের কোন আমলই বিনষ্ট করব না। প্রতিটি লোক যা কিছু আমল করে তা আমার নিকট দায়বদ্ধ থাকে।" (সূরা আত্ব তূর ঃ ২১)*

- *"অথচ তারা একজন আরেকজনকে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবে, (আখিরাতের ময়দানে) অপরাধী ব্যক্তি আযাব থেকে (নিজেকে) বাঁচাতে মুক্তিপণ হিসেবে তার সন্তানদের দিতে চাইবে। (দিতে চাইবে) নিজের স্ত্রী এবং নিজের ভাইকেও। এবং নিজের পরিবারভুক্ত এমন আপনজনদেরও, যারা তাকে (জীবনভর) আশ্রয় দিয়েছিল।" (সূরা মায়ারিজ ঃ ১১-১৩)*

রসূল ﷺ বলেছেন

- "তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গের নিকট যাও। তাদের মধ্যে বসবাস কর, তাদের (দ্বীনি) জ্ঞান শিক্ষা দাও এবং সেই অনুযায়ী আমল করার জন্যে তাদের আদেশ দাও।" (সহীহ্ বুখারী)

- "মানুষ যখন মরে যায় তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমলের উপকারিতা সে কিয়ামত পর্যন্ত পেতে থাকে। (১) সদকায়ে জারিয়া (২) এমন সৎ জ্ঞান যা সে বিতরণ করেছে এবং (৩) নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করবে।" (সহীহ্ মুসলিম)

- নাবী ﷺ বলেছেন ঃ "আল্লাহ যখন তাঁর কোনো বান্দাকে লোকদের উপর কর্তৃত্ব দান করেন, কিয়ামতের দিন তিনি তাঁর সেই বান্দার কাছ থেকে তার অধীনস্থ লোকদের সম্পর্কে অবশ্যই হিসাব গ্রহণ করবেন। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন সে তার অধীনস্থ লোকদের উপর আল্লাহর দ্বীন বাস্তবায়ন করেছে, নাকি তা করে নাই? এমনকি প্রত্যেককে তার নিজস্ব পরিবার পরিজন সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রশ্ন করা হবে।" (মুসনাদে আহমদ)

- "নিশ্চয়ই তোমার উপর তোমার প্রতিপালকের, তোমার শরীরের, তোমার সন্তানের হক রয়েছে, অতএব হকদারকে তার হক প্রদান কর।" (সহীহ্ বুখারী)

- নাবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা নিজেদের সন্তানদের সাথে কোমল ব্যবহার করো এবং তাদের উত্তম প্রশিক্ষণ প্রদান করো।" (ইবনে মাজাহ)

মেয়ে হলে অসন্তুষ্ট হওয়া ঠিক না

আমাদের সমাজে প্রকৃত শিক্ষার অভাবে অনেক মা-বাবারাই মেয়ে সন্তান হলে অসন্তুষ্ট হয়। বিশেষ করে শাশুড়ীরা তো আরো বেশী। শিশুর মা সাধারণত ছেলে বা মেয়ে যাই হোক তাতেই খুশি কিন্তু শশুর বাড়ীর কথা শুনতে হবে বা স্বামীর কথা শুনতে হবে এই ভয়ে মেয়ে সন্তান হলে অখুশি হয়। মা-বাবা আর শাশুড়ী যেই হোক না কেন, মেয়ে সন্তান দেখে বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহ নারাজ হবেন। এবং ইসলামের দৃষ্টিতে এই ধরনের মনোভাব খুবই নিকৃষ্টতম। ছেলে বা মেয়ে মহান আল্লাহর কাছে দুই-ই সমান, দু'জনই আল্লাহর বান্দা, কাউকে ছোট করে দেখা যাবে না।

আমরা সকলেই জানি যে, যদি কারো ৪টি (অপর বর্ণনায় ৩টি ও ২টি) কন্যা সন্তান থাকে এবং তাদেরকে সঠিকভাগে গড়ে তোলে তাহলে তিনি নাবী ﷺ এর সাথে জান্নাতে পাশাপাশি থাকবেন।

ছেলে হলে গর্ব বোধ করা ঠিক না

মেয়ে শিশুর ঠিক উল্টো চিত্রও আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে। যাদের ছেলে সন্তান হয় তারা গর্ব বোধ করে যে আমি ছেলের বাবা বা ছেলের মা এবং শাশুড়ী তো আরো এক ডিগ্রি বেশী। যার ছেলের পর ছেলে অর্থাৎ কয়েকটা ছেলে হয় তারাও এই ধরনের মনোভাব পোষণ করেন। যাহোক, এই ধরনের গর্ব বোধ করা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষেধ। মেয়ে সন্তান যিনি দেন ছেলে সন্তানও তিনিই দেন। তাই আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে কোন প্রকার দম্ভ বা আফসোস করা যাবে না। মহান আল্লাহ যা দিয়েছেন তার জন্য শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

প্রতিবন্ধী (Mental Disability) সন্তান

আল্লাহর পরীক্ষা ঃ প্রতিবন্ধী সন্তান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি বড় পরীক্ষা। এই পরীক্ষা যে কত বড় পরীক্ষা তা বলে ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। কোন কোন বাবা-মা মনে করেন যে তাদের পূর্বের কোন পাপের ফল হয়তো এটি। আসলে ইসলামের দৃষ্টিতে এটি মোটেও ঠিক নয় এবং এরকম মনে করার কোন কারণও নেই। কোন কোন বাবা-মাকে আল্লাহ সুস্থ সন্তান দিয়ে পরীক্ষা করেন আবার কোন কোন বাবা-মাকে প্রতিবন্ধী সন্তান দিয়ে পরীক্ষা করেন আবার কোন কোন বাবা-মাকে নিঃসন্তান করে পরীক্ষা করেন। এখানে পরীক্ষাটা হচ্ছে ধৈর্যের। এই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ধৈর্যহারা না হয়ে বরং কে কত মহান আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারেন সেটিই প্রধান বিষয়। সন্তান প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে কখনো মহান আল্লাহ তা'আলার উপর নারাজ হওয়া যাবে না, বিরক্ত হওয়া যাবে না। এই পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা হয়তো ঐ পরিবারের জন্য অন্য কোনদিক দিয়ে মঙ্গল রেখেছেন।

ধৈর্যধারণ ঃ যদিও ধৈর্যধারণের কথা মুখে বলা সহজ কিন্তু বাস্তবে অনেক কঠিন। তারপরও সমাধান একটিই আর তা হচ্ছে ধৈর্যধারণ করা এবং যিনি সন্তান দিয়েছেন তার কাছে সাহায্য চাওয়া। তিনি যেন সব কিছু সহজ করে দেন, কবুল করেন। অনেক সময় প্রতিবন্ধী সন্তানের পিতা-মাতারা একপ্রকার

হিনমন্যতায় ভুগেন। তারা হয়তো নিজেদেরকে ছোট মনে করেন, নিজ সন্তানকে অন্যের সামনে প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন। এটি সত্যি, কিন্তু সকল সন্তানই মহান আল্লাহ তা'আলার দান এবং আমানত। তাই এই বিশেষ আমানত রক্ষার জন্য মনোবল বাড়াতে হবে, সব সময় মনে করতে হবে আল্লাহ আমাকে পরীক্ষা করে আরো ভাল কিছু দিবেন, এই পৃথিবীতে না দিলেও আখিরাতে অবশ্যই দিবেন বা উভয় স্থানেই দিবেন। প্রতিবন্ধী বাবা-মাকে বিশেষ ধৈর্যের সাথে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বিশেষ অনুরোধ ঃ সুস্থ সন্তানের বাবা-মায়েরা যেন কখনোই মনে না করেন যে এটি ঐ পরিবারের পাপের প্রাশ্চিত্য। আর আমরা পূন্যবান লোক তাই আমাদের সব সন্তান সুস্থ-সবল, আমাদের কোন দুঃখ নেই। এই ধরণের ধারণা করা মোটেও ঠিক নয়। প্রতিবন্ধী সন্তান যেমন উক্ত মা-বাবার জন্য পরীক্ষা, তেমনি একজন প্রতিবন্ধী মানুষকে আমি কী দৃষ্টিতে দেখছি সেটাও আমার জন্য পরীক্ষা। প্রতিবন্ধী সন্তানের বাবা-মায়ের সাথে কোন প্রকার অস্বাভাবিক আচরণ করা যাবে না যাতে তারা মনে বিন্দু পরিমাণ কষ্ট পান। কোন কোন প্রতিবন্ধী সন্তান হয়তো সারাদিন নানা রকম ঝামেলার মধ্য দিয়ে বাবা-মাকে কষ্ট দিয়ে থাকে। এজন্য তার উপর কখনো বিরক্ত হওয়া ঠিক নয়, তাকে ঝামেলা মনে করা ঠিক নয়, তার গায়ে হাত তোলা ঠিক নয়, কারণ সে তো অবুঝ। বরং তার প্রতি আরো বেশী সহানুভতি বাড়ানো উচিত। এই বইয়ের অন্যত্র বলা হয়েছে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, একাধিক সন্তানদের মাঝে তারতম্য করা যাবে না। অনেক পরিবারে দেখা যায় প্রতিবন্ধী সন্তানের পোশাক, খাবার, থাকার জায়গা অবহেলা করে কিন্তু অপ্রতিবন্ধী সন্তানদের বেলায় তা করে না। অথচ নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহকে ভয় কর, আর তোমাদের সন্তানদের বেলায় ইনসাফ কর।

কিছু পরামর্শ ঃ অনেক বাবা-মা প্রতিবন্ধী সন্তানকে নিয়ে সাধারণত কোথাও বেড়াতে যান না, বেশীরভাগ সময় তাকে নিয়ে বাসায় থাকেন। এটি ঠিক নয়। তাকে নিয়মিত বাইরে নেয়া উচিত, অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সাথে খেলা-ধুলা করতে দেয়া উচিত। প্রতিবন্ধীদের যে বিশেষ স্কুল রয়েছে সেখানে তাকে ভর্তি করে দেয়া উচিত। এই স্কুলগুলো বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং বিশেষ আধুনিক শিক্ষা সরঞ্জামে সম্মৃদ্ধ। সেখান থেকে তারা অনেক কিছু শিখবে, এতে তার শারীরিক ও মানসিক ডেভেলপমেন্ট হবে, যা হয়তো বাসায় কিছুতেই সম্ভব নয়। যাদের সন্তান সুস্থ এবং কোন প্রতিবেশীর বা কোন আত্মীয়ের সন্তান যদি

প্রতিবন্ধী হয় তাকে অবহেলা না করে নিজ সন্তানদেরকে তাদের সাথে খেলা-ধুলা করার সুযোগ করে দেয়া উচিত। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে সহযোগিতা করুন।

সন্তানদের প্রতি করণীয়

সন্তান-সন্ততি আল্লাহর পক্ষ হতে আমানত। এ আমানতের খিয়ানত করা যাবে না। সকল খিয়ানতকারীর বিরুদ্ধে ইসলামে কঠোর হুঁশিয়ারী রয়েছে।

খুব ছোট অবস্থা হতে সন্তানদের প্রতি কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হতে হবে। তাদের জাগতিক উন্নতির পাশাপাশি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যেও আমি দায়িত্বশীল। কেবল ভাল স্কুলে ভর্তির স্বপ্ন দেখবো আর ভাল রেজাল্ট করার জন্য এ আমানত আমাকে দেয়া হয়নি। আমার উপর আমার সন্তানের অধিকারের মধ্যে তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয়টিও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি সন্তানের ভুল শিক্ষার জন্য মা-বাবার দায়-দায়িত্ব এড়ানোর কোন উপায় নেই।

একজন বাবা বা মা তার সন্তানকে যে মূল্যবোধে বড় করেন সন্তান সেভাবেই গড়ে উঠে। সন্তানের মানসিকতা, পছন্দ, অপছন্দ, ত্যাগের শিক্ষা, অন্যদের প্রতি মমত্ববোধ, সততা, আল্লাহকে চেনা, পরকালের ধারণা ইত্যাদি সকল ব্যাপারে মা-বাবার করণীয় অবশ্যম্ভাবী। এ থেকে তাদের মুক্তি নেই। সম্পূর্ণ অসহায় একটি শিশুকে এর স্রষ্টা এমন দু'জন মানব-মানবীর নিকট আমানত হিসেবে পাঠান যারা সামর্থবান, যাদের সহায়-সম্বল দেয়া হয়েছে, যাদের বিবেক-বুদ্ধি দেয়া হয়েছে, যাদের ভালমন্দের জ্ঞান আছে। শিশু ভূমিষ্ট হবার পর তার সকল দায়-দায়িত্ব মা-বাবার উপর বর্তায়। এবার চিন্তা করি আমার এ শিশুকে কী শিক্ষা দেয়া উচিত? কোন ভাবাদর্শে আমি তাকে গড়ে তুলবো? এ শিশুর জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি হবে? তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কি হবে? কোন মৌলিক উপাদান দিয়ে তার চিন্তা-চেতনাকে গড়ে তুলবো?

আমি যেখানেই থাকি না কেন ইসলামী মূল্যবোধ আজকাল সর্বত্রই অনুপস্থিত। সকলে কেবল একটি মূল্যবোধে উজ্জীবিত, সেটি হলো কৃত্রিম Status-এর মূল্যবোধ। ঢাকা শহর বলি আর গ্রাম-গঞ্জ বলি মৌলিক বোধ আজ সবখানেই এক এবং একাকার হয়ে গেছে। সুতরাং আমি কোথায় আছি তাতে তেমন কোন কিছু যায় আসে না।

সর্বপ্রথম জেনে নেয়া উচিত যে, আমার সন্তান একটি স্বতন্ত্র সত্তা। বড় হয়ে সে তার নিজের হিসাব নিজে দেবে। মৃত্যুর পর শেষ বিচারের দিন আমাদের পারস্পরিক বন্ধন কোন ইতিবাচক কাজে আসবে না বরং নেতিবাচক কাজে আসার সম্ভাবনা বেশী। অর্থাৎ যে সন্তানকে আল্লাহর হুকুম বিরোধী কাজকর্মে নিয়োজিত করেছি সে সন্তানই আমার বিরুদ্ধে কথা বলবে। আখিরাতের আদালতে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাবো, দিশা হারিয়ে ফেলবো যখন দেখবো আমাদেরই প্রিয় সন্তান আমাদের অন্যায় কাজগুলি প্রমাণসহ দেখিয়ে দিয়ে আল্লাহর নিকট বিহিতের ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ তাঁর কুরআনে জানাচ্ছেন ঃ

"সর্বশেষে যখন সে কান-বধিরকারী ধ্বনি উচ্চারিত হবে (অর্থাৎ কিয়ামত হাজির হবে), সে দিন মানুষ নিজের ভাই, নিজের মা ও বাবা এবং স্ত্রী ও সন্তানাদি হতে পালাবে। তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সেদিন এমন সময় এসে পড়বে যে, নিজের ছাড়া আর কারো প্রতি লক্ষ্য করার মত অবস্থা থাকবে না।" (সূরা আবাসা ঃ ৩৩-৩৭)

উত্তম উপদেশ প্রদান

সন্তানের জীবদ্দশায় সৎচরিত্র গঠন, আদর্শ শিক্ষা অর্জন, দ্বীনী হুকুম-আহকাম ভিত্তিক অভ্যাস গঠনের লক্ষ্যে উত্তম নসীহত প্রাপ্তি সন্তানের অধিকার। আসলে এমন অধিকার জগতের প্রত্যেক মা-বাবাই আদায় করতে চেষ্টা করেন।

অনেক সময় সন্তানরা মা-বাবার আদেশ নিষেধ ভুলে গেলে বা পালন করতে দেরী করলে মা-বাবারা রাগ করেন, নতুন করে জানতে চাইলে বলেন- এখন আর বলতে পারব না। এত বলতে হবে কেন? এখন বয়স হয়েছে না, বড় হয়েছে না, নিজে বুঝে না অথবা বকা দিয়ে বলে বেয়াদব, বদমায়েশ, অসভ্য, যা এখান থেকে বেরিয়ে যা, আমার চোখের সামনে থেকে যা, আর আসবি না, তুই মর, জান্নামে যা ইত্যাদি। এখানে এ কথাগুলো পবিত্র কুরআন এর একটি দৃষ্টান্ত থেকে উলেখ করা যাক ঃ

কুরআনে আল্লাহ সলাত কায়েম করার কথা ৮০ বারেরও বেশী বলেছেন। একবার দু'বার নয়। যদি আল্লাহ একবার দু'বার বলে রাগ করতেন, আর না বলতেন বা আমাদের মত বকাবকি করতেন তাহলে না হয় ভাবতাম আমাদের নীতি ঠিক আছে; কিন্তু আল্লাহ তো বলেছেন অনেক বার। তবু রাগ করেননি। তারপরও যখন আমরা ঠিকমত সলাত আদায় করি না তবুও তো তিনি বকা দেন

না, এ দুনিয়া থেকে বের হয়ে যেতে তো বলেন না, আলো-বাতাস থেকে আমাদেরকে এক সেকেন্ডের জন্যও বঞ্চিত করেন না।

উত্তম ব্যবহার শিক্ষা দান

রসূল ﷺ বলেছেন ঃ কোন বাবা তার সন্তানদের উত্তম আচার-ব্যবহারের চেয়ে অধিক ভাল কোন জিনিস উপহার দিতে পারে না। (তিরমিযী)

সন্তানদেরকে উত্তম আচার-ব্যবহার শিক্ষাদান একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেমন ঃ অনেক ছেলেমেয়েরাই ফোন রিসিভ করে সালাম দেয় না। মা-বাবার বন্ধুদের সাথে ভদ্রভাবে কথা বলে না। মা-বাবা বা বড় ভাই-বোনের সাথে ঝগড়া বা তর্ক করে, রুঢ় ভাবে কথা বলে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা যেন মনে না করি যে তারা আদব-কায়দা ক্লাসের বই পড়ে শিখবে বা স্কুল টিচাররা শেখাবেন। মনে রাখা উচিত এখনকার অধিকাংশ স্কুলগুলোতে শিক্ষার এমন কোন ব্যবস্থা নেই যে যেখানে আদব কায়দা শেখানো হয়। বরং আজকাল টিভি দেখে সন্তানরা এমন আচরণ শিখছে যা আমাদের ইসলামিক কালচারের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই আমার সন্তানকে আদব-কায়দা আমাকেই সুন্দরভাবে শিক্ষা দিতে হবে। বাস্তবে দেখা গেছে যে অনেক পরিবার ইসলামিক মাইন্ডের কিন্তু সন্তানেরা আদব-কায়দা জানে না কারণ তাদের সেটা শেখানো হয়নি। আমাদের প্রিয় নাবী ﷺ বলেছেন ঃ কারো সাথে হাসি মুখে কথা বলাও একটা সদাকা।

একটি সুন্দর প্ল্যান করে বুদ্ধিমত্তা, অধ্যবসায় ও ধৈর্যের সাথে শিশুদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে হবে। খানা-পিনা, উঠা-বসা, ঘুম ও জাগরণের আদব শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রতি আদব, মসজিদ-স্কুলের আদবের কথা তাদের বলতে হবে। পাক-পবিত্রতার আদব, স্বাস্থ্য ও পবিত্রতার আদব, চলাফেরা এবং সাথী-সঙ্গীদের সাথে উঠা-বসার আদব, গৃহের এবং নিজের জিনিসসমূহকে সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে ব্যবহারের নিয়ম শিক্ষা দিতে হবে এবং একটি সভ্য ও পবিত্র জীবন পরিচালনার জন্য অব্যাহতভাবে আমাকে তার অভিভাবকত্ব করতে হবে। একবার শুধু কোনো ভালো জিনিসের প্রতি দৃষ্টি আর্কষণই যথেষ্ট নয় বরং প্রশিক্ষণের দাবী হলো যে, আমি সে ব্যাপারে অব্যাহতভাবে দৃষ্টি রাখবো এবং বারবার ভুল সত্ত্বেও বিরক্ত হবো না। ধৈর্য ও সবরের সাথে এবং অন্তর দিয়ে তাদেরকে শুধরে দিতে থাকবো এবং সামান্যতম ভুলকেও তুচ্ছ মনে করবো না।

দুষ্টামী আর বেয়াদবী এক নয়

শিশুরা দুষ্টামী করবে এটিই স্বাভাবিক অর্থাৎ প্রাকৃতিক। তারা দৌড়াদৌড়ি করবে, ছুটাছুটি করবে, খেলবে, লাফাবে, বল ছুড়ে মারবে, হৈচৈ করবে, দেয়ালে দাগাবে, ফ্লোর নষ্ট করবে, পানি দিয়ে খেলবে, রং দিয়ে খেলবে, কিচেনের হাড়ি-পতিল এনে খেলবে, মা-বাবার জামা-কাপড় পড়ে খেলবে, মা-বাবা সলাতে সিজদায় গেলে তাদের ঘাড়ের উপরে উঠবে ইত্যাদি। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কোন কোন শিশু এই বিষয়গুলোতে বেশী একটিভ আবার কোন কোন শিশু কম একটিভ। শিশুদের এই কাজগুলোতে বাধা দেয়া ঠিক না, এতে তার প্রতিভা প্রকাশে ব্যাঘাত ঘটে। যে সকল শিশু এই কাজগুলোতে বেশী একটিভ তাকে ভুল বুঝে বেয়াদব মনে করা যাবে না, তাকে চর-থাপ্পর দেয়া যাবে না। কারণ বেয়াদবী আর দুষ্টামী এক জিনিস নয়।

সন্তানদেরকে ঘরের কাজকর্মে অভ্যস্ত করা

আমরা আমাদের সন্তানদেরকে খুবই ভালবাসি। এই ভালবাসার নমুনাস্বরূপ তাদেরকে অনেক সময় অকর্মণ্য করে ফেলি। অনেক পরিবারে ছোটবেলা হতে সন্তানদেরকে নিজ হাতে এক গ্লাস পানি ঢেলেও খেতে অভ্যস্ত করেন না। মেয়ে হাই-স্কুলে বা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে কিন্তু একটি ডিমও ভেজে খেতে পারে না। সন্তানদের সব ধরনের কাজ করার অভ্যাস এবং অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। যেন বলতে না হয়, "আমার বাচ্চারা তো কিছু পারে না!" এটা ঠিক না, তাদেরকে চেষ্টা করতে দিতে হবে, প্রথমে ভুল করবে, কিছু জিনিস নষ্ট করবে, খুব বেশী সুন্দর হয়ত হবে না- তারপর একসময় ঠিকই পারবে ইনশাআল্লাহ। আসুন এ বিষয়ে সতর্ক হই, সন্তানদেরকে ছোট হতে ঘরের কাজে ট্রেইনআপ করি। শিক্ষণীয় হিসেবে দু'টি বাস্তব উদাহরণ দেয়া যাক।

চিত্র এক ঃ ২০০৭ সালে আমরা সপরিবারে লন্ডন গিয়েছিলাম ইষ্ট লন্ডন ইসলামিক সেন্টার পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে। ইষ্ট লন্ডন ইসলামিক সেন্টারের প্রেসিডেন্টের বাসায় আমাদের দুপুরে লাঞ্চের দাওয়াত ছিল। যা হোক আমরা প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাসায় যে দৃশ্য দেখলাম তা হলো, প্রেসিডেন্ট সাহেবের হাই স্কুল পড়ুয়া ছেলেটা রান্না ঘরে হাড়ি-পাতিল-প্লেট-গ্লাস ধুচ্ছে, ঘর ঝাড়ু দিচ্ছে এবং বাথরুম পরিষ্কার করছে।

চিত্র দুই ঃ NICAS Canada-র এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টরের বড় ছেলে টরন্টো ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। আমাদের ক্যানাডিয়ান লাইফে এতো ভদ্র ছেলে আমরা কখনও দেখিনি। কী তার অমায়িক ব্যবহার! এছাড়াও সে অসুস্থ বাবার মাথায় পানি ঢালা থেকে শুরু করে মার সাথে ঘরের অন্যান্য কাজকর্মও করে থাকে।

ভারসাম্যপূর্ণ অভ্যাস তৈরী করা

মা-বাবারা সন্তানদের প্রায় সকল সহনীয় দাবী দাওয়া মেনে নিতে চান। এতে আপাতঃ দৃষ্টিতে কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না। তবে কিছু কিছু বিষয়ে সতর্ক ব্যবস্থা ও ভারসাম্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সহজ করে তুলবে। আমার সন্তান যদি চা পানে অভ্যস্ত হয় তাতে কোন দোষ নেই, কিন্তু চা পান না করলে তার স্কুলের হোমওয়ার্ক হবে না বা কফি না খেলে তার পড়া হয় না- এ জাতীয় অভ্যাসকে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলা নিরাপদ। ঠিক তদ্রূপ মাংস ছাড়া আর কিছু তার পছন্দ নয়, বা একটি নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের কাপড় ছাড়া সে অন্য কিছু ব্যবহারে অভ্যস্ত নয়, ইত্যাদি কোন কিছুতে যেন তার দিগন্ত সীমিত হয়ে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এতে আমাদের সন্তান ফ্লেক্সিবল হয়ে গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

যদি সন্তানের ব্যক্তিত্বকে এভাবে গড়ে তোলা যায় তা হলে সে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই নিজেকে সামলিয়ে চলতে পারবে। অনেক ছেলেমেয়েদেরকে দেখা যায় মাছ খায় না কাঁটার ভয়ে, শাক খান না কারণ ছোটবেলা হতে শাক খাওয়ায় অনভ্যস্ত। এধরনের অভ্যাস যেন না হয় সেদিকে বাবা-মায়েদের খেয়াল রাখা প্রয়োজন। সন্তানদেকে তার নিজের ফর্ম নিজে ফিলাপ করতে দেয়া উচিত। আমার যে কটি গাড়ীই থাক না কেন সন্তানদের মাঝে মধ্যে পাবলিক ট্রান্সপোর্টে চলতে ফিরতে অভ্যস্ত করা উচিত। যাতে প্রয়োজনে তারা বিনাদ্বিধায় যেখানে সেখানে যাতায়াত করতে পারে। তবে যদি সন্তানের নিরাপত্তা হারাবার আশঙ্কা থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। এ উদাহরণগুলো দেয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো আমার সন্তান যেন বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে না উঠে।

আমরা মা-বাবারা বাচ্চাদের প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সব জিনিসই দেই। কিন্তু একটা বাচ্চা কিছু চাইলে তার সাথে আলাপ করা দরকার সে এটা কেন চায়, এটা দিয়ে সে কি করবে, এর উপকারীতা ও অপকারীতাগুলো কি কি? জিনিসটি আদৌ তার প্রয়োজন আছে কি'না এবং এই টাকায় সে আর কি করতে পারে?

এতে করে ওরা স্বার্থপর হবার পরিবর্তে needs এবং wants এর মধ্যে তফাত করতে শিখবে, অন্যের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের উপর অগ্রাধিকার দিতে শিখবে।

সবচেয়ে বড় যুলুম

আমরা আমাদের সন্তানদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় যুলুম যেটা করছি তা হচ্ছে আমরা ভুলে গেছি যে আমাদের সন্তানদের দু'টি জিনিস (১) দেহ ও (২) আত্মা নিয়েই তাদের গোটা অস্তিত্ব। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তাদের দেহের প্রতি এতো বেশী যত্ন নেয়া হয়েছে যে আত্মার দিকে নজরই দেয়া হয়নি। যার কারণে দেহের অত্যধিক যত্ন নিয়ে আধ্যাত্মিকতার চরম অবজ্ঞা করে মন ও আত্মাকে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে ।

সন্তানকে অভিশাপ না দেয়া

মা তার সন্তানকে অবর্ণনীয় কষ্টে গর্ভেধারণ করেন। অমানুষিক কষ্টে পৃথিবীর আলো-বাতাসে আনেন। তারপর নিজের ভালবাসা আর ত্যাগের সবটুকু উজাড় করে অসহায় একটি শিশুকে যথাক্রমে সুস্থ, সবল, সজ্ঞান ও স্বাবলম্বী করে তোলেন। সন্তান মানুষ করতে গিয়ে মা-বাবাকে যে কতটুকু কষ্ট সহ্য করতে হয় তা শুধু মা-বাবারাই জানেন। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে এ কষ্ট আরও বেশি। এখানে রোজ দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে লড়াই করে মানুষকে টিকে থাকতে হয়।

অভাবের কারণে একজন নবীন মাকেও একহাতে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব আর অপরহাতে বুকের ধন সন্তানটিকে আগলে রাখতে হয়। অনেক মা আছেন যারা সময়মত বাচ্চার খাবারটিও যোগাতে পারেন না রুচিমত। বিশেষত যেসব বাচ্চা জন্মের পর মায়ের বুকের দুধ পায় না। দরিদ্র পরিবারে এসব শিশুকে যে কত কষ্টে মা জননী বড় করে তোলেন তা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। এ সময় মায়েদের অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রয়োজন হয়।

অথচ অনেক মা'কে এ সময় ধৈর্যহারাও হতে দেখা যায়। অনেক মা সন্তানের উপর বিরক্ত হয়ে তাকে অবলীলায় অভিশাপ দিয়ে বসেন। স্নেহময়ী জননী হয়তো তার জীবনের বিনিময়ে হলেও সন্তানের যে কোনো অনিষ্ট রোধ করতে চাইবেন। কিন্তু তিনিই আবার রাগের মাথায় অবচেতনে আদরের সন্তানটির

অনিষ্ট কামনা করে বসেন। প্রায়ই দেখা যায় সন্তানদের দুষ্টুমিতে অতিষ্ট হয়ে কোন কোন মা সরাসরি সন্তানের নানা রকম অনিষ্ট কামনা করে বসেন। যেমন ঃ

- তুই মরিস না কেন, তুই মরলে ফকিরকে একবেলা ভরপেট খাওয়াতাম!
- আল্লাহ, আমি আর পারিনা, এর জ্বালা থেকে আমাকে নিস্তার দাও!
- তুই ধ্বংস হ!
- তুই জাহান্নামে যা!
- তুই যদি এরকম আবার করিস তাহলে আমার মরা মুখ দেখবি!

এ জাতীয় বাক্য আমরা অহরহই শুনতে পাই। গর্ভধারিণী মা কখনোই তার সন্তানের অমঙ্গল কামনা করেন না। কিন্তু অসচেতনভাবে কামনা করা দুর্ঘটনাও কখনো সত্য হয়ে দেখা দিতে পারে। তাই এ সময় মাকে অনেক বেশি ত্যাগ ও ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাতে হয়। ইসলাম কখনো কারো বিরুদ্ধে অভিশাপ দেয়া বা বদদু'আ করাকে সমর্থন করে না। আপন সন্তানকে তো দূরের কথা জীবজন্তু এমনকি জড় পদার্থকে অভিশাপ দেয়াও সমর্থন করে না। জাবির ইবন আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

বাতনে বুওয়াত যুদ্ধের সফরে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে পথ চলছিলাম। তিনি মাজদী ইবন 'আমর জুহানীকে খুঁজছিলেন। পানি বহনকারী উটগুলোর পেছনে আমাদের মধ্য থেকে পাঁচজন, ছয়জন ও সাতজন করে পথ চলছিল। উকবা নামক এক আনসারী ব্যক্তি তাঁর উটের পাশ দিয়ে চক্কর দিল এবং তাকে থামাল। তারপর তার পিঠে উঠে আবার তাকে চলতে নির্দেশ দিল। উটটি তখন একেবারে নিশ্চল হয়ে গেল। তিনি তখন বললেন ধুত্তুরি। তোর উপর আল্লাহর অভিশাপ। এ শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নিজের উটকে অভিশাপদাতা এই ব্যক্তিটি কে? তিনি বললেন, আমি হে আল্লাহর রসূল। তিনি (রসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, 'তুমি এর পিঠ থেকে নামো। তুমি আমাদের কোনো অভিশপ্তের সঙ্গী করো না। তোমরা নিজেদের বিরুদ্ধে, তোমাদের সন্তান-সন্ততির এবং তোমাদের সম্পদের বিরুদ্ধে দু'আ করো না। তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন মুহূর্তের জ্ঞানপ্রাপ্ত নও, যখন যা কিছুই চাওয়া হয় তিনি তোমাদের তা দিয়ে দেবেন।' (সহীহ মুসলিম)

হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, অর্থাৎ তোমরা কোনো মুহূর্তেই নিজের বিরুদ্ধে, নিজের সন্তান বা সম্পদের বিরুদ্ধে বদদু'আ করো না। কারণ, হতে পারে যে সময় তুমি দু'আ করছো, তা দিনের মধ্যে ওই সময় যখন যা-ই

দু'আ করা হোক না কেন তা কবুল করা হয়। তোমরা তো এ সময় সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত নও। (মুবারকপুরী, মিরআতুল মাফাতীহ)

'হাদীসটি রাগের মাথায় মানুষের তার পরিবার ও সম্পদের বিরুদ্ধে দু'আ করার নিষিদ্ধতা প্রমাণ করে। হাদীসটিতে এর কারণও তুলে ধরা হয়েছে। আর তা হলো, দু'আ কবুলের কিছু বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে এবং তা ঠিক ঐ মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে। ফলে সেই মুহূর্তে মানুষের সবই কবুল হয়ে যায় চাই তা ভালো হোক বা মন্দ হোক, যা সে তার পরিবার বা সম্পদের ক্ষেত্রে প্রত্যাশা করে না।' (আবদুল মুহসিন, শারহু সুনান আবী দাউদ)

নিজের সন্তানের বিরুদ্ধে দু'আ করার অর্থ তো নিজেই নিজেকে হত্যার তথা ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া। আর এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

'আর তোমরা নিজ হাতে নিজদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।'
(সূরা বাকারা ২ ঃ ১৯৫)

অতএব প্রতিটি মাকে ভেবে দেখতে হবে, আমার রাগের মাথায় উচ্চারণ করা বাক্য যদি সত্যে পরিণত হয় তাহলে কেমন লাগবে? আমি কি তা সহ্য করতে পারব? এ জন্য রাগের মাথায়ও কখনো সন্তানের অমঙ্গল কামনা করা যাবে না। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে শুধু মায়েদেরই নয়, আমাদের সবারই উচিত নিজের, নিজের সন্তান ও সম্পদের বিরুদ্ধে বদদু'আ করা থেকে সংযত হওয়া। রাগের সময় সংযম ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়া।

আমার সন্তানের বিবাহ

সন্তানের উপযুক্ত বয়স হলে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ভাল দ্বীনদার ছেলে বা মেয়ে দেখে বিয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। ছেলেমেয়েদের স্টুডেন্ট লাইফেও বিয়ের কথা চিন্তা করা যেতে পারে, তবে তা দেশের আইন অনুযায়ী হতে হবে। যদি স্টুডেন্ট লাইফে বিয়ে দিতেই হয়ে তাহলে এ ব্যাপারে মা-বাবাদের কয়েকটি বিষয়ে যথেষ্ট খেয়াল রাখতে হবে যেমন ঃ

১) বিয়ের পর তাদের সংসার চলবে কিভাবে?
২) তাদের পড়াশোনা চলবে কিভাবে?
৩) সন্তান-সন্ততি হলে তা দেখাশোনা করতে পারবে কিনা ইত্যাদি।

যদি এই সকল বিষয়ে মা-বাবা তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারেন তাহলে স্টুডেন্ট লাইফে বিয়ের ব্যাপারে অনেক সুবিধা। পাত্র বা পাত্রীর শুধু ক্যারিয়ার বা একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন বা শুধু টাকা-পয়সা বা বংশ-গৌরব দেখা ঠিক নয়। সর্বপ্রথম দেখতে হবে পাত্র বা পাত্রী দ্বীনদার কিনা, যদি পাত্র বা পাত্রী দ্বীনদার না হয় তাহলে ছেলে বা মেয়েকে এই আধুনিককালে জীবন চালাতে খুব হিমসিম খেতে হবে। তাই রসূল ﷺ বলেছেন ঃ

মেয়েদেরকে সাধারণতঃ চারটি বিষয় দেখে বিয়ে করা হয়। তার সম্পদ দেখে, বংশ মর্যাদা দেখে, রূপ সৌন্দর্য দেখে এবং তার দ্বীনদারী দেখে। তবে তোমরা দ্বীনদারী মেয়ে লাভ করার চেষ্টা কর, তোমাদের কল্যাণ হবে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

দ্বীনের জ্ঞান থাকা আর দ্বীন পালন করাই হচ্ছে পাত্র বা পাত্রীর সবচেয়ে বড় কোয়ালিফিকেশন। আর এই ধরনের কোয়ালিফাইড পাত্র-পাত্রী জীবনে সুখী হতে বাধ্য, ইনশাআল্লাহ। একই বিষয় ছেলে অর্থাৎ পাত্র দেখার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পাত্রের শুধু নাম-জস, টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি, ভাল চাকুরী বা ব্যবসা দেখলে চলবে না। পাত্র দ্বীনদারী কিনা সেদিকেই বেশী জোড় দিতে হবে, পাত্র পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করে কিনা, পাত্রের ইসলামের উপর সহীহ জ্ঞান আছে কিনা এবং সেই অনুযায়ী সে জীবন পরিচালনা করে কিনা ইত্যাদি।

কন্যা সন্তানের প্রতি দায়িত্ব

সন্তান ছেলে বা মেয়ে যাই হোক সন্তান সন্তানই। সে হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত। এতে কোন মানুষের হাত নেই। তবু যারা কন্যা হলে মন খারাপ করেন, ভ্রূ কুঞ্চিত করেন, স্ত্রীকে বকাবকি করেন তারা একটু লক্ষ্য করি, যাদের সন্তান নেই, যাদের মা-বাবা হওয়ার মত ভাগ্য আল্লাহ তা'আলা দেননি অথবা দিয়েছিলেন আবার নিয়েও গেছেন সেই সকল মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখি। তারা সন্তান-সন্তান বলে কী না করছে! যদি আপনজনদের মধ্যে এমন কেউ থাকেন তাহলে বুঝতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কাজেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইচ্ছাতেই আমাদেরকে একের পর দুই, দুয়ের পর তিন এভাবে কয়েকজন কন্যা সন্তান দান করেছেন। এতে কন্যার বাবাদের মন খারাপ হলেও আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ কিন্তু ঘোষণা করে দিয়েছেন, "কারো তিনজন কন্যা সন্তান থাকলে এবং সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করলে, যথাসাধ্য তাদের

পানাহার করালে ও পোশাক-আশাক দিলে, তারা কিয়ামাতের দিন তার জন্য জাহান্নাম থেকে অন্তরায় হবে।" (ইবনে মাজাহ)

ভাল পাত্রের নিকট মেয়েকে বিয়ে দেয়া

সন্তানদের একটা বয়স পর্যন্ত সব রকমের অধিকার আদায়ের পরও কন্যাদের প্রতি আরো কয়েকটি অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়; এগুলোর অন্যমত হলো মেয়েকে উপযুক্ত পাত্রের সাথে বিয়ে দেয়া। নাবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেন ঃ "যার দ্বীনদারী ও নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট সে যদি তোমাদের কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেয় তবে তার সাথে বিয়ে দাও। যদি তা না কর তবে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ ও চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।" (আত-তিরমিযী)

আমাদের দেখা এমন অনেক ঘটনা আছে যে, ছেলে খুবই ভাল এবং এডুকেটেড কিন্তু দ্বীন ইসলামের জ্ঞান নেই এবং প্র্যাকটিস নেই, তাই বেশীরভাগ সংসার টিকেনি, যেগুলো টিকে আছে সেই সংসারে রয়েছে শুধু অশান্তি। একইভাবে মেয়ে খুবই ভাল কিন্তু দ্বীনদার না অর্থাৎ দ্বীন ইসলামের জ্ঞান নেই এবং দ্বীন ইসলাম ঠিক মতো পালনও করে না। সেই সংসারও টিকেনি, আর যেগুলো দেখে মনে হচ্ছে টিকে আছে সেখানেও প্রকৃত শান্তি নেই। এই পাত্র-পাত্রীরা নিজেরাও জানে না কেন এই অশান্তি, এর মূলে কিসের অভাব। অতএব সব বাবা-মার দায়িত্ব সন্তানকে ঈমানদার মুসলিম পাত্র বা পাত্রীর সাথে বিবাহ দেয়া যাতে সন্তানের জন্য একটা সফল সুন্দর সংসার জীবন আশা করা যেতে পারে।

আমার সন্তানের চরিত্র গঠন

তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-
সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে না দেয়, যারা উদাসীন
হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত । (সূরা মুনাফিকুন ঃ ৯)

চ্যাপ্টার ৭

সন্তানের চরিত্র গঠনের উপায়

১. বাসায় সুন্দর ইসলামী পরিবেশ তৈরী করি।

২. সন্তানদের নিকট ইসলামকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করি।

৩. আল্লাহর সাথে সন্তানের সম্পর্ক তৈরী করি।

৪. সন্তানের ধারণ ক্ষমতা বুঝে ধীরে ধীরে এগুতে থাকি।

৫. জোর না করি, সব আদেশ-নিষেধ একসাথে চাপিয়ে না দেই।

৬. সন্তান যেন দ্বীন ইসলামকে ভালবেসে গ্রহণ করে, শাস্তির ভয়ে নয়।

৭. Islam should be fun as well as compulsory.

৮. রসূল ﷺ ও সাহাবাদের জীবনের ঘটনাকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরি।

৯. মা-বাবার জীবনযাপন পদ্ধতি সন্তানের সামনে অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে তুলে ধরি। রোল মডেল হই সন্তানদের চোখে।

১০. তাকে শুধু ভাল হওয়ার থিওরী শিক্ষা না দিয়ে সাথে প্রাকটিক্যালও করাই।

১১. উদাহরণ সৃষ্টি করি। নিজে একটি ভাল কাজ করি এবং তাকে উপলব্ধি করার সুযোগ দেই।

১২. সন্তান ও স্ত্রী বা স্বামীকে সব সময় সালাম দেই। এছাড়া খালি বাসায় ঢুকেও যেন সালাম দেই কারণ ঘরে রহমতের ফিরিশতা থাকে।

১৩. সবাই মিলে একসাথে নিয়মিত ইসলামিক ডিভিডি দেখি। এবং ঘরে একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করি।

১৪. সব সময় সপরিবারে ইসলামিক টিভি দেখার চেষ্টা করি।

১৫. সন্তানকে সাথে নিয়ে নিয়মিত মসজিদে যাই এবং জামাতের সাথে সলাত আদায় করি।

১৬. তাদেরকে যথেষ্ট সময় দেয়ার চেষ্টা করি।

১৭. প্রতি সপ্তাহে সপরিবারে নিজ ঘরে কুরআনের তাফসীর ও সহীহ হাদীস নিয়ে পারিবারিক বৈঠক করি।

১৮. তাওহীদ ও শিরক এবং সুন্নাত ও বিদ'আত সম্পর্কে বই সংগ্রহ করি এবং তাদেরকে এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেই।

১৯. সবসময় খোঁজ-খবর রাখি কোথায় কোন ইসলামিক কন্‌ফারেন্স হচ্ছে এবং সপরিবারে সেখানে যোগদান করি।

২০. বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইসলামিক সেন্টারে ইসলামের নানা বিষয়ের উপর কম্পিটিশন হয়, সন্তানদের এই সকল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য সহযোগিতা করি।

২১. আমার সন্তান যদি ইসলামিক স্কুলে পড়ে না থাকে তাহলে তাদেরকে Weekend Islamc School-এ ভর্তি করে দিতে পারি যেখানে তারা Islamic Studies শিখবে, নীতি-নৈতিকতা শিখবে।

রসূল ﷺ -এর চরিত্রকে মডেল হিসেবে তুলে ধরি

একবার কিছু সাহাবা আয়িশা ﵂-র কাছে আসলেন এবং বললেন রসূল ﷺ -এর চরিত্র সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু বলুন। আয়িশা ﵂ তাদেরকে বললেন, তোমাদের কাছে কি কুরআন আছে? গোটা কুরআনটাইতো আমার রসূলের চরিত্র, তিনি যখন হেঁটে যেতেন তখন মনে হতো জীবন্ত কুরআন হেঁটে যাচ্ছে।

তাই একজন মু'মিনের চরিত্র কেমন হবে তা কুরআনই বলে দিচ্ছে স্পষ্টভাবে। এজন্য আমরা কুরআন থেকে সূরা মু'মিনুনের তাফসীর পড়তে পারি এবং সন্তানদেরকে শিক্ষা দিতে পারি।

অন্যায়কে সুস্পষ্ট করি

আমার সন্তানকে ছোট বয়স হতেই ন্যায়-অন্যায়ের বিষয়টি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করি। বড়দের সম্মান করার বিষয়টি তুলে ধরি। সে কোন অন্যায় কাজ করলে

ঠান্ডা মাথায়, ধীরে সুস্থে, অনুচ্চ কণ্ঠে বলা উচিত যে বিষয়টি অন্যায় এবং সে যেন এটি আর কখনো না করে। ভাল কাজ করতে উৎসাহিত করি। সে কোন ভাল কাজ করলে তাকে পুরস্কৃত করি। আমার সন্তান যদি কোন আপত্তিকর কথা বলে ফেলে তাহলে সর্বপ্রথম আমাকে বুঝতে হবে যে শিশুটি না বুঝেই খারাপ শব্দটি উচ্চারণ করেছে। এখনই তাকে বুঝানোর সময়। সুন্দর করে বলে দিতে হবে, যে শব্দ সে ব্যবহার করেছে সেটি ভাল নয়।

দাদা-দাদী ও নানা-নানীর সাথে সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। তারা যদি দূরে থাকেন তাহলে অন্তত সন্তানদের জানতে দিতে হবে যে তার দাদা-দাদী ও নানা-নানী আছেন। তারা তাকে খুব ভালবাসেন। সেও যেন তাদের ভালবাসে। এ ছাড়া ফুফু, খালা, চাচা, মামা তাদের সাথেও পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। ব্যাপারটি যেন কখনো এমন না হয় যে আমার সন্তান আদৌ জানে না যে তার একটি ফুফু বা চাচা আছে!

সন্তানদের ছোটবেলা হতে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য শেখাতে চেষ্টা করি

আমার কাছে যদি সত্য-মিথ্যার বিষয়টি স্পর্শকাতর হয়ে থাকে, যদি আমি নীতি নৈতিকতার ব্যাপারে আপোষহীন হয়ে থাকি, যদি আমার সন্তানের উচ্চ ডিগ্রি অর্জনের আকাঙ্ক্ষার সাথে উচ্চ নৈতিকতাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে কোমর বেঁধে নামতে হবে। প্রস্তুতি নিতে হবে, নিজেকে তৈরী করতে হবে। কারণ শ্রেণীকক্ষে কেবল স্বাদহীন কিছু মালমশলা দেয়া হয়। আর ছাত্র-ছাত্রীরা ভাল রেজাল্ট করার আশায় সেগুলি মুখস্থ করে পরীক্ষার হলে তা উগরে দেয়া পর্যন্তই তা সীমাবদ্ধ থাকে। শ্রেণীকক্ষের পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি আমাকেই সন্তানের আত্মিক উন্নয়ন, নৈতিক চরিত্র গঠন ও ঈমানের নূর প্রবেশ করাবার জন্য বিশেষ কর্মসূচী হাতে নিতে হবে। এ ব্যাপারে যদি আমার আর্থিক কিছু খরচ হয় তার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে।

সন্তানদের অতি ছোটবেলা হতে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য শিখানোর চেষ্টা করতে হবে। সত্য উজ্জ্বল, মিথ্যা অন্ধকারাচ্ছন্ন। এটি বিভিন্ন কাজ, কথা ও উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দিতে হবে। তাকে বলতে হবে যে, দু'জন ফিরিশতা বা লেখক আমাদের দুই কাঁধে বসে নিদ্রাহীন ও বিরতিহীনভাবে আমাদের সকল কাজ রেকর্ড করে রাখছেন। একদিন আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ সে খাতা খুলে

দেখাবেন আমরা কি কি কাজ করেছি। আরো বলতে হবে যে লেখকগণ সম্মানিত ও সৎ। বাড়িয়ে বা কমিয়ে কিছু লেখার ক্ষমতা তাদের নেই। অতএব আমরা যা কিছুই করি না কেন ন্যায়-অন্যায়ের বিষয়টি যাচাই করে দেখা উচিত, অন্যায় হতে বিরত থাকা উচিত।

তারা যেন মিথ্যা না বলে

কোন কোন শিশু কথায় কথায় মিথ্যা বলে, যে কথাটি না বললেই নয় তাও হয়তো বলে। এভাবে এটি একটি বদঅভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তারা যেন মিথ্যা না বলে সেদিকে বাবা-মাকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, মা-বাবাকে এই বিষয়ে স্পেশাল মনোযোগ দিতে হবে। পরিস্থিতি যাই হোক নিজ সন্তানকে সর্বদা প্রকৃত সত্যটি তুলে ধরার অভ্যাস রপ্ত করাতে হবে। স্কুলের কোন ঘটনা, বন্ধুদের সাথে অপ্রীতিকর কিছু, প্রতিবেশীর সাথে অনাকাঙ্ক্ষিত কোন ঘটনা ইত্যাদি সকল বিষয়ে সে যেন কেবল সত্য কথাটি উপস্থাপন করে তা ভাল করে শিখিয়ে দিতে হবে। সত্য কথা বলার জন্য তাকে কিছু গিফ্‌ট দেয়ার প্রচলন করা যেতে পারে। সে যদি অন্যায় করে, তা না লুকিয়ে যথাযথভাবে তুলে ধরে, সতর্কতার সাথে তাকে সংশোধন করতে হবে। তাকে এ হিসাব করতে দেয়া যাবে না যে সত্য বললেই বিপদ। বরং সত্য বলার কারণে সে যেন সবসময় কিছু না কিছু উপহার পায়। সত্য বলার পরেও যদি মা-বাবা বকা দেন, গায়ে হাত তুলেন, চিৎকার করে কথা বলেন, তা হলে শিশু সন্তানরা ভবিষ্যতে মিথ্যা বলা শুরু করে। আর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকেও সন্তানের সামনে মিথ্যা বলা পরিহার করতে হবে।

আমার সন্তানদেরকে স্পষ্টভাষী হতে সাহায্য করি

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿﴾ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ﴿﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي

"রব্বিশ রহলি সদ্‌রি, ওয়াইয়াসসিরলি আমরি, ওয়াহলুল ওকদাতাম মিললিসানি, ইয়াফক্বহু ক্বউলি।"

হে আমার মালিক, তুমি আমার জন্যে আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দাও, আমার কাজকে আমার জন্যে সহজ করে দাও, যাতে করে ওরা আমার কথা বুঝতে পারে। (সূরা ত্ব-হা ২০ ঃ ২৫-২৮)

মহান আল্লাহ তা'আলা মুসা ﷺ-কে এই দু'আ শিখিয়ে দিয়েছিলেন যেন তাঁর মুখের জড়তা দূর হয়ে যায় এবং তিনি স্পষ্টভাবে মানুষের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাতে পারেন। আমার সন্তান যেন মিনমিনে স্বভাবের না হয়। সে যা বলবে তা যেন সকলের নিকট স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পায়। আর সে যেন সবসময় সত্যের পথে থাকে এবং সত্য কথা বলতে দ্বিধাবোধ না করে। কারণ একজন মুসলিমকে হক কথা (সত্য কথা) সবসময় বলতেই হবে এটা আল্লাহ তা'আলার আদেশ। যেমন তাকে দিয়ে কেউ যেন কোন অন্যায় কাজ করাতে না পারে। তাকে কেউ অন্যায় কাজ করতে বললে সে বলে দিবে তার দ্বারা এই কাজ করা সম্ভব নয়। তার সামনে কেউ কোন অন্যায় করলে সে তাকে বুঝিয়ে বলতে পারে যে কাজটি করা ঠিক নয়, এটি অন্যায়, ইত্যাদি।

ইসলামী আদব শিক্ষা দান

ইসলাম শুধুমাত্র একটি ইবাদতসর্বস্ব ধর্মই নয়, ইসলাম একটি সম্পূর্ণ জীবনপদ্ধতিও (complete code of life) বটে যাতে আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় আচার-আচরণেরও সুস্পষ্ট নির্দেশ বর্তমান। উত্তম আদব (good manners/etiquette) ইসলাম ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তাই ইসলাম জীবনের সর্বক্ষেত্রে আদবের উপর খুব জোর দিয়েছে। আল্লাহর কুরআন ও রসূলের হাদীসে আদবের নানাদিক বর্ণনা করা হয়েছে এবং নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসলিমকে তা পালন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বুখারী ও আহমাদে দেখা যায় যে রসূল ﷺ বলেছেন, উত্তম আদব (noble manners) প্রতিষ্ঠা করার জন্যেই আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন। এবং তিনি আরো বলেছেন যে মু'মিনদের মাঝে তারাই উত্তম যাদের আদব অতি উত্তম শ্রেণীর। (তিরমিযী, আবু দাউদ, আহমাদ)

তার দৈনন্দিন জীবনে কুরআন-হাদীস নির্দেশিত আদবগুলো মেনে চলার চেষ্টা যত বেশী করবে, একজন মুসলিম তত বেশী আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে পারবে। অন্যদিকে আদবকে অবহেলা করলে সে ইসলামের মূল শিক্ষা হতে দূরে সরে যাবে, ফলে আল্লাহর প্রিয় সে হতে পারবে না। এটা একটা সুস্পষ্ট ক্ষতি বটে।

আমরা বড়রাও ইসলামী আদবের অনেক কিছুই জানি না। হয়তো দেখা যায় কেউ কেউ বাম হতে পানি খাচ্ছেন! ফোন ধরে শুধু বলছেন হ্যালো! কোথায়

ইনশাআল্লাহ আর কোথায় আলহামদুলিল্লাহ বলতে হবে তা জানি না! আমরাই যদি সঠিকভাবে না জানি তাহলে সন্তানদের কীভাবে শেখাবো? তাই ইসলামী আদবের বিষয়ে আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। সন্তানদের সঠিক ইসলামী আদব শেখানোর জন্য কেজী থেকে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত আমাদের প্রকাশিত ইসলামিক এডুকেশন সিরিজ জোগাড় করা যেতে পারে। আর ক্লাস সেভেন থেকে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজের ৮নং বই "ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনে কীভাবে উন্নতি করবে?" এই বইটি সংগ্রহ করা যেতে পারে।

সন্তানদের সালামের অভ্যাস করানো

আমাদের সন্তানদের সর্বত্র সালামের ব্যবহার শেখাতে হবে। সবাইকে সালাম দেয়ার অভ্যাস করতে হবে, হতে পারে সে ছোট বা বড়। বাসায় ঢুকেই বাসার সকলকে সালাম দিতে হবে। খালি বাসায় ঢুকেও সালাম দিতে হবে, কারণ ঘরে রহমতের ফিরিশতা থাকে। ফোন আসলে প্রথমে ফোন ধরেই আগে সালাম দিতে হবে। কোথাও ফোন করলে সর্বপ্রথমে সালাম দিয়ে শুরু করতে হবে। সালামকে বিকৃত করা যাবে না অর্থাৎ "স্লামুয়ালাইকুম" বলা যাবে না, কারণ এই বিকৃত সালামের কোন অর্থ হয় না। সন্তানদেরকে বলতে হবে সম্পূর্ণ সালাম পরিষ্কারভাবে দিতে "আস্সালামু আলাইকুম"।

সন্তান হয়তো কখনো কখনো সালাম দিতে ভুলে যেতে পারে। এটা প্র্যাকটিসের বিষয়, কোন কোন পরিবারে সালামের প্রচলন ব্যপকভাবে নেই বলে সন্তানরাও ঐভাবে গড়ে উঠে না। সন্তানকে কখনই বলার দরকার নেই 'আংকেলকে সালাম দাও, দাও দাও সালাম দাও।' 'দাদাকে সালাম দাও, আন্টিকে সালাম দাও ইত্যাদি বলার দরকার নেই। বরং বড়রা যদি প্রতিদিনের জীবনে ছোট-বড় সবাইকে সালাম দেয় তাহলেই ঐ বাসার প্রতিটি শিশু সন্তানরা সালাম দেয়া ও সালামের জবাব দেয়া শিখবে।

আমরা আরো একটি ভুল সবসময় করি, আসলে এটা আমাদের দেশের কালচার। বড়রা সবসময় ছোটদের থেকে সালাম আশা করেন! এটা মোটেও ঠিক না। আমাদের দেশে অধিকাংশ মা-বাবারা নিজ সন্তানদের সালাম দেন না। সালাম একটি উৎকৃষ্ট দু'আ এর অর্থ 'তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক'। কিন্তু এই দু'আ মা-বাবারা সন্তানদের জন্য করতে লজ্জাবোধ করেন। শুধু সন্তানদের

থেকে নিজেদের জন্য এই দু'আ আশা করেন কিন্তু সন্তানের শান্তির জন্য দু'আ করেন না।

আমাদের সমাজে শুধু মা-বাবারা নন। অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্র-ছাত্রীদের সালাম দেন না, ইমাম সাহেব রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় সাধারণ লোকদের সালাম দেন না, অফিসে বস কর্মচারীদের সালাম দেন না, সাহেব গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে সালাম দেন না। কেউ রিক্সায় বা সিএনজিতে উঠে কখনোই কোন রিক্সাওয়ালা বা সিএনজিওয়ালকে সালাম দেন না।

আমরা আসলে সালামের প্রকৃত অর্থ বুঝি না বলে একে অপরের জন্য দু'আ করি না। যেমন বস যখন গাড়িতে উঠে বসেন তখন সালাম কার জন্য বেশী প্রয়োজন? বসের না ড্রাইভারের? আসলে বসের চেয়ে সালামের বেশী প্রয়োজন ড্রাইভারের। কারণ ড্রাইভার যখন গাড়ি চালাবে তখন তার বেশী শান্তিতে থাকা প্রয়োজন যেন কোন দুর্ঘটনা না ঘটে। ঠিক একইভাবে সন্তান যখন স্কুলে যায় তখন শান্তি বেশী প্রয়োজন মায়ের চেয়ে সন্তানের কারণ সে স্কুলে যাওয়ার পথে নানা রকম দুর্ঘটনায় পরতে পারে, তাই বাসা থেকে বিদায় নেয়ার কালে মায়ের উচিত সন্তানকে সালাম দেয়া।

সুন্দর ও অসুন্দর কথা শিক্ষাদান

সুন্দর কথা ঃ সুন্দর বা সকলের পছন্দনীয়, সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য কথা বলার ধরণ আমাদের জানা প্রয়োজন। কেননা সুখী পরিবার গঠনে সুন্দর কথা বিশেষ তাৎপর্যবহ। অবশ্য সুন্দর করে কথা বলা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। কাজেই এ বিষয়ে আমাদের অভ্যাস গঠন করা অত্যন্ত জরুরী। সুতরাং শিখি ঃ

১) বাঁকা চোখে তাকিয়ে, ভ্রু কুঞ্চিত করে, বাঁকা-বাঁকা, পেচানো, কথায় কথায় খোঁচা না মেরে সোজা করে কথা বলতে চেষ্টা করা।

২) ভাষার ও কথার জটিলতা বা কৃত্রিমতা পরিহার করে সহজ, সকলের বোধগম্য করে কথা বলা।

৩) সুন্দর সুন্দর শব্দ চয়ন করে কথা বলতে চেষ্টা করা, অসুন্দর, অসামাজিক, অশ্রাব্য মন্দ ভাষাগুলোকে কথোপকথনে ব্যবহার না করা।

৪) যেকোন কথা প্রকাশ্যে মুখ কালো করে না বলে স্বাভাবিকভাবে বা হেসে হেসে বলা উত্তম। রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বলা একটি দান।"

৫) কোমল ভাষায় কথা বলা উত্তম, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ *"এটা আল্লাহরই দয়া যে, তুমি তোমার সাথীদের প্রতি কোমল। তা না হয়ে তুমি যদি কঠোর হতে তা হলে, তারা তোমার চারদিক থেকে দূরে সরে যেতো।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯)*

৬) সুন্দর শ্রুতিমধুর শব্দ ব্যবহার করা।

৭) স্পষ্ট ও উপস্থিত শ্রোতার বা যার উদ্দেশ্যে কথা তার বোধগম্য করে বলা।

৮) আঞ্চলিকতা, সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রতা পরিহার করে বইয়ের ভাষায় বিশুদ্ধ কথা বলা।

৯) শ্রোতার বা উপস্থিত সভ্যদের কল্যাণকামী, হিতকর কথা বলা।

১০) বাসায়, সামাজিক পরিমন্ডলে এবং অফিস কর্মস্থলে একইভাবে সবসময় কথা বলার চেষ্টা করা।

১১) সদালাপী ও মিষ্টভাষী হওয়া।

১২) অর্থবহ কথা বলা, অর্থহীন বাজে কথা না বলা।

১৩) তর্ক-বিতর্ক না করা, তর্কে কোন সমাধান হয় না।

১৪) শুধু যুক্তি দেখিয়ে কথা না বলা, সব বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করা যায় না। কাজেই অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে জ্ঞানগর্ভ কথা বলা-- যা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে।

১৫) একজনের পেছনে বা অনুপস্থিতিতে আরেকজনের কাছে তার প্রসঙ্গে মন্দ কথা না বলা। এটি গীবতের সাথে সম্পৃক্ত। এজন্যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তি অবধারিত।

১৬) কথা বলার ক্ষেত্রে এমন মনে করা আল্লাহর দেয়া জবানকে আল্লাহর নির্দেশমত ব্যবহার করছি। অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে বিরত থাকা।

১৭) কটু কর্কশ, রুক্ষ, আঘাত বা হিট করামূলক, অপমানসূচক কথা না বলা।

১৮) অপ্রাসঙ্গিক, বেশি কথা, অনর্গল কথা না বলা।

১৯) শ্রোতাকে কখনো উপহাস, বিদ্রুপ, ঠাট্টা ও তিরস্কার করে কথা না বলা।

২০) মিথ্যা কথা না বলা কারণ মিথ্যা সকল পাপ কাজের জননী।

২১) কারোর নামে অপবাদ না দেয়া, কারণ এমন অপবাদ একসময় নিজের জন্যে অপেক্ষা করতে পারে তা মনে রাখা।

২২) শপথ না করা কারণ সময়ের ব্যবধানে বিপদ কেটে গেলে বা সুসময়ে সে শপথের কথা অনেকেরই মনে থাকে না। যদিও এটি মানার ব্যাপারে ইসলামের হুকুম কঠোর।

২৩) কথায় কথায় চেঁচামেচি করা, জোরে কথা বলা, মেজাজ গরম করে কথা না বলা।

২৪) অন্যের দোষ-ত্রুটি খুঁজে না বেড়ানো।

২৫) মেয়েরা মেয়েদের মত, মহিলারা মহিলাদের মত, ছেলেরা ছেলেদের মত, পুরুষেরা পুরুষের মত কথা বলা।

২৬) স্থান-কাল পাত্রভেদে কথা বলা।

২৭) ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করা, অশ্লীল, গালি বা বকা দিয়ে কথা না বলা।

২৮) কখনো কখনো আনন্দদায়ক, বৈধ রসিকতা করে কথা বলা।

২৯) কারোর কথা বলতে যেয়ে নেতিবাচক বিশ্লেষণ গাধা, গর্দভ, বোকা, পাগল-ছাগল, গরু, বলদ ইত্যাদি জুড়ে দিয়ে কথা না বলা।

৩০) ভাল কাজের স্বীকৃতি দেয়া, প্রশংসা করা। বিরোধিতার কারণে বিরোধিতা না করা।

৩১) যে উপকার করেছে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উত্তম। প্রিয় নাবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ হয় না।" (আবু দাউদ)

৩২) সুন্দর ভাষায় সহজ করে উপদেশ বা পরামর্শ দেয়া, নিজের ব্যাপারে শ্রোতার কোন কথা, কোন পরামর্শ আছে কিনা জানতে চাওয়া এবং পরামর্শ-দানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো।

৩৩) ভাষা আল্লাহর মহিমা: সুতরাং সব সময় তার পবিত্রতা রক্ষা করা।

৩৪) শ্রোতার জন্যে দু'আ করা, নিজের শুভ কামনার কথা তাকে বলা।

৩৫) ভুল করে ফেললে বা ভুল হয়ে গেলে আমি দুঃখিত কথাটি বিনয়ের সাথে বলার চেষ্টা করা।

সর্বোপরি এমন কথা না বলা যাতে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ কষ্ট পায় - এ নীতিতে প্রতিদিন প্রত্যেক বিষয়ে সচেতনতার সাথে স্রষ্টা ও মানুষের পছন্দনীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও মন-মেজাজে কথা বলার চেষ্টা এবং বাস্তবায়ন করা সচ্চরিত্রের উত্তম বহিঃপ্রকাশ। যা সকল মানুষ একে অপরের কাছে প্রত্যাশা করে এবং পাওয়ার অধিকারও রাখে।

অসুন্দর কথা ঃ অসুন্দর কথা মানে সর্বত্র অশান্তির বিষ বাস্প ছড়িয়ে দেয়া। অসুন্দর কথার ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এতে অস্থির হয়ে উঠতে পারে পারিবারিক জীবন, লুণ্ঠিত হতে পারে দুনিয়ার শান্তি। কিন্তু কিভাবে?

১) অসুন্দর কথায় মানুষ অসন্তুষ্ট হয়।
২) পারস্পরিক ঘৃণা বিদ্বেষ শুরু হয়।
৩) সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয়।
৪) প্রতিবেশি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, বিপদে এগিয়ে আসতে চায় না।
৫) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়।
৬) একে অপরের সাথে অন্তরঙ্গতা নষ্ট হয়। বন্ধুত্ব বিনষ্ট হয়।
৭) পরিবারের ভাঙ্গন শুরু হয়, সন্তান অমানুষ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
৮) রাগারাগি, মারামারি ও হানাহানির সৃষ্টি হয়।
৯) মান-ইজ্জত, সম্মান, পজিশান বিনষ্ট হয়।
১০) সমাজে দ্বন্দ্ব-কলহ, ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হয়।
১১) ঐক্য ও একতা বিনষ্ট হয়।
১২) পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও স্নেহবোধ বিলীন হয়ে যায়।
১৩) এমন ব্যক্তির মৃত্যু হলে প্রতিবেশীরা লাশ দাফন করতে যেতে চায় না।
১৪) রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়, অস্থিতিশীল পরিস্থিতি দানা বেঁধে উঠে।
১৫) সর্বোপরি দুনিয়ায় অশান্তি এবং আখিরাতে জাহান্নামের অধিবাসী হওয়া অবধারিত হয়ে যেতে পারে।

সুতরাং এমন অনিষ্টতা থেকে মুক্তি পেতে আমাদের উচিত সুন্দর করে কথা বলা, সদালাপী হওয়া।

আমার সন্তানের নির্ভুল জ্ঞান অর্জন

"রব্বি যিদনী ইলমা"
হে আমার রব, আমার ইলম [জ্ঞান] বাড়িয়ে দাও।
(সূরা ত্ব-হা ২০ ঃ ১১৪)

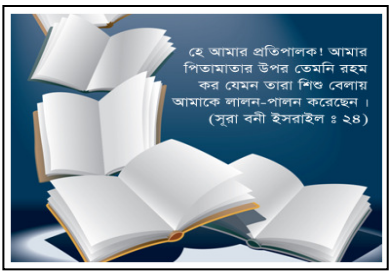

চ্যাপটার ৮

বাবা-মায়ের জ্ঞান অর্জন করা জরুরী

"আমি অনেক জানি"এটা নিজের উন্নতি এবং পারিবারিক শিক্ষার জন্য একটা বড় সমস্যা, বড় বাধা। বিশেষ করে ইসলাম সম্পর্কে যতটুকু জানি তাকেই অনেক জানি মনে করা এবং তর্ক করা। আমরা যেন ভুল না বুঝি, এখানে সবার কথা বলা হচ্ছে না, এটা আমাদের মুসলিম সমাজের একটা সাধারণ চিত্র। আমি সব জানি বা মোটামুটি ভালই জানি এই মনোভাব যদি মনের মধ্যে রাখি তাহলে আমি নিজেই নিজের জ্ঞানের দরজা বন্ধ করে দিলাম।

তাই আমাদের মনোভাব এমন হওয়া উচিত যে অন্যরা আমার চেয়ে বেশী জানে। যেমন একটা প্রোগ্রামে গেলাম, সেখান থেকে সবচেয়ে বেশী উপকৃত হওয়ার উপায় হচ্ছে না-জানার ভান করে বসে বসে শিক্ষাগ্রহণ করা এবং ঐ প্রোগ্রামে আমিই সবচেয়ে কম জানি এটা মনের মধ্যে রাখা। তাহলে এক সময় দেখা যাবে যে আমি যে সকল বিষয়গুলো জানতাম না তা অনেকখানি জেনে গেছি। আর ঐ প্রোগ্রামে যদি আমি নিজেকে জাহির করতে চাই অর্থাৎ নিজে অনেক জানি এটা প্রকাশেই ব্যস্ত থাকি তাহলে বেশী দূর এগুতে পারবো না। আবার প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে অনেক কিছুই জানা যায় এবং পরিষ্কারও হওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য এমন হওয়া যাবে না যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আবার আমি আমার পান্ডিত্যকে প্রকাশ করতে চাচ্ছি। অথবা প্রশ্নের উদ্দেশ্য হবে না যে বক্তাকে বা অন্যদেরকে আটকানো বা নাজেহাল করা। তাই আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে জানার জন্য জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আমি জানি এই মনে করে বসে থাকলে হবে না। আমাদেরকে সব সময় জানার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, জানার কোন শেষ নেই।

ভুল শিক্ষা থেকে সাবধানতা

ইসলামের উপর বাজারে অনেক বই-ই পাওয়া যায় যাতে মানুষের মধ্যে আবেগ (জজ্‌বা) সৃষ্টির জন্য এমন সব কথা তুলে ধরা হয়েছে যা সত্য নয়, যা কুরআন-হাদীসের আলোকে গ্রহণযোগ্য নয়। অসত্য দিয়ে মানুষকে সত্যের পথে আহবান করা যায় না। তাই সরাসরি কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের রেফারেন্স ছাড়া কোন ওলী, বুজুর্গ বা মুরুব্বীর বানানো কেচ্ছা-কাহিনী মেনে নেয়া ঠিক নয়। যুগ পরিবর্তন হয়ে গেছে, মানুষের জ্ঞানের পরিধি বেড়েছে। সহীহ্ হাদীস, জাল হাদীস, দুর্বল হাদীসের বই বাজারে পাওয়া যায়, তা যাচাই-বাছাই করে আমাদের পড়াশোনা করা উচিৎ।

ইবলিস শয়তানের পলিসি থেকে সাবধানতা অবলম্বন

ইবলিস শয়তানের পলিসি হচ্ছে মুসলিমদেরকে কুরআনের সঠিক শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা, কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা বুঝতে না দেয়া। কারণ আমি যদি কুরআন বুঝে সেই অনুযায়ী আমার জীবন চালাতে থাকি তাহলে সেখানেই ইবলিস শয়তানের ব্যর্থতা। তাই শয়তান সুকৌশলে মানুষকে বোকা বানানোর জন্য বেছে নিয়েছে কুরআনকেই কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে। যেমন ঃ খুব সহজে কিভাবে কিছু দু'আ-দুরূদ পরে জান্নাত লাভ করা যাবে, কোন দু'আ কত হাজার বার পড়লে কি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ধরনের আমলের কোন সহীহ দলিল কুরআন বা সহীহ হাদীসে নেই। বাজারে এই ধরনের অনেক বই-ই পাওয়া যায়, যেমন ঃ মক্বছুদুল মোমিনীন, বেহেশতের পথ, নেয়ামুল কুরআন, ফাজায়েলে আমল, আমলে নাজাত, আমালে কুরআন, বেহেস্তি জেওর, সোলেমানী খাবনামা, নূরানী মজমুয়ায়ে পাঞ্জেগানা অজিফা ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই এই ধরনের ভিত্তিহীন বই-পত্র, অজিফা এবং মানুষের বানানো দুরূদ হতে খুব সাবধান থাকতে হবে।

ইবলিস শয়তান আমাদের অনেক প্রকার সওয়াবের লোভ দেখায়, জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ দেখায়। সে বলে এই দু'আ ৪০ বার পড়লে ৮০ বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, ঐ দুরূদ এতোবার পড়লে ১ লক্ষ ফিরিশতা কিয়ামত পর্যন্ত দু'আ করতে থাকে। এ কথা শুনে আমরা বলি 'সুবহানাল্লাহ', এর ফজিলত এতো! এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে গুনাহের প্রতি মানুষের ভয় কমিয়ে দেয়া হচ্ছে, অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে। তখন মানুষ মনে করে ২-৫টা গুনাহ

করলে কি আর ক্ষতি হবে? অমুক দু'আ পড়লে তো ৮০ বছরের গুনাহ মাফ হয়েই যাবে। এভাবে শয়তান অসচেতন লোকদেরকে লক্ষ লক্ষ সওয়াবের লোভ দেখিয়ে ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

মনে রাখতে হবে, আমি আমার জীবনে ইবাদত মনে করে যা কিছু করবো তা অবশ্যই কুরআন অথবা সহীহ হাদীসে থাকতে হবে। কেউ যদি আমাকে কোন স্পেশাল দু'আ-দুরূদ বা কোন মহাপূণ্যের আমলও শিখিয়ে দেয় তাহলে অবশ্যই তার authentic দলিল চাইবো অথবা আমি নিজে কুরআন ও সহীহ হাদীস ঘেঁটে তা অবশ্যই যাচাই করে নেবো।

সন্তানদের সঠিক শব্দ শিক্ষা দেয়া

আমাদের দেশে কুরআন হাদীসের অনেক সঠিক শব্দ পরিবর্তন হয়ে ফার্সি বা উর্দু হয়ে গেছে। যার মাধ্যমে আসলে আল্লাহ বা তার রসুল ﷺ যা বলেছেন তা সঠিকভাবে প্রকাশ পায় না। তাই আমাদের সন্তানদের ছোট বয়স থেকেই এই ইসলামী শব্দগুলোর সঠিক শিক্ষা দেয়া উচিত। যাদের সন্তান বড় হয়ে গেছে তাদেরও এই শব্দগুলো সংশোধন করে নেয়া উচিত। যেমন ঃ নামায = সলাত, রোযা = সিয়াম, রমজান = রমাদান, বন্দেগী = ইবাদত, বেহেশত = জান্নাত, দোযখ = জাহান্নাম ইত্যাদি।

এছাড়া আরো কিছু শব্দ আমাদের মধ্যে খুব প্রচলিত যার পরিবর্তন প্রয়োজন এবং এই শব্দগুলো ইসলামী পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। যেমন, নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এবং অন্যান্য নাবী ও সাহাবাদের নামের আগে হযরত বলা ঠিক নয়। হযরত শব্দটি আরবী নয় এটি ফার্সি, এর অর্থ মিষ্টার। আল্লাহ তার কুরআনে কোথাও কোন নাবীর নামের আগে এই হযরত শব্দটি ব্যবহার করেননি এবং হাদীসেও কোথাও কোন নাবীর নামের আগে এই হযরত শব্দটি নেই। আসলে হযরত শব্দটি সাধারণত আমাদের এই উপমহাদেশেই ব্যবহার হয়। আবার নাবী মুহাম্মাদ ﷺ তার কোন সাহাবীকে হযরত উপাধী দেননি এবং কোন সাহাবী অন্য কোন সাহাবীকেও এই উপাধী দেননি, এছাড়া হাদীসের কোথাও এই শব্দটি নেই। তাই আমাদের কথা-বার্তা ও লেখা-লেখি থেকে এই শব্দটি বাদ দেয়া উচিত। মহান আল্লাহ তার নাবীদের ও সাহাবাদের যে মর্যাদা দিয়েছেন সেটুকুই যথেষ্ট, আমরা আবার তাদের নামের আগে অতিরিক্ত কোন কিছু লাগিয়ে তার মর্যাদা বাড়াতে পারবো না বরং মর্যাদা ক্ষুন্ন হতে পারে।

আরো একটি শব্দ আমাদের মধ্যে খুব প্রচলিত যা জানার সাথে সাথে পরিহার করা উচিত আর তা হচ্ছে নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর নামের সাথে হুজুর বা হুজুর পাক শব্দ ব্যবহার করা। এই দু'টি শব্দও কুরআন ও হাদীসের পরিভাষা নয়। হুজুর মানে হাজির, অর্থাৎ তিনি বেঁচে আছেন বা আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন (নাউযুবিল্লাহ)। এই শব্দটি মারাত্মক আপত্তিজনক যার মধ্যে শিরকের গন্ধ রয়েছে। তাই এই শব্দটি আমাদের নিজেদের এবং সন্তানদের ব্যবহার করা ঠিক নয়। এরপর পাক শব্দটি মূলতঃ এসেছে খৃষ্টানদের থেকে, তারা তাদের নাবীর নামের আগে এবং তাদের ধর্ম গ্রন্থের আগে হলি (পাক) শব্দটি ব্যবহার করে থাকে যেমন, হলি প্রফেট, হলি জেসাস, হলি বাইবেল, হলি বুক ইত্যাদি। তাই এই শব্দটিও আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর নামের আগে এবং আমাদের আল-কুরআনের আগে ব্যবহার করা ঠিক নয়।

এছাড়া আরো একটি শব্দ আমাদের মধ্যে খুব প্রচলিত যেমন মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ, কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ ইত্যাদি। এই শরিফ শব্দটিও হাদীস বা কুরআনের পরিভাষা নয়। তাই এই নামগুলোর আগের শরিফ শব্দটি ব্যবহার করা ঠিক নয়। যেমন সঠিক শব্দগুলো হচ্ছে ঃ আল কুরআন বা কুরআন মাজিদ, মক্কা মুকার্‌রমা, মদীনা মুনাওয়ারা।

আবার কবরকে মাযার বলা বা রসূল ﷺ এর কবরকে রওজা বলা ঠিক নয়। মাযারও ফার্সি শব্দ। সঠিক ইসলামী পরিভাষা হচ্ছে যে কোন কবরকে কবর বলা সে নবী হোক বা কোন আউলিয়া হোক বা অন্য কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি হোক। হাদীসে আল্লাহর রসূল ﷺ যেভাবে যার নামকরণ করে গেছেন সেই শব্দ ব্যবহার করাই উচিত এতেই প্রকৃত সম্মান বজায় থাকবে। আমরা আমাদের নিজেদের থেকে নাম পরিবর্তন করে বা আরো অতিরিক্ত কিছু লাগিয়ে তার সম্মান বাড়াতে পারবো না।

কুরআন অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়া

আল-কুরআন নামক সর্বশেষ কিতাব জীবন পরিচালনার জন্য একটি পরিপূর্ণ গাইডলাইন। এর পরিপূর্ণ ব্যবহারই প্রকৃত সুফলের নিশ্চয়তা বিধান করে। এর আংশিক অনুসরণ ইহকালীন লাঞ্ছনা ও পরকালীন আযাবের সুসংবাদ প্রদান করে। এ ব্যাপারে আল্লাহ মানুষকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন এই বলে যে-

"তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ মানবে আর কিছু অংশ অস্বীকার করবে? জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যাদেরই এরূপ আচরণ হবে তাদের এছাড়া আর কি শাস্তি হতে পারে যে তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে? তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ অবগত আছেন।" (সূরা আল বাকারা ২ ঃ ৮৫)

এ ধরনের সুস্পষ্ট কঠোর হুঁশিয়ারী সত্ত্বেও শুধু না জানার কারণে আমরা ক্রমাগত আল্লার কিতাবের প্রতি হাস্যকর আচরণ করেই যাচ্ছি। এ কিতাবকে সবিনা খতম আর সূরা ইয়াসীন পাঠ করার জন্য ব্যবহার করে যাচ্ছি। যে কিতাব আমাদের যাবতীয় আসমানী ও জমিনী সফলতায় শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় ভূষিত করতে পারত সেটির কাছ হতে আমরা শুধু সামান্য সওয়াব আদায়ের জন্য আর মৃতের কুলখানির জন্য ব্যবহার করছি। অথচ এটি বিস্তারিত অর্থসহ পড়ে আমাদের জেনে নেয়া উচিত কিভাবে আমরা একটি সোনালী সমৃদ্ধিশালী জীবন গড়তে পারি যা আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সুস্পষ্ট সফলতার গ্যারান্টি দিতে পারে। আল্লাহ তাঁর নাবীকে বলেছিলেন ঃ

"(হে নাবী!) আমি আপনার উপর এ কুরআন এ জন্য নাযিল করিনি যে, আপনি মুসীবতে পড়ে যান।" (সূরা ত্ব-হা ২০ ঃ ২)

আসুন আমরা আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত আল কুরআন বুঝে পড়ার চেষ্টা করি, রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাত বিস্তারিত পড়ে জেনে নিই – কিভাবে একটি উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন সুখী-সমৃদ্ধ পরিবার ও সমাজ গড়তে পারি। আল্লাহ আমাদের তার দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে জেনে এর পূর্ণ অনুসরণের তৌফিক দিন। ইহকালীন লাঞ্ছনা ও পরকালীন আযাব হতে পরিত্রাণ দিন।

যথেষ্ট পরিমাণ অধ্যয়নের পর সওয়াবের উদ্দেশ্যে বা কুরআনের মর্মবাণী হতে ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে, কুরআনের প্রতি শ্রদ্ধা ও এর মর্যাদা উপলব্ধি করে যদি তিলাওয়াত করতে চাই তা হলে কোন দোষ নেই। অসুস্থ হওয়ার পর ডাক্তার যে প্রেসক্রিপশন দেন তা দশ হাজার বার পড়লেও (অর্থাৎ তিলাওয়াত করলে) কি আমার অসুখ সারবে? মোটেও না। আমাকে ঐ ঔষধগুলি কিনে ব্যবহার করতে হবে। তা হলেই কেবল আমি রোগমুক্তির আশা করতে পারি। আল কুরআন হলো জীবনের সকল সমস্যার প্রেসক্রিপশন। এটা অধ্যয়ন করে অনুধাবন করে এর শিক্ষা কাজে লাগানোর জন্য কুরআন পাঠানো হয়েছে। আমি যদি অর্থ ছাড়া কেবল রিডিং পড়ে যাই তা হলে কুরআন পাঠানোর মূল লক্ষ্য

ব্যর্থ করে দেবে। তাই আজই অর্থসহ কুরআনের তাফসীর সংগ্রহ করি এবং প্রতিদিন ১৫ মিনিট থেকে ১ ঘন্টা নিয়মিত অধ্যয়ন করি এবং কুরআনের আলোকে জীবনকে গড়ে তুলি।

আমার সন্তানের সঠিক আকীদা

আকীদা হলো ইসলামের ভিত্তি ও মূল। "আকীদা" শব্দটির পারিভাষিক অর্থ হলো ঃ বিশ্বাসকে মনে এমনভাবে ধারণ করা যাতে এর মাঝে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে। কারণ ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত মানুষের জন্য জীবনবিধান। তাই তাঁর জীবনবিধান মানতে হলে সর্বাগ্রে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আকীদা হলো আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। কেননা আকীদা যদি বিশুদ্ধ না হয়, তাহলে যাবতীয় কথা ও কাজ আল্লাহর নিকট বাতিল বলে গণ্য হয়। আল্লাহ বলেন ঃ

"কেউ ঈমান (ইসলাম) প্রত্যাখ্যান করলে তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে।" (সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ ৮৫)

তৃতীয়ত, আখিরাতে নাযাত লাভের জন্যে আকীদা বিশুদ্ধ হওয়া অত্যাবশ্যক। উপরোল্লিখিত আয়াত দ্বারা আমরা তাই বুঝতে পারি। চতুর্থত, যুগে যুগে নাবী-রসূলগণের দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু ছিল আকীদা। প্রত্যেক নাবী প্রথমে আকীদার দাওয়াত দিতেন। মহা নাবী ﷺ এজন্যেই মক্কায় সর্বপ্রথম আকীদা সংশোধনের জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। মুসলিম মাত্রই ইসলামী আকীদায় বিশ্বাসী হতে হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত রসূলে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর বিধিনিষেধ মেনে চলে সে মুসলিম এবং যে এর ব্যতিক্রম করে সে ইসলামের দৃষ্টিতে কাফির বা অবিশ্বাসী। আর মুখে যে ব্যক্তি ইসলামের কথা ঘোষণা করে কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করে না, সেই ব্যক্তি হলো মুনাফিক। মুনাফিক কাফির হতেও নিকৃষ্টতর ও মারাত্মক। এই জন্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সবচেয়ে নিচের স্তরে থাকবে এবং তুমি তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবে না।" (সূরা আন নিসা ৪ ঃ ১৪৫)

মানব জীবনে আকীদার প্রভাব ঃ আকীদা মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আকীদা ছাড়া মানব জীবন কল্পনা করা যায় না। আমাদের সন্তানদেরকে শিক্ষা দিতে হবে তারা যেন কোন মাযারে না যায়। মাযারের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন না

করে। মাযারে টাকা-পয়সা না দেয়। কোন কিছু পাওয়ার জন্য পীর বা ওলীর কাছে না যায়। কোন হুজরকে ক্ষতি বা উপকারের মালিক মনে না করে। কোন পীর-দরবেশ গায়েব জানে এই বিশ্বাস না রাখে। কোথাও গিয়ে পানি পড়া, চাল পড়া না আনে। কোন পীরের মুরিদ না হয়। এসবই ইসলামী আকীদার অন্ত র্ভুক্ত। ইসলামী আকীদা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে আমাদের প্রকাশিত The Way is One বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল।

গান, কবিতা, গল্প-উপন্যাস, নাটক, সিনেমা এবং বাঙালী কালচারের নামে নানা রকম শিরক!

১. আমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছি যে আমাদের সন্তানদের মনে বাঙালী কালচার আর ফ্যাশনের নামে আল্লাহ-বিরোধী বিশ্বাস ঢুকছে?

২. আমরা কি কখনো গভীরভাবে খেয়াল করেছি যে আমি এবং আমার সন্তানেরা কী ধরনের বই বা গল্প-উপন্যাস-কবিতা পড়ছি? এবং এই ধরনের গল্প-উপন্যাস বা কবিতার মাধ্যমে স্লো-পয়জনিং-এ আমরা নানা রকম শিরকে আক্রান্ত হচ্ছি?

৩. আমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছি যে আমি এবং আমার সন্তানেরা সাধারণত কি ধরনের গান শুনে থাকি? রবীন্দ্র সঙ্গীত বলি, আর পল্লীগীতি বলি, আর মারফতি বলি, আর দেশাত্মবোধক বলি, আর লালনগীতি বলি, আর ব্যান্ড সঙ্গীত বলি এই ধরনের গানের অনেক কথাতেই রয়েছে শিরক! মনে রাখতে হবে যে শিরকের গুনাহ আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করবেন না।

৪. আমি কি কখনো চিন্তা করেছি যে আমি এবং আমার পরিবারের সবাই মিলে নিয়মিত কী ধরনের নাটক-সিনেমা দেখছি? এই ধরনের নাটক-সিনেমা, হিন্দি সিরিয়াল, হিন্দি মুভি আমাদেরকে কুরআনের পথ থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অনেক হিন্দি মুভির মধ্যেই থাকে হিন্দুদের পূজা যা আমি দেখছি এবং শিরকের প্রশ্রয় দিচ্ছি। আবার হিন্দি মুভি যখন শুরু হয় তখন দেব-দেবীর নামে তা শুরু করা হয়। আসুন একটিবার গভীরভাবে ভেবে দেখি আমার ঘরে আমি এই টেকনোলজির মাধ্যমে আধুনিক উপায়ে হিন্দুদের মূর্তি পূজার আশ্রয় দিচ্ছি।

৫. আজকাল আমাদের সন্তানেরা রক সঙ্গীত খুব ভালবাসে। আমি কি জানি আজকালকার রক সঙ্গীত (Rock music)-এর অনেক গায়করাই রীতিমতো ইবলিসের (শয়তানের) পূজা করে থাকে? এবং তাদের গানের কথাগুলো হচ্ছে ঐ শয়তানের ইবাদত? যেমন ঃ এ ধরনের একটি গানের লাইন "হে আমার প্রভু শয়তান ... আমাকে টানতে টানতে হেলে (জাহান্নামে) নিয়ে যাও ....."। সন্তানের মা-বাবা হিসেবে আমি কি একটিবার চিন্তা করে দেখেছি যে আমার সন্তানেরা কি ধরনের গান শুনছে? তাদের কানের মধ্যে যে সারাক্ষণ হেডফোন লাগানো থাকে তাতে তারা কি শুনছে আর কি অর্জন করছে?

সন্তানদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া

লুকমান ছিলেন একজন 'হাকিম' অর্থাৎ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। প্রজ্ঞা হলো জ্ঞানের ন্যায়সংগত প্রয়োগের সর্বোচ্চ স্তর। সূরা লুকমান আল কুরআনের ৩১ নম্বর সূরা। এই লুকমান কোন নাবী ছিলেন না, মহান আল্লাহ তাকে খুব পছন্দ করতেন। কারণ তিনি জ্ঞান চর্চা করতেন এবং তার সন্তানদেরকে মহান প্রভুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাই আল্লাহ নিদর্শনস্বরূপ তার নামে একটি সূরা নাযিল করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য সূরা লুকমানের তাফসীর পড়তে পারি এবং আমাদের সন্তানদের সামনে তা শিক্ষণীয় হিসেবে তুলে ধরতে পারি।

সন্তানদের নিকট মুহাম্মাদ ﷺ এর পরিচয় তুলে ধরি

সন্তানদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটির সাথে বিস্তারিতভাবে পরিচিত করিয়ে দেই। তিনি যে আল্লাহর নাবী ও মানবতার শেষ নাবী তা বুঝিয়ে দেই। সন্তানকে বুঝিয়ে বলি তিনি ছিলেন সবচাইতে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। তিনি ছোটদেরও বন্ধু ছিলেন। ছোটরা রসূল ﷺ-কে খুব ভালবাসতো, তিনিও ছোটদের ভালবাসতেন। আমার সন্তানকে বলি যে রসূল ﷺ শ্রেষ্ঠ মানবদরদী ছিলেন, তিনি সর্বোত্তম মানুষ ছিলেন, সফল রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন, উত্তম স্বামী ছিলেন, আদর্শ বাবা ছিলেন, আল্লাহর সকল সীমার সংরক্ষণকারী ছিলেন, মানবতাবাদী সেনাপতি ছিলেন (সর্বনিম্ন লোক ক্ষয়ে তিনি যুদ্ধ শেষ করতেন, শত্রুপক্ষের আহত লোকদের সেবা করতেন। নারী, বৃদ্ধ, শিশু, পাদ্রী, ধর্মশালা, ফলবতী গাছ, ফসল ইত্যাদি তিনি যুদ্ধের আওতার বাইরে রাখতেন অর্থাৎ এদের

আক্রমণ করতেন না)। এ বিষয়গুলির পেছনে যে ইতিহাস আছে তা গল্পাকারে শুনিয়ে দেই। বলি আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ হলেন শেষ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ। রসূল ﷺ -এর জীবনের উপর লেখা বই খুবই সহজলভ্য, এসব বই এবং তার জীবনের উপর ভিত্তি করে তৈরী করা মুভি ও কার্টুন সংগ্রহ করি এবং পরিবারের সকলে মিলে জ্ঞান অর্জনের লক্ষে উপভোগ করি।

কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ঃ শিশুর জন্মদিন পালন করা যাবে কি? অনেকের প্রশ্ন অনেকটা এমন যে, কাউকে দাওয়াত দেই না, কোনো অনুষ্ঠান করি না, কেক কাটি না। শুধু বাসায় অল্প কিছু লোকজন একসাথে হয়েও কি একটু ভালো খাবার রান্না করে বাচ্চার জন্মদিনে খেতে পারবো না?

উত্তর ঃ আলহামদুলিল্লাহ, সহীহ নলেজ প্রচারের মাধ্যমে আজকাল অনেক বাবা-মায়েরাই জেনে গেছেন যে কারো জন্মদিন পালন করা ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে জায়িয নয়। অর্থাৎ ইসলাম জন্মদিন পালন করা অনুমোদন করে না। সমাজে অনেক দিনের দীর্ঘ প্র্যাকটিস চলে আসছে তা কিভাবে ১০০% ছেড়ে দেই। তাই কেউ কেউ বিষয়টাকে একটু ঘুড়িয়ে-পেঁচিয়ে পালন করতে চান। আসলে ইসলামের যে কোন বিষয়ই আল্লাহ এবং তার রসূল ﷺ -এর আদেশ-নিষেধের সাথে সম্পর্কিত। এখন নির্ভর করে আমি একজন মুসলিম হিসেবে সেই আদেশ-নিষেধ আংশিক পালন করবো নাকি পুরোপুরি পালন করবো।

প্রশ্ন ঃ 31st Night / Happy New Year পালন করা যাবে কিনা?

উত্তর ঃ একজন মুসলিম হিসেবে আমি অবশ্যই 31st Night /Happy New Year পালন করতে পারবো না এবং কাউকে এটা পালন করার জন্য সাহায্যও করতে পারবো না।

প্রশ্ন ঃ মুসলিমরা কি পহেলা বৈশাখ পালন করতে পারবে?

উত্তর ঃ না মুসলিমরা পহেলা বৈশাখ পালন করতে পারবো না। কারণ এটি মুসলিমদের উৎসব না। ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলিমদের বছরে দু'টি উৎসব, ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহা। তবে বৈশাখী মেলায় গিয়ে ইসলামের দাওয়াতী কাজ করতে পারবে।

প্রশ্ন ঃ হিন্দুদের পূজায় আমরা মুসলিমরা যেতে পারবো কি এবং তাদের প্রসাদ খেতে পারবো কি?

উত্তর ঃ একজন মুসলিম হিন্দুদের পূজাতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না, তাদের পূজার প্রসাদ খেতে পারবে না এবং তাদের পূজার জন্য কোন প্রকার অনুদান বা চাঁদা দিতে পারবে না। তবে তাদের পূজা তারা তাদের মতো করবে তাতে কোন প্রকার বাধাও দেয়া যাবে না। আর সরকার থেকে নিয়োগ প্রাপ্ত নিরাপত্তা প্রহরী বা পুলিশ যদি পুজার অনুষ্ঠান পাহারার কাজে নিযুক্ত থাকেন এবং যদি পুলিশ মুসলিমও হন, তাও তার দায়িত্ব থাকবে যেনো উক্ত পুজার অনুষ্ঠানে কেউ নিরাপত্তা বিঘ্নিত না করতে পারে।

প্রশ্ন ঃ পহেলা এপ্রিলে কি আমরা 'এপ্রিল ফুল' পালন করতে পারি?

উত্তর ঃ আমরা ইতিহাস না জানার কারণে এপ্রিল মাসের ১ তারিখে 'এপ্রিল ফুল' পালন করে থাকি, এখানে "ফুল" ইংরেজী শব্দ এর অর্থ বোকা। এই দিনে স্কুল-কলেজে ছেলেমেয়েরা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা একজন অপরজনকে নানা উপায়ে ধোকা দিয়ে বোকা বানিয়ে ফান করে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে এই কাজটি ঠিক না এবং এই দিনটিও পালন করা ঠিক না। এপ্রিল মাসের ১ তারিখ বা 'এপ্রিল ফুল' খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের কাছে অতি আনন্দের। ঠিক এর বিপরীত পিঠে মুসলিম জাতির জন্য এটি শোক ও বেদনার। ১৪৯২ সালের এই দিনে খ্রিষ্টান বাহিনী নজিরবিহীন প্রতারণার মাধ্যমে সাত লক্ষাধিক মানুষকে স্পেনের গ্রানাডা শহরের বিভিন্ন মসজিদে অবরুদ্ধ করে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে, যা বিশ্ব মানবতার ইতিহাসে এক হৃদয় বিদারক ও কলঙ্কজনক অধ্যায়। এই বিষয়ে খুব বেশী সিরিয়াস হওয়ার কিছু নেই এবং আমরা যেন এই বিষয় নিয়ে কোন তর্কে জড়িয়ে না যাই। আমাদের উচিত এর সঠিক ইতিহাস জেনে রাখা, এবং এই নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা।

প্রশ্ন ঃ কেউ যদি আমাকে বলে "মেরী খৃষ্টমাস", উত্তরে আমি কী বলব?

উত্তর ঃ আমি উত্তরে অবশ্যই "মেরী খৃষ্টমাস" বা "সেইম টু ইউ" বলতে পারবো না। কারণ আমি যদি এটা বলি তাহলে আমিও তার সাথে একমত প্রকাশ করছি এবং তাদের সাথে সাথে আমিও শিরক করে ফেলছি। আমি হয়তো সৌজন্যতামূলক উত্তরে "হ্যাপি হলি ডে" বা season greetings বা thank you বলতে পারি।

প্রশ্ন ঃ কেউ যদি আমাকে পূজায় অথবা খৃষ্টমাসের গিফ্‌ট দিয়ে থাকে তাহলে কি আমি তা গ্রহণ করতে পারি?

উত্তর ঃ পূজায় বা খৃষ্টমাসের কোন প্রকার গিফ্‌ট অবশ্যই নেয়া যাবে না সেটা চকলেট হোক বা বাচ্চাদের খেলনা হোক বা ক্যাশ টাকা হোক। আমি যদি নিজের জন্য এটা গ্রহণ করে থাকি তাহলে এখানেও আমি আল্লাহর সাথে শিরক করে ফেলছি। তবে অবশ্যই ভদ্রতা বজায় রেখে আমাকে একটা সুন্দর উপায় বের করে নিতে হবে যে আমি কিভাবে এই গিফ্‌ট avoid করতে পারি।

প্রশ্ন ঃ আমরা কি আমাদের অমুসলিম প্রতিবেশী, কলিগ বা বন্ধুদের ঈদে দাওয়াত করে খাওয়াতে পারি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আমরা আমাদের অমুসলিম প্রতিবেশী, কলিগ বা বন্ধুদের ঈদে দাওয়াত দিতে পারি এবং খাওয়াতে পারি। ইসলামের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা নেই, বরং এই ঈদের দাওয়াতের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামেরও দাওয়াত দিতে পারি।

প্রশ্ন ঃ আমরা কি আমাদের অমুসলিম প্রতিবেশী, কলিগ বা বন্ধুদের কুরবানী ঈদে কুরবানীর মাংস দিতে পারি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, আমরা আমাদের অমুসলিম প্রতিবেশী, কলিগ বা বন্ধুদের কুরবানী ঈদে দাওয়াত দিতে পারি এবং কুরবানীর মাংস গিফ্‌ট হিসেবে দিতে পারি এতে ইসলামের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা নেই। এমনকি তাদের মন জয় করার জন্য যাকাতের টাকাও দেয়া যাবে।

পরামর্শ ঃ বিভিন্ন অকেশানে আমরা এবং আমাদের সন্তানেরা অমুসলিম বন্ধু-বান্ধব, কলিগ ও প্রতিবেশীদেরকে গিফ্‌ট দিতে পারি। যেমন ঃ কুরআনের অনুবাদ, ইসলামিক ডিভিডি এবং আরো কিছু ইসলামী বই দিয়ে সুন্দর করে র‍্যাপিং করে প্রেজেন্ট করতে পারি। এটা আমাদের রিলিজিয়াস রাইটস। একজন হিন্দুও একটি গীতা বা রামায়ন গিফট্ দিয়ে আমাকে তাদের ধর্মের দাওয়াত দিতে পারে, এটা তার রাইটস্, এতে দোষের কিছু নেই।

আমাদের সন্তানদের জন্য গাইডলাইন

প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, বেহায়াপনা ও অশ্লীল আচরণের নিকটও যাবে না। (সূরা আন'আম ঃ ১৫১)

চ্যাপটার ৯

সন্তানদের একাডেমিক ইসলামী শিক্ষা

অনেকেরই ধারণা যে, বাসায় একজন হুজুর রেখে দিলে বা সন্তানকে বিকেলে বা সকালে হুজুরের কাছে কায়দা বা কুরআন পড়তে পাঠালেই সব হয়ে গেল, সে ইসলাম শিখে ফেলবে এবং পাক্কা মুসুল্লি হয়ে যাবে। এ ধারণা ভুল। সাধারণত ওখানে কুরআন তিলাওয়াত অর্থাৎ শুদ্ধ করে কুরআন রিডিং পড়তে শিখানো হয় মাত্র। ইসলামিক স্টাডিজ পড়ানো হয় না। তবে কোন কোন জায়গায় কুরআন তিলাওয়াতের পাশাপাশি কিছু মাসলা-মাসায়েল, দু'আ হয়তো শেখানো হয়।

তাই আমাদের সন্তানদেরকে প্রকৃত মুসলিম বানানোর জন্য তার সাধারণ এডুকেশনের পাশাপাশি real life oriented "Islamic Science & Islamic Studies" পড়াতে হবে, যেখানে তার জীবন পরিচালনার জন্য থাকবে সমস্ত শিক্ষা। সন্তানদেরক প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে আমাদের নিজেদেরই নিজ ঘরে উদ্দ্যোগ নিতে হবে। আমাদের প্রকাশিত ছোটদের ইসলামিক এডুকেশন সিরিজ ১২টি বই সংগ্রহ করে রুটিন করে গুরুত্বসহকারে সন্তানদেরকে পড়াতে পারেন। এই সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত থাকছে ঃ

বিষয়ভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা

১. সম্পূর্ণ কুরআনের অর্থ
২. সিলেক্টেড সূরার তাফসীর
৩. সংকলিত হাদীস

৪. হাদীস সংকলনের ইতিহাস
৫. ঈমান ও আকীদা
৬. তাওহীদ ও শিরক
৭. সুন্নাত ও বিদ'আত
৮. রসূল ﷺ -এর নামায (সলাত) শিক্ষা
৯. রসূল ﷺ -এর জীবনী
১০. সাহাবীদের জীবনী
১১. অন্যান্য নাবীদের জীবনী
১২. ইসলামের দাওয়াত
১৩. ইকামাতুদ দ্বীন (দ্বীন প্রতিষ্ঠা)
১৪. ইসলামের ইতিহাস
১৫. পারিবারিক জীবন
১৬. সন্তান প্রতিপালন
১৭. সিয়াম ও যাকাত
১৮. ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং

সন্তানদের নিয়ে স্কলারদের ভিডিও উপভোগ

আমাদের বড় সন্তানেরা অনেক সময় নানা রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। যেমন ঃ Concept of God, Can Islam offer more to mankind than just a religion? Terrorism/Jihad and Islam, Islam and secularism, Peace vision of Islam, Women's rights in Islam, Muslims character, Marriage in Islam, Muslim divorce, Polygamy and the wives of the Prophet (pbuh), why Hijab? ইত্যাদি।

প্রশ্নগুলোর authentic এবং logical উত্তর পাওয়ার জন্য নিম্নের স্কলারদের ডিভিডি দেখতে পারি। যা এ যুগের সন্তানদের জন্য খুবই উপযোগী। এছাড়া ইন্টারনেটে সার্চ দিলে এই সকল স্কলারদের ওয়েবসাইট পাওয়া যাবে।

- Numan Ali Khan, USA
- Dr. Yusuf Estes
- Dr. Bilal Philips
- Dr. Abdullah Hakim Quick
- Sheikh Ahmed Deedat
- Dr. Jamal Badawi
- Dr. Yousuf Islam
- Abdur Rahim Green
- Dr. Tawfiq Chowdhury
- Shabir Ally

ইংলিশ ভার্সনের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য গাইড

1. Tawheed (Islamic Aqidah OR Islamic Creed)
2. Basic principles of Islam
3. How to pray Salah (Prayer of Muhammad PBUH)
4. Learn basic Dua for our daily life
5. Personal hygiene in Islam
6. What should be the character of a Muslim
7. Biography of Prophet Muhammad (PBUH)
8. Biography of other 25 Prophets in the Quran
9. Who is Jesus? & Background of Christmas?
10. Biography of Sahaba (Companions of Prophet PBUH)
11. Islam in the West: and challenges
12. Islamic history & world history
13. Duty of children towards parents
14. Objective of Ramadan and what is Taqwa?
15. Hajj and its teaching?
16. Importance of Sadaqa and Zakat
17. Islamic Banking & Economics
18. Islam & Sex
19. Gay – Lesbian & same sex marriage in Islam
20. What is Sunnah? And practice of Sunnah
21. What is lawful and unlawful in Islam (Halal – Haram)
22. What is our real culture (Islamic way of life)
23. Terrorism & Jihad in Islam (Real conception of Jihad)
24. Who is a Fundamentalist?
25. Islam and Science
26. Miracles of the Quran: Modern scientific discoveries
27. Human Rights in Islam
28. Women in Islam and clear conception on Hijab
29. Why Islam & who are Muslim?
30. Gender equity in Islam
31. Music vision of Islam
32. Clear conception of Shirk and Bidah
33. Collective life & brotherhood
34. Importance of Dawah & Dawah in the West
35. Fiqh & Islamic Law (Jurisprudence)

36. Life after death: Road map of Akhirah
37. Memorization of selected Suras
38. Tafseer of Sahih Hadith
39. Translation and Tafseer of The Quran

আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের কাছে আছে মদীনা ইউনিভার্সিটির course curriculum এবং Islamic Education Series Grade 1 to 10 এর পরিপূর্ণ সেটের বই। যা অভিভাবকগণ অনায়াসে সন্তানদের জন্য সংগ্রহ করতে পারেন। এবং সেই অনুযায়ী তাদেরকে ঘরে বসেই ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারেন। তাই উপরের বিষয়গুলোর উপর বই এবং ডিভিডি সংগ্রহ করি এবং জেনারেল এডুকেশনের পাশাপাশি সন্তানদের নিয়মিত ইসলামের উপর রুটিন করে প্রতিদিন জ্ঞান অর্জন করতে সাহায্য করি। মনে রাখতে হবে, ইবলিস (শয়তান) কিন্তু এটা চাইবে না, বাধা দেবে; তাই জোর করে হলেও এগিয়ে যেতে হবে।

আমার সন্তানের ডেইলি রুটিন (Sample)

Day	06:00 – 8:00 am	08:00 – 4:00 pm	05:00 – 7:00 pm	07:00 – 10:00 pm	10 – 11:00 pm
Sunday to Thursday	Fajr salat Quran recitation with meaning & Tafseer study	School/ University Zuhar & Asr salat	Game Magrib salat Hadith study (10 hadith every day)	School study & Homework Dinner Isha salat	To watch Islamic TV/DVD with parents
Friday	Fajr salat Quran recitation with meaning & Tafseer study (And group discussion with parents)	To study Islamic literature (from syllabus) Zuhar & Asr salat	Game Magrib salat Hadith study (10 hadith every day)	School study & Homework Dinner Isha salat	To watch Islamic TV/DVD with parents
Saturday	Fajr salat Quran recitation with meaning & Tafseer study (And group discussion with parents)	To study Islamic literature (from syllabus) Zuhar & Asr salat	Game Magrib salat Hadith study (10 hadith every day)	School study & Homework Dinner Isha salat	To watch Islamic TV/DVD with parents

নমুনা স্বরূপ আমাদের সন্তানদের জন্য উপরে একটি ডেইলি রুটিন দেয়া হলো। প্যারেন্টস্‌রা তাদের মতো করে কাষ্টোমাইজ করে নিবেন। সময়ের পরিবর্তনের

কারণে শীতকালে রুটিন হবে একরকম এবং গরমকালে হবে অন্যরকম। আবার সামার ভেকেশনে বা রমাদানে হবে আরেক রকম।

মা-বাবাদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ

আমি আমার সন্তানদের ইসলামী শিক্ষা শুধুমাত্র "কুরআন তিলাওয়াতের" মধ্যে সীমাবদ্ধ যেন না রাখি। তাদেরকে সম্পূর্ণ কুরআনটার অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝতে দেই। কুরআনের বাস্তব এপ্লিকেশনস অনুধাবন করতে দেই এবং সেই অনুযায়ী জীবনকে পরিচালনা করার সুযোগ করে দেই।

সন্তানদের সকাল-সন্ধ্যার দু'আ শিক্ষা দেয়া

আমাদের প্রিয় নাবী ﷺ দৈনিন্দিন জীবনে কিছু দু'আ পাঠ করতেন। যদি কুরআন ও হাদীসের আমলকারী আল্লাহর কোন বান্দা সে সমস্ত দু'আ পাঠ করেন তাহলে তিনিও আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ লাভে ধন্য হতে পারবেন। আমাদের সন্তানদের জন্য এই সকল দু'আ আরবী, অর্থ এবং উচ্চারণসহ আমাদের ছোটদের জন্য প্রকাশিত দু'আর বইতে পাওয়া যাবে। এই দু'আগুলো মুখস্থ করানোর বিষয়েও মা-বাবাকে সিরিয়াস হতে হবে এবং প্রতিদিন অন্তত পক্ষে দু'টি বা একটি দু'আ অর্থসহ সন্তানদের মুখস্থ করাতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যে আমার সন্তান প্রতিদিন এই দু'আগুলো তার বাস্তব জীবনে ব্যবহার করছে কিনা। যেমন, খাওয়ার সময় বা টয়লেটে ঢুকার সময় যদি যে দু'আ না পড়ে তাহলে তাকে মনে করিয়ে দিতে হবে। এভাবে প্রথম প্রথম তাকে কিছু দিন দু'আগুলো আমল করার বিষয়ে তাগাদা দিতে হবে এবং এক সময় সে এগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। যেমন ঃ

- ঘুমানোর সময় দু'আ
- ঘুম থেকে উঠে দু'আ
- খাওয়া শুরুর ও শেষে দু'আ
- পায়খানার দু'আ
- ওযূ করার পর দু'আ
- সলাতের মধ্যে দু'আ
- পাঁচ ওয়াক্ত সলাত শেষে দু'আ
- বিপদ-আপদের দু'আ
- আযানের দু'আ
- বাড়ী থেকে বের হওয়ার দু'আ
- বাড়ীতে প্রবেশের দু'আ
- যানবাহনে চড়ার দু'আ
- মা-বাবার জন্য সন্তানের দু'আ
- স্মরণশক্তি বৃদ্ধির দু'আ
- মুখের জড়তা দূর করার দু'আ
- সকাল-সন্ধ্যার দু'আ

সন্তানদের পড়ালেখায় ভাল করার বিষয়ে বাবা-মায়ের সহায়তা

সন্তানের জন্য দু'আ করা ঃ সন্তানের জন্য সব সময় দু'আ করতে হবে। অনেক বাবা-মায়েরাই সন্তানের জন্য নিমমিত দু'আ করেন না। সন্তান যেন সব বিষয়েই ভাল করে সেজন্য প্রতি ওয়াক্তের সলাতের শেষে দু'আ করা উচিত।

ভাল স্কুল/কলেজ নির্বাচন ঃ এই বিষয়টি আমাদের দেশে বলার অপেক্ষা রাখে না। সকল বাবা-মায়েরাই চান তার সন্তান একটি ভাল স্কুলে বা কলেজে পড়বে। তবে যে সকল স্কুল বা কলেজ কর্তৃপক্ষ সেকুলার বা ইসলাম বিদ্বেষী সেই সকল প্রতিষ্ঠান যতো ভালই হোক না কেন সেগুলোতে সন্তানদেরকে ভর্তি না করালেই ভাল। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাবও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পরে।

পড়ালেখায় মনোযোগ নষ্ট করতে পারে তা থেকে সতর্কতা ঃ ঘরে যদি এমন কিছু থাকে যার কারণে সন্তানদের পড়ালেখায় ক্ষতি হতে পারে তা সরিয়ে নেয়া উচিত। অনেক সময় টেলিভিশন সন্তানদের পড়ালেখার প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। বাসার বড়রা কেউ হয়তো ড্রইংরুমে বসে টিভিতে নাটক দেখছে তখন ছেলেমেয়েদের পড়ায় মন বসে না, তাদেরও নাটক দেখতে ইচ্ছে করে, তদের মন পড়ে থাকে টিভির মধ্যে।

পারিবারিক রুটিন থাকা উচিত ঃ আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা সাধারণত প্রতিদিন সন্ধ্যার পর পড়তে বসে। কিন্তু সেই সময় যদি প্রায়ই বাসায় মেহমান আসে বা বাবা-মায়ের বন্ধু-বান্ধব আসে তাহলেও ছেলেমেয়েদের পড়ালেখায় ক্ষতি হয়। পারিবারিক রুটিন এমন হওয়া উচিত যেন তারা পড়তে বসে বাধার সম্মুখিন না হয়। পরিচিতরাও যেন পারিবারিক রুটিন সম্পের্কে অবগত থাকে।

ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে সম্পর্ক গড়ে দেয়া ঃ আমি যেনো আমার সন্তানদের ভালভাল ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেই, পরিচয় করিয়ে দেই, পরিবারিকভাবে তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে দেই। এতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাল করার উৎসাহ বাড়বে।

অর্থ খরচ করার মানসিকতা ঃ আর্থিক সমস্যা না থাকার পরও কোন কোন বাবা-মা সন্তানদের প্রয়োজনীয় খাতা, বই, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি স্টেশনারী কিনে দিতে চান না। গাফিলতি করে সন্তানদের স্কুল-কলেজের বেতন দেরী

করে দেন, প্রাইভেট শিক্ষক বা কোচিংয়ের বেতন ঠিক মতো দিতে চান না। এই ধরনের মনমানসিকতাও পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

স্পেশাল কেয়ার (তত্ত্বাবধান) ঃ যে সন্তানটি কম মেধা সম্পন্ন বা একটু দেরীতে বুঝে বা একটু কম বুঝে, তাদের পিছনে অতিরিক্ত সময় দেয়া উচিত। তাকে অবহেলা করা ঠিক না বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা একেবারেই ঠিক না। তাকে প্রচুর পরিমানে উৎসাহ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের প্রকাশিত ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজের ৮ নং বইটি সংগ্রহ করে পড়ার অনুরোধ রইল।

স্বাস্থ্যগত সমস্যায় করণীয় ঃ কোন কোন ছেলেমেয়েরা স্বাস্থ্যগতভাবে দুর্বল, প্রায়ই অসুস্থ থাকে। তাদের দিকেও স্পেশাল কেয়ার নিতে হবে। তার স্বাস্থ্যগত দুর্বলতার কারণে তার সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। তাকে ডাক্তার দেখিয়ে পুরোপুরি সুস্থ করে তুলতে হবে।

স্টাডি টুরের ব্যবস্থা করা ঃ অনেক স্কুল-কলেজে স্টাডি টুরের ব্যবস্থা থাকে। সন্তানদের স্টাডি টুরে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেয়া যেতে পারে। স্টাডি টুরের মাধ্যমে মেধার বিকাশ ঘটে। তবে একটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যে স্টাডি টুরে গিয়ে ছেলেমেয়েরা অবাধ মেলামেশায় সুযোগ না পায়।

স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা ঃ ছাত্র-ছাত্রীরা স্কলারশিপ পেলে পড়ালেখায় আরো উৎসাহ পায়। তাই তাদের স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য উৎসাহ দেয়া উচিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্কলারশিপ ছাড়াও আরো অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশিপ দিয়ে থাকে, খোঁজ-খবর নিয়ে সেগুলোর ব্যবস্থা করে দেয়া যেতে পারে।

অতিরিক্ত বোঝা না চাপানো ঃ বিশেষ করে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদেরকে পড়ালেখার পাশাপাশি পরিবারের আরো অনেক কাজ করতে হয়। যেমন ঘরের কাজ, বাজার করা, বিল দেয়া, বাবার ব্যবসা দেখা ইত্যাদি। এই কাজগুলো করা ভাল তবে খেয়াল রাখতে হবে যে এই কাজগুলোর যেন একটা সীমা থাকে। তাদের ঘারে অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয়া যাবে না এতে পড়ালেখার ক্ষতি হতে পারে।

পরীক্ষায় খারাপ করলে করণীয় ঃ সন্তান পরীক্ষায় খারাপ করলে তার জন্য চেচামেচি করে বাসা মাথায় করা যাবে না। তার সাথে দূর্ব্যবহার করা যাবে না। তার সাথে সময় নিয়ে বসতে হবে, বুঝতে হবে কেন সে পরীক্ষায় খারাপ করেছে, তার প্রকৃত কারণগুলো খুঁজে বের করে তার সমাধানের দিকে যেতে হবে। তাকে আরো উৎসাহ দিয়ে তার পেছনে বাবা-মাকে আরো অতিরিক্ত সময় দিয়ে তার দুর্বলতাগুলো দূর করতে হবে।

পরিমিত ঘুম প্রয়োজন ঃ অনেক ছেলেমেয়েরাই রাতে দেরীতে ঘুমোতে যায়, এটি মোটেও ঠিক না। সেদিকে বাবা-মাকে খেয়াল রাখতে হবে। ছেলেমেয়েরা যেন বেশী রাত না করে। ঘুম পরিমিত না হলে সকালে উঠতে কষ্ট হয়, ফজর সলাত মিস হতে পারে এছাড়া সারা দিন ক্লাসেও মন বসবে না।

সন্তানের পড়ার স্থান কেমন হবে ঃ পড়ার স্থানে যেন পর্যাপ্ত পরিমাণ আলো-বাতাস থাকে, জানালা থাকলে খুবই ভাল। পড়ার জন্য রিডিং টেবিল এবং হাইট অনুযায়ী চেয়ারও প্রয়োজন। এতে তার পড়ালেখায় মনোযোগ আসবে। অনেক মা-বাবা আছেন বৈদ্যুতিক বিল কমাবার জন্য বাসায় সব সময় স্বল্প আলোর ব্যবস্থা করে থাকেন। পরামর্শ থাকবে যে, যদি সামর্থ থাকে অন্তত সন্তানদের পড়ালেখার সময় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা।

দারিদ্রতা দূর করা ঃ দারিদ্রতার কারণে অনেক ছেলেমেয়েরা ঠিক মতো পড়ালেখায় মন বসাতে পারে না। সন্তানের ভবিষ্যত চিন্তা করে দারিদ্রতামুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে। দারিদ্রতা থেকে মুক্তির জন্য সবসময় মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করতে হবে।

পারিবারিক দাওয়াত ঃ পারিবারিক দাওয়াত প্রায় সকল পরিবারেই রয়েছে, বিশেষ করে সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে। অতিরিক্ত পারিবারিক দাওয়াত ছেলেমেয়েদের পড়ালেখায় ক্ষতি করে। তাই বলে কোনো দাওয়াতেই না যাওয়া উচিতও নয়। এমনিতেই আজকালকার সন্তানরা অনেকটা অসামাজিক হয়ে যাচ্ছে অনলাইন যোগাযোগে অভ্যস্ত হবার কারণে। এই দাওয়াত খাওয়া এবং দাওয়াত দেয়া দুটোই কন্ট্রোল করা উচিত। যখন তখন ছেলেমেয়েদেরকে বাসায় রেখে দাওয়াতে চলে যাওয়া ঠিক না আবার তাদেরকে হঠাৎ করে পড়া বাদ দিয়ে সাথে নিয়ে যাওয়াও ঠিক না। দাওয়াতের বিষয়ে সন্তানদের প্রতিদিনের ক্লাসের হোমওয়ার্ক এবং পরের দিনের ক্লাস ও সামনের পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে প্ল্যান করতে হবে।

সন্তানদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে খারাপ ব্যবহার না করা ঃ কোন কোন বাবা-মা সন্তানদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে খারাপ আচরণ করেন। এই কাজটি মোটেও ঠিক না। এটি সন্তানের মনে আঘাত হানে। সন্তানের কোন বন্ধু যদি ভাল না হয় তাহলে তার সাথে খারাপ আচরণ না করে নিজ সন্তানকে তার বন্ধুর খারাপ দিকগুলো বুঝাতে হবে এবং সে যেন আস্তে আস্তে এই বন্ধু থেকে সরে আসে।

সন্তানদের ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টে সাহায্য করা

মেধা বিকাশে সাহায্য করা ঃ ছেলেমেয়েদের মেধা বিকাশে সর্বপ্রথমে বাবা-মাকে এগিয়ে আসতে হবে। অতঃপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। অনেক ছেলেমেয়েদেরই ভাল মেধা আছে কিন্তু সঠিক সহযোগীতা এবং গাইডেন্সের অভাবে তারা তাদের মেধা বিকাশের সুযোগ পায় না। এ বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপ্স পাওয়ার জন্য আমাদের প্রকাশিত ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজের ৮ নং বইটি পড়ার পরামর্শ রইল।

ক্যারিয়ার পছন্দে সহায়তা করা ঃ অনেক ছেলেমেয়েরা নিজেরাই নিজেদের ক্যারিয়ার কী হবে তা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। অবশ্যই তারা তাদের ভবিষ্যতের ক্যরিয়ারের সিদ্ধান্ত নিবে কিন্তু বাবা-মাকেও এই বিষয়ে সাহায্য করতে হবে। ছেলেমেয়েদের ক্যারিয়ার নিয়ে যেন একমুখি চিন্তা না হয় যে তারা শুধু অনেক বড় হবে অনেক টাকা কামাবে বা অনেক নামকরা একজন হবে ইত্যাদি!

সময়কে কাজে লাগানো ঃ সন্তানদের ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা অনেক আগে থেকেই শুরু করা উচিত, যাতে তারা সময়কে সঠিক কাজে লাগাতে হবে। ভাল ক্যারিয়ারের জন্য অনেক সময় ব্যয় করতে হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে সফলতা অর্জনের বাস্তবভিত্তিক গাইডলাইন হিসেবে আমাদের প্রকাশিত "ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনে কীভাবে উন্নতি করবে" এই বইটি সহায়তা করবে। এই বইটি সংগ্রহ করে ছেলেমেয়েদেরকে দেয়ার অনুরোধ রইলো।

উৎসাহ প্রদান ও মোটিভেশন ঃ উৎসাহ মানুষকে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। ছেলেমেয়েদেরকে সব সময় ভাল কাজের উৎসাহ প্রদান করতে হবে, কোন একটি বিষয়ে খারাপ করলেও তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করে তাকে উৎসাহ দিলে সে পরবর্তীতে অনেক ভাল করে। মোটিভেশন হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট থিউরী। কোন একটি অর্গানাইজেশনের উদ্বর্তন কর্মকর্তাগণ তাদের কর্মচারী-

দেরকে দিয়ে আরো ভাল প্রডাকশন পাওয়ার জন্য সব সময় মোটিভেশন দিয়ে থাকেন। ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টে মোটিভেশন একটি সফল ঔষধ। মোটিভেশন হতে পারে কথা দিয়ে, পুরস্কৃত করে, কিছু আয়োজন করে।

সঠিক কোর্স পছন্দ করার বিষয়ে সাহায্য করা ঃ ইউনিভার্সিটি লেভেলে ছেলেমেয়েদের সঠিক কোর্স নির্ধারণে বাবা-মাকে এগিয়ে আসা উচিত। সঠিক কোর্স বাছাইয়ে ভুলের কারণে অনেক ছেলেমেয়েরাই জীবনে ভাল করতে পারে না। তাই এই বিষয়টিতে খুবই গুরুত্ব দেয়া উচিত।

সফল ব্যক্তিদের সাথে দেখা করা ঃ যে সকল ব্যক্তিরা জীবনে সফলতা অর্জন করেছেন তাদের সাথে ছেলেমেয়েদেরকে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেয়া যেতে পারে। এতে ছেলেমেয়েরা তাদের জীবনেও অনেক উৎসাহ পাবে।

রাজনীতি থেকে দূরে রাখা ঃ ছেলেমেয়েদেরকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে তারা যেন কোন রাজনীতির সাথে জড়িয়ে না যায়। হ্যাঁ তারা রাজনীতি বুঝবে, এই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করবে, কোন দলকে সাপোর্ট করবে, কিন্তু মাঠে ময়দানে যেন কোন রাজনৈতিক দলের কর্মকান্ডে সংযুক্ত না হয়। যখন তারা পড়ালেখা শেষ করে প্রফেশনাল লাইফে যাবে তখন চাইলে দেশ গড়ার জন্য সুস্থ রাজনীতি করতে পারে।

আমার সন্তানের ট্রেনিং

সে দিন [কিয়ামতে] মানুষ নিজের ভাই, নিজের মা ও বাবা এবং স্ত্রী ও সন্তানাদি হতে পালাবে। (সূরা আবাসা ঃ ৩৩-৩৭)

চ্যাপটার ১০

কিছু প্রশ্ন

১. আমার মৃত্যুর পর আমার সন্তান কি আমাকে গোসল দিতে পারবে?
২. আমার মৃত্যুর পর আমার ছেলে কি আমার জানাযা পড়াতে পারবে?
৩. আমার মৃত্যুর পর আমার সন্তান কি সঠিক উপায়ে কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক আমার জন্য দু'আ করতে পারবে?

আমাদের দেশে আমরা হয়তো কখনোই এই বিষয়গুলো গভীরভাবে চিন্তা করে দেখিনি। মা-বাবার জন্য এই তিনটি কাজ মূলতঃ সন্তানের জন্য বেশী প্রযোজ্য। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দেশে এই কাজের জন্য লোক ভাড়া পাওয়া যায় এবং সকলেই এই কাজগুলো টাকার বিনিময়ে মাদ্রাসার হুজুরদের দিয়ে করিয়ে থাকে। আমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছি যে একজন মায়ের মৃত্যুর পর তার গোসল দিচ্ছে তার নিজের ইউনিভার্সিটি পাস করা এম.বি.এ মেয়ে! কয়টা ইঞ্জিনিয়ার ছেলে তার নিজ মা-বাবার জানাযা পড়িয়ে থাকে? কয়টা ডাক্তার ছেলে তার নিজ মা-বাবার জানাযা পড়িয়ে থাকে?

যে ছেলে এতো কঠিন পড়াশোনা করে একজন বড় ডাক্তার হতে পারে একজন ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে সে কেন নিজ বাবার জানাযা পড়াতে পারবে না? অথচ আমরা নিজ মা-বাবার জানাযা পড়ানোর জন্য নির্ভর করি মসজিদের হুজুরদের উপর! মা-বাবার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করার জন্য ভাড়া করে মাওলানা নিয়ে আসি! ইসলামে জানাযার সলাতটা হচ্ছে মৃতব্যক্তির জন্য দু'আ। রসূল ﷺ গ্যারান্টি দিয়েছেন যে মা-বাবার জন্য সন্তানের দু'আ কবুল হয় আর সেই কাজগুলো আমরা করাচ্ছি অন্যকে দিয়ে।

আমার সন্তানের সলাতের ট্রেনিং

আমি কি জানি ১০ বছর বয়স থেকে আমার সন্তানের উপর সলাত ফরয? রসূল ﷺ বলেছেন ঃ "সাত বছর বয়স হলে তোমাদের সন্তানদের সলাত আদায়ের নির্দেশ দাও এবং দশ বছর বয়স হওয়ার পর এজন্য তাদের প্রতি কঠোর হও এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।" (আবু দাউদ)

অনেক মা-বাবারাই সন্তানের পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায়ের বিষয়ে গুরুত্ব দেন না। কোন কোন মা-বাবা হয়তো সন্তানদের মাঝে মাঝে তাগাদা দেন যে 'এই নামায পড়ো' কিন্তু এই পর্যন্তই শেষ, সে পড়লো কি পড়লো না সেই বিষয়ে তারা খুব একটা সিরিয়াস না। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে কেউ যদি এক ওয়াক্ত সলাত ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয় বা না পড়ে তাহলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, তাকে তাওবা করে আবার ইসলামে ঢুকতে হয়। একটি বাচ্চার বয়স যখন ১০ বছর হয় (বা বালেগ হয়) তখন থেকে তার উপর পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা ফরয। সন্তান যদি পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় না করে এবং এক ওয়াক্তও ছেড়ে দেয় তাহলে সে জন্য সন্তানের পাশাপাশি মা-বাবাকেও আখিরাতের ময়দানে অপরাধী হিসেবে ধরা হবে।

আমরা হয়তো সন্তানের কষ্ট হবে বলে তাকে ফজরে সলাতের জন্য উঠাই না, বা বারে বারে ওযূ করে সলাত আদায় করবে তার কষ্ট হবে মনে করে তাগাদা দেই না। কিন্তু আখিরাতের ময়দানে এই আদরের সন্তান মা-বাবাকে আল্লাহর সামনে দোষারূপ করবে। বলবে হে আল্লাহ, এরাই আমাকে সলাত আদায় করা শেখায় নাই, এরাই আমাকে সলাতের অভ্যাস করায় নাই, এরাই আমাকে সলাতের জন্য তাগাদা দেয় নাই, এদের জন্যই আমি বেনামাযী হয়েছি।

কোন কোন মা-বাবা মনে করেন, এখন বয়স কম, এখন এই বিষয়ে বেশী সিরিয়াস হওয়ার কিছু নেই, বড় হলে পড়বে। এই ধরনের ধারণা একেবারেই ভুল। পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা ফরয, সে যেখানেই থাকুক না কেন। আমার সন্তান স্কুলে বা কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে যোহর ও আসরের ওয়াক্তে সলাত আদায় করে কিনা সে ব্যপারেও খেয়াল রাখতে হবে এবং তারা যেন সময় মতো যোহর ও আসর সলাত আদায় করে সে জন্য তাদেরকে সুন্দর করে বোঝাতে হবে, মোটিভেশন দিতে হবে এবং প্রয়োজনে কঠোরও হতে হবে। কোনভাবেই এই বিষয়ে ছাড় দেয়া যাবে না। এই বিষয়ে সন্তানদের ছাড় দেয়া

মানে তাদের জীবনে মারাত্মক ক্ষতি করা, তাদের জন্য অমঙ্গল ডেকে আনা, তাদের আখিরাত নষ্ট করা।

আমরা স্বামী-স্ত্রী যদি পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায়ে নিয়মিত না হই তাহলে আজ থেকে আমাদের দু'জনকেই নিয়মিত হতে হবে। যদি মা-বাবাকে সন্তান পাঁচ ওয়াক্ত সলাত নিয়মিত আদায় করতে না দেখে তাহলে তারাও কখনো সলাত আদায়ে উৎসাহী হবে না। স্বামী/স্ত্রী পরামর্শ করবে কিভাবে সন্তানদের সলাতের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তী করা যায়। প্রথমে তাদের নরমভাবে বুঝাতে হবে। তাদের সাথে মোলায়েম ও ভাবগম্ভীরভাবে কথা বলতে হবে। সলাতের ব্যাপারে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। কাজ না হলে মৃদু ধমক দেয়া যেতে পারে।

শুদ্ধভাবে সলাত শিক্ষা দেয়া ঃ সলাতের সম্পর্কে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খেয়াল রাখতে হবে আর তা হচ্ছে সন্তানদের সহীহ শুদ্ধভাবে সলাত শেখানো। বাজারে সলাতের প্রচুর বই পাওয়া যায় যা নামায শিক্ষা নামে প্রচলিত কিন্তু তাদের বেশীরভাগই সহীহ নয় অর্থাৎ আল্লাহর রসূল ﷺ যেভাবে সলাত আদায় করেছেন তার উপর ভিত্তি করে নয় অর্থাৎ সহীহ হাদীস ভিত্তিক নয়। সন্তানদের শুরু থেকেই সহীহ দলিল অনুযায়ী সলাতের শিক্ষা দিলে পরবর্তীতে আর কোন সমস্যা হবে না। তাই শুদ্ধভাবে সহীহ হাদীস অনুযায়ী সলাত আদায়ের জন্য আমাদের প্রকাশিত ৭নং বইটি সংগ্রহ করার পরামর্শ রইল।

সন্তানদের নিকট জামাতে সলাত আদায়ের গুরুত্ব তুলে ধরা

জামাতে সলাতের উদ্দেশ্য কি? কেন আল্লাহ এর এতো গুরুত্ব দিয়েছেন তা সন্তানদের নিকট তুলে ধরতে হবে। মহান রব্বুল আলামীন কুরআনে যত জায়গায় সলাতের কথা বলেছেন ততো জায়গায় বলেছেন "আকিমুস্‌সলাত" অর্থাৎ সলাত একাকী আদায় করা নয় সলাত সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে বলেছেন। আর জামাতে সলাত আদায় করাই হচ্ছে সলাত প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ।

রসূল ﷺ বলেছেন ঃ লোকেরা যদি জানতো আযান দেয়া ও সলাতের প্রথম লাইনে দাঁড়ানোর মধ্যে কি পরিমাণ সওয়াব আছে তাহলে তারা লটারির মাধ্যম ছাড়া সেগুলো হাসিল করত না। আর যদি জানত সলাতে আগে আসার মধ্যে কি পরিমাণ সওয়াব আছে তাহলে তারা সে দিকেই অগ্রবর্তী হবার জন্য

প্রতিযোগিতা করত, আর যদি জানত 'ইশা ও ফজরের সলাতের মধ্যে কি পরিমাণ সওয়াব আছে তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসত। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

রসূল ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আযান শুনে ওযর ব্যতীত মসজিদে না গিয়ে একাকী সলাত আদায় করে তার এ সলাত অগ্রাহ্য করা হবে। লোকেরা বললো, ওযর কি? রসূল ﷺ বললেন, ওযর হল ভয় ও রোগ। (আবু দাউদ)

জুম্মার খুতবার একটি শিক্ষণীয় বিষয় শেয়ার করা যাক। আমাদের মেয়ে ক্লাশ ফাইভে পড়ে এবং সে যে স্কুলে পড়ে সেখানে বাধ্যতামূলক জামাতের সাথে যোহর, আসর এবং শুক্রবারে জুম্মার সলাত আদায় করতে হয়। তার ক্লাশ থেকে প্রতি সপ্তাহে জুম্মার খুতবার উপর একটি করে এসাইনমেন্ট থাকে যে সে ঐ খুতবাহ থেকে কি শিক্ষাগ্রহণ করলো তার উপর বিস্তারিত লিখে জমা দিতে হয়। উল্লেখ্য যে, এখানকার প্রতিটি মসজিদেই জুম্মার খুতবাহ আরবীতে না দিয়ে ইংরেজীতে দেয়া হয় যেন মুসল্লিগণ সব বুঝতে পারেন। ইসলামের সঠিক নিয়ম হচ্ছে জুম্মার খুতবা হতে হবে এলাকার বোধগম্য ভাষা অনুযায়ী।

এ বিষয়ে কিছু টিপ্স ঃ

সন্তান মসজিদে যেতে না চাইলে কী উপায়ে তাকে উৎসাহিত করা যেতে পারে? মা-বাবাদেরকে উপায় বের করতে হবে কিভাবে সন্তানদেরকে জামাতে নেয়া যেতে পারে। হতে পারে একেক সন্তানের জন্য একেক রকম উপায়।

মসজিদে বাচ্চা কাঁদলে কিভাবে সামলাতে হবে? বাচ্চা কাঁদলে তাকে আদর করতে হবে অথবা তাকে কোলে তুলে নিতে হবে। তার জন্য এমন খেলনা সংগে রাখা যেতে পারে যেটার শব্দ হয় না বা কার গায়ে ছুঁড়ে মারলে আঘাত লাগে না।

মসজিদে বাচ্চা নেবার কারণে কেউ বাচ্চাকে ধমক দিলে উক্ত বাবা কিভাবে বুদ্ধিমত্তার সাথে উত্তর দেবেন? যদি কেউ বাচ্চাকে ধমক দেন তার উপর রেগে গিয়ে কোন উত্তর দেয়া ঠিক হবে না। সলাতের পরে তাকে কুরআন হাদীসের আলোকে বুঝিয়ে বলা যেতে পারে। রসূল ﷺ তার নাতীদেরকে পিঠে নিয়ে মসজিদে নববীতে সলাত আদায় করেছেন।

ছোট বাচ্চা হলে ডাইপার পড়িয়ে নেবে কিনা? ছোট বাচ্চা হলে অবশ্যই ডাইপার পড়িয়ে নেবে।

পরিবারের সাথে সলাত আদায়

সলাত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যা দ্বীনের সাথে মানুষকে সম্পর্কযুক্ত রাখে। সলাত দ্বীনকে হিফাযতও করে। আবার দ্বীনের প্রতি আর্কষণও বাড়িয়ে থাকে। দ্বীনদার জীবন অতিবাহিত করার জন্য মানুষকে প্রস্তুতও করে। শুরু থেকেই শিশুদেরকে নিয়মিত সলাত আদায় করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। তার এ ব্যাপারে অহেতুক স্নেহ-প্রীতি এবং অতিরিক্ত নরম মনোভাব প্রদর্শন খুবই ক্ষতিকারক। বাবা বা মা যখনই সলাত আদায়ের জন্য দাঁড়াবেন তখন অবশ্যই বাচ্চাদেরকে সাথে নিয়ে দাঁড়াবেন। এতে বাচ্চা ছোটবেলা থেকেই সলাতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হলো ঃ

"নিজের পরিবার-পরিজনকে সলাতের তাকিদ (আদেশ) দাও এবং নিজেও তা দৃঢ়তার সাথে পালন করতে থাক।" (সূরা ত্বহা ঃ ১৩২)

'ইশার সলাত আদায় করা ব্যতিরেকে শিশুদেরকে শুতে যেন না দেই। শুয়ে পড়লেও উঠিয়ে সলাত আদায় করাই। ফজরের সলাতের জন্য প্রথম ওয়াক্তে তাদেরকে ঘুম থেকে জাগাই এবং সকালে উঠার অভ্যাস করাই। ছেলেমেয়েরা যদি অনেক রাতে ঘুমাতে যায় তাহলে তাদের ভোরে উঠতে খুব কষ্ট হয় এবং ফজর সলাত আদায় করাও কষ্টকর হয়, তাই তাদের সকাল সকাল ঘুমিয়ে পরার অভ্যাস করাতে হবে। যদি কখনো বাসায় সলাত আদায় করা হয় তখন পরিবারের প্রধান হিসেবে বাবা সলাতের ইমামতি করবেন। পেছনে স্ত্রী, সন্তান ও মা-বাবা (থাকলে) সকলেই সলাত আদায় করবেন।

সন্তানদের সিয়াম (রোযা) পালনের অভ্যাস করানো

অনেক মা-বাবারাই সন্তানের এই বিষয়টাতে গুরুত্ব দেন না। মনে রাখতে হবে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে সিয়াম বা রোযা চতুর্থতম। ইসলামের কোন ফরয হুকুম এবং ইবাদতের কোন মাফ নেই। যার উপর যেটা ফরয তাকে তা পালন করতেই হবে। অতি দুঃখের বিষয় অনেক মা-বাবারাই সন্তানদেরকে এই ফরয ইবাদত করতে বাধা দেন। তারা বলেন তোমার এখন সামনে পরীক্ষা এখন

রোযা রাখার প্রয়োজন নেই বা তুমি এখন ছোট, স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে, সারাদিন না খেয়ে থাকতে পারবে না ইত্যাদি নানা রকম অজুহাত। বাস্তবে দেখা গেছে যে মা-বাবার গাফিলতির কারণে অনেক ছেলেমেয়েরা বড় হয়েও সিয়াম পালন করতে পারে না।

একটি ছেলে বা মেয়ের উপর ১২-১৩ বছর বয়স থেকেই সিয়াম ফরয হয়ে যায়। তবে তাকে আরো ছোটবেলা থেকেই সিয়াম পালনের প্রাকটিস করাতে হবে তাহলে বালেগ হলে আর নিয়মিত ৩০টি সিয়াম পালন করতে কষ্ট হবে না। প্রথমদিকে ছেলেমেয়েদেরকে অর্ধ বেলা পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকার অভ্যাস করানো। পরবর্তী বছরে ১টি বা ২টি পূর্ণ সিয়াম পালনে উৎসাহিত করা। এভাবে প্রতিবছর একটু একটু করে সিয়ামের দিনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। সেই সাথে তাদেরকে রমাদান মাস ও সিয়ামের গুরুত্ব এবং তার শিক্ষাগুলো এক এক করে ব্রেইনে ঢুকিয়ে দিতে হবে যেন তারা বুঝে সিয়াম পালন করতে উৎসাহিত হয়, মা-বাবার ভয়ে নয়।

মেয়েকে পর্দা/হিযাব করার অভ্যাস করানো

ইসলামে নামায-রোযা (সলাত-সিয়াম) যেমন ফরয তেমনি মেয়েদের পর্দা করাও ফরয। আল কুরআনে যতোগুলো ফরয হুকুম আছে তার মধ্যে পর্দাও একটি। সূরা আহযাব এবং সূরা নূরে তা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি মুসলিম মা-বাবাকেই মেয়ের পর্দার বিষয়ে সিরিয়াস হতে হবে। মেয়ে যদি বালেগ হওয়ার পর থেকে পর্দা না করে তাহলে আখিরাতে ময়দানে এজন্য সর্বপ্রথমে মা-বাবাকেই ধরা হবে তারপর মেয়েকে, তখন নিজ মেয়েও এই জন্য মা-বাবাকে দোষারোপ করবে।

একটি মেয়ের ১২-১৩ বছর বয়স থেকেই পর্দা ফরয হয়ে যায়। আবার কোন কোন মেয়ের ৯-১০ বছর থেকেই পর্দা ফরয হয়ে যায়। তাই যে সকল মেয়েদের শারীরিক বৃদ্ধি তাড়াতাড়ি হয় তাদের এই বিষয়ে আগে থেকেই সতর্ক থাকতে হবে। পর্দা হচ্ছে একটি মেয়ের নিরাপত্তা, কোনভাবেই যেন মেয়ের রুপ-সৌন্দর্য এবং শারীরিক গঠন প্রণালী অন্যের নিকট প্রকাশ না পায়। তাই অবহেলা না করে খুব ছোট বয়স থেকেই মেয়ের পর্দার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত এতে বড় হলে আর পর্দা করতে কোন অসুবিধা হবে না।

এ বিষয়ে সর্বপ্রথম মাকে এগিয়ে আসতে হবে। সন্তানের মায়ের অবশ্যই তার নিজের পর্দার ব্যাপারে কোন প্রকার শিথিলতা করা চলবে না। সন্তান যদি দেখে মা নিজেই ঠিকমত পর্দা করেন না তাহলে ছোট বয়স থেকেই সন্তানের মনের মধ্যে ঢুকে যাবে যে এটা ততোটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। কারণ প্রতিটি সন্তান বাবা-মাকে অনুসরণ করে থাকে।

ফরয ইবাদতের গুরুত্ব

আল্লাহর ফরয ইবাদতের বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে আরো ভালোভাবে অনুধাবন করা যাক। আমরা সবাই আমাদের সন্তানদের খুব ভালোবাসি, নিজের জীবনের চেয়ে অধিক ভালোবাসি। যেমন আমার সন্তানের একদিন খুব জ্বর হলো এবং ডাক্তার ঔষধ দিয়েছে জ্বর সারানোর জন্য। কিন্তু সে ঔষধ খেতে চাচ্ছে না তিতা বলে। তিতা ঔষুধ খেতে তার কষ্ট হয়। এখন আমি যদি তার প্রতি ভালোবাসা দেখিয়ে তার কষ্টের কথা মনে করে তাকে ঔষধ খেতে না দেই তাহলে কী হবে? আবার যেমন জ্বর খুব বেশী হওয়ার কারণে শরীরের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে। এখন তার তাপমাত্রা কমানোর জন্য ঠান্ডা পানি দিয়ে তার শরীর মুছে দেয়া প্রয়োজন কিন্তু আমার সন্তান এই কাজটিও পছন্দ করছে না, কারণ শরীর মুছার সময়ও তার কষ্ট হয়। এবার আমি যদি তার কষ্টের কথা চিন্তা করে তার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করে তার শরীর মুছে না দেই তাহলে কী হবে? ঔষধ না খাওয়ার কারণে এবং অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে হয়তো তার জীবনে বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে এমনকি মারাও যেতে পারে।

ঠিক উপরের উদাহরণের মতো সন্তানের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করে ভোরে উঠতে কষ্ট হবে বলে যদি তাকে ফজরের সলাতে না ডাকি, রমাদান মাসে কষ্ট হবে বলে যদি তাকে সিয়াম পালনে গুরুত্ব না দেই, পর্দা করার বিষয়ে গুরুত্ব না দেই তাহলে আদরের সন্তানদের নিয়ে আখিরাতে একই ঘটনা ঘটবে।

সন্তানদেরকে ত্যাগের শিক্ষা দেয়া

সন্তানকে ত্যাগের শিক্ষা দিতে হবে। নিজের পকেট মানি হতে একটি বিশেষ ব্যাঙ্কে অল্প অল্প করে কিছু অর্থ জমা করার উৎসাহ দেয়া উচিত। বছর শেষে জমা অর্থ কোন গরীব আত্মীয়ের প্রয়োজন পূরণে ব্যবহার করতে পারি। কেবল আমি, আমার, এটা চাই, ওটা চাই ইত্যাদি স্লোগান হতে ওদের যতদূর সম্ভব

দূরে রাখতে হবে। তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে ভোগে শান্তি নয়। তারা যেন অল্পে তুষ্ট থাকে। যা পায় সেটাতেই সন্তুষ্ট থাকে।

যেমন ঃ কোথাও কোন প্রোগ্রামে রিফ্রেশমেন্টের ব্যবস্থা রয়েছে এবং সেল্‌ফ সার্ভিস। এখন এখানে আইটেম নেয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে অন্যেরাও যেন তা পায়। খুব টেষ্টি মনে করে একই আইটেম অনেকগুলো খেয়ে ফেলা অনুচিত। তাহলে অন্যেরা নাও পেতে পারে। কারণ এই খাবারে সবার হক রয়েছে, সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। আবার সবগুলোর মধ্য থেকে ভালটা বেছে বেছে নেয়া ঠিক নয় বা বেছে বেছে বড়টাও নেয়া ঠিক নয়।

ধনী-গরীব সকল আত্মীয়দের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া

অনেকেই সন্তানদেরকে গরীব আত্মীয়-স্বজনদের সাথে পরিচয় করাতে চান না, গরীব আত্মীয়-স্বজন যে আছে তা হয়তো কেউ কেউ স্বীকারও করতে চান না, সন্তানদেরকে তাদের থেকে দূরে রাখেন। ইসলামের দৃষ্টিতে এই কাজটি মোটেও ঠিক না। আল্লাহ কাউকে গরীব বানান আবার কাউকে ধনী বানান, এটি তার পরীক্ষা। তিনি দেখেন কে কী করে? অনেকেরই গ্রামে গরীব আত্মীয় থাকে, সন্তানদেরকে সেখানে নিয়ে আত্মীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া উচিত। সন্তানদের সামনে তাদেরকে সাহায্য সহযোগীতা করা উচিত। এতে সন্তান শিখবে কীভাবে গরীব আত্মীয়দের সম্মান করতে হয়, কীভাবে তাদের পাশে দাঁড়াতে হয়। আবার কেউ কেউ ধনী আত্মীয় থেকেও হীনম্মন্যতার কারণে দূরে থাকেন। আমাদের উচিত তাদের সাথেও সন্তানদের পরিচয় করিয়ে দেয়া এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

আমরা এবার (২০১৫ সালে) আমাদের মেয়েকে নিয়ে বাংলাদেশে গিয়েছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল তাকে বাংলাদেশের কালচার দেখানো এবং গরীব আত্মীয়-স্বজনদের সাথে পরিচয় করানো। আলহামদুলিল্লাহ তাকে গরীব আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা করিয়েছি এবং ঢাকার বস্তিতেও নিয়ে গিয়েছি দেখাতে যে বস্তিতে কত কষ্টে মানুষ বসবাস করে, কত কষ্টে জীবনযাপন করে। আমাদের মেয়ের দু'টি মাটির ব্যাংক আছে, একটি মধ্যপ্রাচ্যে গাজার শিশুদের জন্য এবং অপরটি বাংলাদেশের শিশুদের জন্য। সে ঐ ব্যাংক দু'টিতে পয়সা ফেলে এবং ব্যাংক দু'টি একসময় ভরে গেলে তা দিয়ে গাজা এবং বাংলাদেশের অসহায় শিশুদের সাহায্য করবে।

আমার সন্তানের সংঘবদ্ধ জীবনযাপন ও ট্রেনিং প্রোগ্রাম

ক্যানাডা এবং আমেরিকায় প্রতিনিয়তই বিভিন্ন ইসলামিক অর্গানাইজেসন এবং ইনিস্টিটিউটস বিভিন্ন বিষয়ের উপর সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং ট্রেনিং-এর আয়োজন করছে। একইভাবে বাংলাদেশেও এখন অনেক জায়গায় ইসলামের উপর ভাল ভাল সেমিনার, ওয়ার্কশপ হচ্ছে। আমি, আমার স্ত্রী ও সন্তান সকলে মিলে এসব প্রোগ্রামে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে পারি। নিম্নে কিছু অর্গানাইজেসনের নাম দেয়া হলো। ইন্টারনেটে সার্চ করলেই এদের ওয়েবসাইটসহ বিস্তারিত ইনফর্মেশন পাওয়া যাবে। চেষ্টা করি সন্তানদেরকে নিয়ে এদের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে। এছাড়া এখন বাংলাদেশেও কিছু কিছু ভাল অরাজনৈতিক শিক্ষামূলক ইসলামিক অর্গানাইজেশন হয়েছে। আমাদের উচিত হবে এদের মেম্বার হয়ে তাদের সাথে সমাজকল্যাণমূলক কাজ করা, দাওয়াতী কাজ করা এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রম করা।

- Alkauthar Institute (www.alkauthar.org)
- Almaghrib Institute (www.almaghrib.org)
- Al Huda Institute (alhudainstitute.org)
- ICNA (Islamic Circle of North America)
- MAC (Muslim Association of Canada)
- QSS (Quran Sunnah Society)
- MSA (Muslim Students Association)
- www.mercymissionworld.org
- IERA (Islamic Education and Research Academy)
- TIC (Toronto Islamic Centre)

টিভি চ্যানেল উপভোগ

ইসলামিক টিভি চ্যানেল

আমরা অনেকেই বাসায় ক্যাবল কানেকশন নিয়ে থাকি টিভি চ্যানেলের জন্য। আর এই কানেকশন মানেই ৫০ থেকে ৭০টি চ্যানেল যার বেশীরভাগই শিক্ষণীয় নয়। আমি হয়তো ভাল উদ্দেশ্যে একটা দুটো চ্যানেল দেখার জন্য নিয়েছি কিন্তু তার পাশাপাশিতো আরো অনেক আজেবাজে চ্যানেল নিতেই হচ্ছে এবং তার কারণে অনৈসলামী কালচার আমার ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। আমার সন্তান হয়তো

আমার অনুপস্থিতিতে ঐসকল চ্যানেল উপভোগ করে থাকে। আমি কেন তার খারাপ হওয়ার জন্য রাস্তা খুলে দিচ্ছি। এটাও নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন যে আমাদের শিশুরা টিভিতে কী দেখছে। সারাদিন টিভিতে অশ্লীল নাচ-গান চলছে আর শিশু বাবা-মা'র সাথে বসে তাই দেখছে, এই শিশুর লজ্জাবোধ তো ওখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে!

আমরা অনেকেই অজুহাত দিয়ে থাকি যে নিউজটা একটু দেখতে হয়, আবহাওয়ার খবরটা একটু দেখতে হয়, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলটা একটু দেখি আর মাঝে মাঝে খেলাধুলার চ্যানেলগুলি একটু দেখি, ইত্যাদি। যাহোক, দেশ-বিদেশের খবর আমি কোন না কোন ভাবে পেয়ে যাবো অথবা ইন্টারনেট থেকেও পেতে পারি। তবে এই অবাধ ক্যাবল কানেকশন নিজ ঘরে উপকারের চাইতে অপকারই বেশী হচ্ছে। অবশ্যই আমাদের সন্তানেরা এ থেকে নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য কিছু পাচ্ছে না। আমাদের সন্তানদের এর অলটার্নেটিভ কিছুতো দিতে হবে। তাই আমরা আমাদের ঘরে অশ্লীল চ্যানেলের পরিবর্তে ঘরে ইসলামিক ডিভিডি দেখতে পারি এবং অনলাইনে নিম্নের ইসলামিক চ্যানেল উপভোগ করতে পারি।

- www.one4kids.net
- www.kids.farhathashmi.com
- www.muslimville.com
- www.soundvision.com
- www.muslimkidstv.com
- YouTube: Shishu Lalon Palon
- YouTube: #QuranwithMaryam

ইসলামী বিনোদনের বিষয়ে সতর্কতা

ইসলামী বিনোদনের বিষয়েও আমাদেরকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। ইসলামী বিনোদনের নামে বাজারে অনেক নাটক, সিনেমা, ম্যাগাজিন, কার্টুন ইত্যাদি পাওয়া যায় যেগুলো আসলে ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে অনৈসলামী। যারা এগুলো তৈরী করেন তাদের হয়তো সহীহ আক্বীদার উপর সঠিক জ্ঞানের অভাব রয়েছে। এই প্রকার অনেক বিনোদনেই হালাল এবং হারামকে মিশ্রণ করে ফেলেছেন। ইসলামের নামে অনেক গান রয়েছে যেমন ঃ হাম্‌দ, নাথ, মারফতী, কাউয়ালী ইত্যাদিতে রয়েছে অনেক শিরক ও বিদ'আত মিশ্রিত কথা। আবার

অনেক নাটক-সিনেমাও রয়েছে যেগুলো ইসলামী আক্বীদার সাথে সাংঘর্ষিক। তাই এই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য কিছু জ্ঞান অর্জনও প্রয়োজন।

কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, গানের কথা ভাল কিন্তু মিউজিক রয়েছে তখন কি উপায়? গান মিউজিক বিহীন হওয়া উচিত, তবে মিউজিকাল ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে শুধু মাত্র 'দফ' ইসলামে অনুমোদন করে অন্যগুলো নয়। অনেক প্রডাকশন কোম্পানী প্রাকৃতিক শব্দ ব্যবহার করে হালাল উপায়ে বিনোদনমূলক প্রোডাকশন বাজারে ছাড়েন যেমন, বাতাসের শন্‌শন্‌ শব্দ, পানির কলকল শব্দ, সমুদ্রের গর্জন, নদীর ঢেউয়ের শব্দ, পাখির কিচির-মিচির শব্দ, মেঘের গর্জনের শব্দ, বৃষ্টির শব্দ, গাছপালার শব্দ ইত্যাদি। কিছু কিছু স্কলার বাচ্চাদের ডেভেপলমেন্টের জন্য শিক্ষামূলক বিনোদনগুলোর মধ্যে হালকা মিউজিক ব্যবহার করাতে আপত্তি করেন না। এর একমাত্র কারণ বাচ্চাদেরকে আকৃষ্ট করা অন্য কোন উদ্দেশ্য নয় (কারণটা কিছুটা ছোট বাচ্চাদের পুতুল খেলার অনুমোদনের মতো)। তবে বড়দেরকে কোনভাবেই এই অনুমোদন দেয়া হয় না।

অন্যান্য শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল

ইসলামিক টিভি চ্যানেলের পাশাপাশি আমরা আরো কিছু শিক্ষামূলক টিভি চ্যানেল সন্তানদের নিয়ে মাঝে মধ্যে দেখতে পারি। যেমন ঃ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল, ডিসকভারি চ্যানেল, বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা হয় এমন চ্যানেল, স্বাস্থ্য বিষয়ক চ্যানেল।

সতর্কতা অবলম্বন

হে মু'মিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো ।
(সূরা তাগাবুন ঃ ১৪)

চ্যাপটার ১১

সন্তানদের শাসন করা

আমরা অনেক মা-বাবা কথায় কথায় সন্তানদের চর থাপ্পর মারি। কোন কোন মা-বাবা সামান্য পড়া না পারার কারণে বা দুষ্টামি করার কারণে, বা পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ করার কারণে সন্তানদের অমানবিক শাস্তি দেন! লাঠি দিয়ে চোরের মতো পেটান! কোন কোন শিক্ষকরা বেত দিয়ে পিটিয়ে রক্ত বের করে ফেলেন, হাত-পা ফুলিয়ে দেন, হাতের কাছে বেত না থাকলে ডাষ্টার দিয়ে মাথায় মারেন, পেন্সিল দুই আঙুলের চিপায় ঢুকিয়ে দাগি আসামীকে রিমান্ডে নেয়ার মতো শাস্তি দেন! অধিকাংশ মাদ্রাসাগুলোতে ইয়াতিম ছাত্রদের হুজুররা পিটিয়ে পিঠের চামড়া ফুলিয়ে ফেলেন! মোহাম্মাদপুরে আমাদের এক প্রতিবেশীকে স্কুল জীবনে প্রাইভেট শিক্ষক বেত দিয়ে পিটাতে পিটাতে ঐ বেত ভেঙ্গে ছাত্রের চোখের মধ্যে ঢুকে যায় এবং তখন থেকে তার এক চোখ অন্ধ হয়ে যায়! সে আজ কয়েকটি সন্তানের বাবা এবং সেই এক চোখ নিয়ে বেঁচে আছে!

শাসন মানেই মার-ধর না, শারীরিক নির্যাতন নয়। সন্তানের গায়ে হাত দেয়া ছাড়াও শাসন করা যায় এবং সেটাই হচ্ছে প্রকৃত শাসন। যদিও আমরা এখানে শাসন শব্দটা ব্যবহার করেছি কিন্তু এটাকে আমরা সংশোধন প্রক্রিয়া বলতে চাই। আমাদের শাসন হবে সংশোধন প্রক্রিয়ার একটা উপায় মাত্র। আর সংশোধন প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হবে যেনো আমাদের সন্তান তার ভুলটি বুঝে এবং ভবিষ্যতে সেটা করা থেকে বিরত থাকে। সংশোধন প্রক্রিয়া সন্তান প্রতিপালনের অন্যতম একটা অংশ। অনেক মা-বাবারা তাদের সন্তানদের ছোটবেলায় শাসন করতে চান না। বলেন, "ও তো এখনো ছোট, বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে"। কিন্তু একদম শাসন না করা বা সংশোধন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন না করাও ঠিক না।

ছোটবেলা থেকে একটা শিশুকে ন্যায়-অন্যায়ের মানদন্ড যদি মা-বাবা না শেখায় তবে সে "ঠিক" হবে কী করে? আগেকার আমলে ছোটবেলায় ছেলেমেয়েরা নিজ বাবাকে দেখলে পালিয়ে থাকতো, সাধারণত তার কাছে বা সামনে যেতে ভয় পেতো। আর আজ শিক্ষার বদৌলতে, জ্ঞানের প্রসারতার কারণে ছেলেমেয়েরা বাবাকে দেখলে দৌড়ে কাছে আসে, পালিয়ে বেড়ায় না, মায়ের মতো বাবার কাছেও আবদার করে।

সতর্কতা ঃ কেউ কেউ ছেলেমেয়েদের গালে চর বা থাপ্পর মারেন। এই কাজটি মোটেও ঠিক না। ইসলামে কারো গালে আঘাত করা নিষেধ। গালে চর মারার অনেক ক্ষতিকারক দিকও রয়েছে। যেমন গালে চর মারার কারণে বাচ্চার ব্রেইনের ক্ষতি হতে পারে। এছাড়া মাথায় চর-থাপ্পর দিলে ঐ একই ঘটনা ঘটতে পারে। আবার দেখা যায় যে গালে বা মাথায় মারতে গিয়ে কেউ কেউ বাচ্চার কানের মধ্যে চর মারেন, এতে হয়তো শিশুর কানের বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই সন্তানকে শাসন করতে গিয়ে গালে, কানে বা মাথায় আঘাত করা মোটেও ঠিক না। এতে সন্তান বিকলাঙ্গ বা বধির হয়ে যেতে পারে।

সন্তানদের প্রতি আজেবাজে মন্তব্য না করা

অনেক মা-বাবা সন্তানদের প্রতি নানা রকম কমেন্ট বা মন্তব্য করেন। এতে ছেলেমেয়েদের মন ছোট হয়ে যায়, তারা নিজেরা অপমানিতবোধ করে, মনে খুবই কষ্ট পায়। তাদের অপরাগতার জন্য তাদেরকে সুন্দর করে বুঝিয়ে বলতে হবে। নিম্নে কিছু মন্তব্য তুলে ধরা হলো। এই জাতীয় আজেবাজে বাক্য বা মন্তব্য করা ঠিক না। যেমন ঃ

- ছেলেটা একটা গাঁধা!
- মেয়েটা আস্ত একটা গর্ধব!
- তুমি একটা গরু।
- তোমার মাথা ভরা গোবর!
- তুমি একটা ফালতু মেয়ে!
- তুমি একটা অসভ্য ছেলে!
- ছেলেটা একটা শয়তানের হাড্ডি!
- তোমার চেয়ে ওমুকে অনেক ভাল!

সন্তানদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি দৃষ্টি রাখা

আমাদের সন্তানদের স্কুল-কলেজে পড়ুয়া বন্ধু-বান্ধবদের দিকে দৃষ্টি রাখার আগে তাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি শিক্ষা দেয়া উচিত। তাদের বন্ধুরা হয় তাদের চাইতে ছাত্র হিসেবে ভাল হবে অথবা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকে উন্নত হবে। সন্তানগণ যদি এ নীতিতে একমত হয় তাহলে মা-বাবাদের মাথাব্যথা কিছুটা কমে যাবে বৈকি! একটি বাস্তবতা মা-বাবাদের স্মরণ রাখতে হবে যে সন্তানগণ সবসময় তাদের বন্ধুদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা দিতে চেষ্টা করে। এমনকি তারা মা-বাবার চাইতে বন্ধুকে গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য মনে করে। তারা সবসময় বন্ধুদের পক্ষ নিয়ে কথা বলে। ক্ষেত্রবিশেষে বখাটে বন্ধুদের পক্ষ হয়ে সন্তানগণ মা-বাবার নির্দেশ ও উপদেশ অমান্য করে।

কিছু বিষয় আছে যে সম্পর্কে আমাকে অতিরিক্ত সতর্ক হতে হবে। আমার যাবতীয় প্রচেষ্টার পরও যদি সন্তান ঠিক না হয় তাহলে হতাশ হওয়ার সুযোগ নেই। আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে দু'আ করে যেতে হবে। তবে চেষ্টা ছাড়া যাবে না, চালিয়ে যাতে হবে। কিন্তু চেষ্টা-তদবীর করে যাওয়া আমার উপর অবশ্যকরণীয়। সন্তানদের বন্ধুরা যেন মাঝে মাঝে বাসায় আসতে পারে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। বন্ধুদের বাসায় আসার দরজা যদি বন্ধ করি তা হলে আমার সন্তান বিকল্প পথ খুঁজে একেবারে অন্ধকারে চলে যেতে পারে। অর্থাৎ আমি কিছুই জানবো না সে কি ধরনের বন্ধুদের সাথে চলে, বন্ধুরা মিলে কি ধরনের তৎপরতা চালায় ইত্যাদি।

আমার সন্তান যেন আমাকে বন্ধু ভাবে

আমার সন্তান যেন আমাকে বন্ধু ভাবে সে ধরনের পরিবেশ তৈরী করতে হবে। ফলে সে কী করে না করে সবই আমি জানতে পারবো। আল্লাহ না করুন, সে কোন নেশা জাতীয় মাদক সেবন করে কিনা, বা সে ধরনের কোন গ্রুপের সংস্পর্শে চলে যায় কিনা তা কৌশলে খেয়াল রাখতে হবে। মাঝে মাঝে ছুটির দিনে সন্তানদের সাথে নিয়ে ইসলামিক ভিডিও দেখা যেতে পারে। এখন কোয়ালিটি সম্পন্ন ইসলামিক ডিভিডি আমেরিকা, ব্রিটেন আর ক্যানাডায় তৈরী হয়। এখানে ইসলামী বিশেষজ্ঞরা দিনরাত পরিশ্রম করে বিভিন্ন প্রকাশনা বাজারে ছাড়ছে। ব্যাপক হারে পাশ্চাত্য দেশের গুণীজন ইসলাম গ্রহণ করছেন। এটা গোটা মুসলিম জাতির জন্য শিক্ষার বিষয়।

সন্তানের ধূমপানের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা

সাধারণত হাইস্কুল থেকেই ছেলেমেয়েরা ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এই টিনএইজারদের ধূমপানের আর একটা কারণ তারা খুব তাড়াতাড়ি নিজেদেরকে বড়দের মতো ম্যাচিউর ভাবতে থাকে। এটা প্রধানতঃ ঘটে স্কুলের/ক্লাসের ধূমপায়ী সংগী-সাথীদের কুপ্রভাবে। যেসব পরিবারে মা-বাবা, বড় ভাইবোন, নিকটাত্মীয়রা ধূমপান করে, সেই সব পরিবারের ছেলেমেয়েরা অতি সহজেই ধূমপান শুরু করে। তবে অধুমপায়ী পরিবারের সন্তানও ধুমপান শুরু করতে পারে। শুরু হয় সস্তা সিগারেট দিয়ে, কিন্তু বয়স বাড়ার সংগে সংগে আরো বেশী নেশাযুক্ত টোব্যাকো, ড্রাগ্স, মারিজুয়ানা ইত্যাদিতে অভ্যস্থ্য হয়ে পড়ে। সেই অভ্যাস আর ছাড়া যায় না। রিসার্চ করে দেখা গেছে যে ধূমপায়ীদের ৭৭% চেষ্টা করেও সেই আসক্তির কবল থেকে মুক্তি পায় না।

ইসলাম ধর্ম যেমন মদ খাওয়া হারাম করেছ, ঠিক তেমনি যে কোন নেশার দ্রব্য খাওয়া বা পান করাও হারাম করেছে- এমনকি যদি অতি অল্প পরিমাণও হয়। আল্লাহ ও তাঁর রসূল মুহাম্মাদ ﷺ -এর আদেশ অমান্য করে কোন মুসলিম (নারী অথবা পুরুষ) যদি হারাম কাজে লিপ্ত হয়, সে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে, কঠিন শাস্তি পাবে, একথা কুরআন ও হাদীস বারবার জোর দিয়ে বলেছে। সুতরাং মুসলিমদের সাবধান হওয়া উচিত।

সিগারেট তৈরী করতে চার হাজার অধিক কেমিক্যাল্স্ প্রয়োজন হয়। রিসার্চের ফলে জানা গেছে যে সেগুলোর মাঝে ৪০টিও অধিকসংখ্যক কেমিক্যাল্স্ ক্যান্সার রোগটি সৃষ্টি করে।

Smokeless Tobacco নামে এক ধরনের সিগারেট বাজারে পাওয়া যায়, লোকেরা তা কিনে খায়। রিসার্চের ফলে জানা গেছে যে smokeless Tobacco তৈরী করতে যেসব কেমিক্যাল্স্ ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর মাঝে অন্ততঃ ২৮টি মানুষের দেহে Cancer রোগটির সৃষ্টি করে।

ধূমপানের অপকারিতা

১) হারাম বস্তু খাওয়া হয় এবং ফলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশের অবাধ্যতা করা হয়। এতে আখিরাতে জাহান্নামী হওয়ার আশংকা রয়েছে যদি না আল্লাহ দয়া করে মাফ করেন।

২) অযথা অর্থের অপচয় যাকে ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় ইস্‌রাফ (অপব্যয়) যা আল্লাহ মু'মিনদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন।

৩) গায়ে, মুখে, হাতে, পোশাকে দুর্গন্ধ জন্মে। নিজেদের রুমে, বইপত্রে, ব্যাকপ্যাকে দুর্গন্ধ জন্মে। কথা বললে শ্রোতা মুখের দুর্গন্ধ পেয়ে বিরক্ত হয়। সমস্ত পরিবেশটাই দুর্গন্ধময় ও অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ে।

৪) এমন দুর্গন্ধ গায়ে নিয়ে সলাত ও অন্যান্য ইবাদত আল্লাহ কতটুকু কবুল করবেন তা জানা নেই।

৫) সিগারেটের আগুনে অনেক সময় জামা-কাপড় পুড়ে যায়, এমন কি ঘরে আগুনও ধরে যেতে পারে।

৬) ধূমপায়ীরা অধূমপায়ীদের তুলনায় ১০ বছর কম বাঁচে।

৭) ধূমপায়ীদের প্রায় অর্ধেক পরিমাণ নারী-পুরুষ ক্যান্সার, হার্ট ডিজিজে মারা যায়। এর বাইরে আরো অন্ততঃ দুই ডজন রোগের জন্ম দেয় এই ধূমপান- লাং ক্যান্সার, হার্ট এটাক, হাই ব্লাড প্রেশার, ব্রংকাইটিস, আলসার ইত্যাদির কারণ এই স্মোকিং।

৮) অপারেশন করার পর ইনফেক্‌শন হওয়ার অধিক আশংকা থাকে ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে।

৯) বাচ্চাদের এজমা রোগটা সৃষ্টি হয় (দ্বিগুণ পরিমাণ)- যদি ওদের মা-বাবা ধূমপায়ী হয়।

মাঝেমধ্যে দেখতে হবে তার জামা-কাপড় দিয়ে সিগারেটের গন্ধ পাওয়া যায় কিনা, বা রুমে সিগারেটের গন্ধ পাওয়া যায় কিনা বা তার হাত মুখ দিয়ে সিগারেটের গন্ধ পাওয়া যায় কিনা। ছেলের সার্ট-প্যান্ট ধোয়ার সময় মায়ের খেয়াল রাখতে হবে যে পকেটে সিগারেটের গুড়া থাকে কিনা, যদি এটা পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে ছেলে সিগারেট ধরেছে। কোন চেচামেচি করা যাবে না, তাকে মারধোর করা যাবে না। হিকমতের সাথে এগুতে হবে। সন্তানকে ধূমপানের ব্যাপারে কঠোর দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরতে হবে। প্রথমে এর খারাপ দিকগুলি তুলে ধরতে হবে। এ ব্যাপারে মৃদু কঠিন নীতি বেঁধে দিতে হবে। বলতে হবে আমি কোন অবস্থায় ধূমপান সহ্য করবো না। এটি একটি ঘৃণ্য কাজ। ধুমপান যে হারাম পরিবারের সবাই মিলে এর উপর ডা. জাকির নায়েকের লেকচার দেখতে পারি, আশা করি তারা ডা. জাকির নায়েকের কুরআন-হাদীস এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক লজিক পছন্দ করবে।

মা-বাবাদের জন্য দু'টি তথ্য

বাস্তবতা তুলে ধরছি। একটি দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে অতি ম্যাচিউর কিছু ছাত্র কোন বন্ধুর বাসায় একত্র হয়ে জুয়া খেলে। মা-বাবা-রা তা জানেনই না, বাসার অন্যেরা হয়তো মনে করে ছেলে বন্ধুদের নিয়ে গ্রুপ স্টাডি করছে। দেখা যায় নিজ সন্তান তার বন্ধুদের নিয়ে নিজ রুমে এই কাজ করছে আর মা হয়তো তাদের চা-নাস্তা দিয়ে আপ্পায়ন করছেন কিন্তু তিনি তার কিছুই টের পাচ্ছেন না। প্রথম দিকে বন্ধুরা মিলে তাস দিয়ে স্পেকট্রাম খেলে এবং এক সময় তা টাকা দিয়ে জুয়াতে রূপান্তরিত হয়। (নাউযুবিল্লাহ) এই জুয়া দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করতে থাকে এবং পড়াশোনার চরম অবনতি ঘটতে থাকে। এমনও হয় জুয়ার টাকা নিয়ে নিজেদের মধ্যে বড় ধরনের গন্ডগোলও হয়, বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যায়। কোন কোন গ্রুপ শুধু জুয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকে না তারা এর পাশাপাশি মদ খায় এবং পর্নগ্রাফী দেখে। এই জঘন্ন নেশা দিনের পর দিন চলতে থাকে এবং ছাত্ররা প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা জুয়া খেলে সময় নষ্ট করে।

তারা একবারও চিন্তা করে না যে এই সময় নষ্ট করার জন্য তারা আল্লাহর কাছে কী জবাব দেবে? তাই মা-বাবাদের এই বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সন্তান যখন বড় হয় অর্থাৎ হাইস্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তখন তার একটা পারসোনালিটি তৈরী হয়, এটি সত্যি কথা, তার এই পারসোনালিটিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু ইবলিশ শয়তানকে এক মুহূর্তের জন্য বিশ্বাস করা যাবে না, তাকে কোন প্রকার সুযোগ দেয়া যাবে না, সে বেশী ঘুরাঘুরি করে কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েদের পিছনে এর কারণ উঠতি বয়স। এই বয়সে যদি একটি ছেলে বা মেয়েকে নষ্ট করে দেয়া যায় তাহলেই তার সার্থকতা, বাকী জীবন আর তার তেমন কিছু করতে হবে না। তাই কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া সন্তানদের পারসোনালিটির কথা চিন্তা করে একেবারে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেয়া যাবে না। তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তাদের সাথে মা-বাবাকে মিশতে হবে যেন তারা মা-বাবা থেকে কোন কিছু না লুকায়।

ছেলে এবং মেয়েরা কি একে অপরের বন্ধু হতে পারে?

আমেরিকার টিভি শোতে নুমান আলী খানের একটি সাক্ষাতকার

ছেলেমেয়েরা কি একে অপরের বন্ধু হতে পারে? সময়ের স্রোতে এ আজ জটিল প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বন্ধুত্বে ক্ষতি নেই, বন্ধুত্বে অশ্লীলতা নেই, বন্ধুত্বে হার নেই

এমন কি বন্ধু ছাড়া জীবন অসম্ভব এ ধরনের অনেক কথাই আমরা শুনে থাকি। তবে বাস্তবতা কি? ছেলেমেয়েদের বন্ধুত্বটা ক্ষতিকর না উপকারী? এসব বিষয় নিয়ে 'দ্যা দিন শোতে' সাক্ষাৎকার দিয়েছেন আমেরিকার বিখ্যাত স্কলার নুমান আলী খান।

দ্যা দিন শো হোস্ট : আমাদের বলুন, নারী এবং পুরুষ, ছেলে এবং মেয়ে কি বন্ধু হতে পারে? একটা মেয়ে কি এই রকম আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলতে পারে দেখ আমি তার সাথে শুধু ঘুরতে যাচ্ছি। আমার সাথে হাঁটবে। সে আমার সাথে খুবই ভালো আচরণ করে, সে আমার আসলে প্রশংসাও করে, সে সবসময় আমাকে খুব মিষ্টি করে কথা বলে, সে আসলে খুবই ভালো। আমি তার সাথে কিছুই করবো না; আমরা শুধু একসাথে ঘুরাঘুরি করবো। এটা কি সম্ভব?

নুমান আলী খান : এটা হতে পারে না। তবে তা হচ্ছে তো অবশ্যই। অথচ তা হওয়া উচিত নয় এটাই সত্যি।

দ্যা দিন শো হোস্ট : কিন্তু তারা বলছে তারা শুধুই বন্ধু। তারা বন্ধুই থাকবে। ছেলে এবং মেয়ে কি শুধু বন্ধু হতে পারে?

নুমান আলী খান : না। ছেলেরা সেটা খুব ভালো করে জানে। তারা স্বীকার করবে না কিন্তু তারা এটা খুব ভালোভাবে জানে। কখনো কখনো মেয়েরা জানে না এবং এটাই আমাকে আমার বোনদের নিয়ে দুশ্চিন্তায় ফেলে যে, তারা অনেক সময় পুরুষদের এই পরিকল্পিত ফাঁদটা বুঝতে পারে না।

দ্যা দিন শো হোস্ট : পুরুষদের পরিকল্পিত ফাঁদটা কী?

নুমান আলী খান : আমরা ল্যাব পার্টনার অথবা আমরা স্কুলের প্রজেক্ট নিয়ে আলোচনা করছি। আমরা ইসলাম নিয়ে আলোচনা করছি এবং তারা অনেক সময় এ সবের আড়ালের পুরোটা দেখতে পায় না এবং আমাদের বোনদের মধ্যে আসলে সচেতনতার এবং সাবধানতার মাত্রা বাড়াতে হবে। আমাদের মতবিনিময় হবে কিন্তু কিছু গাইডলাইন আমাদেরকে মানতে হবে যাতে তা অস্বাস্থ্যকর না হয়ে স্বাস্থ্যকর হয়। আমি আসলে ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি আমাদের ভাই এবং বোনদের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মতবিনিময় হোক, বিশেষ করে কম বয়সী ছেলে মেয়েদের মধ্যে, এমনভাবে তারা বড়দের থেকে গাইড পাক যেন তারা জানুক কিভাবে সম্মানজনকভাবে একে অন্যের সাথে ব্যবহার করতে হয়।

উদাহরণস্বরূপ, আমি যদি আমার মেয়েকে পুরো আলাদা রাখি যাতে তারা অন্য কারো সাথে কথাও না বলতে পারে, একটা সময় আসবে যখন তারা কলেজে যাবে, কর্মক্ষেত্রে যাবে অথবা এয়ারপোর্টে যাবে বা ঘুরতে যাবে, অন্য মানুষ থাকবে ওদের আশেপাশে। আমি চাইনা বাইরের পৃথিবী দেখে ওরা আঁতকে উঠুক। জানেন নিশ্চয়ই, বাচ্চাদেরকে বোতলে ভরে রাখলেই তাদেরকে রক্ষা করা যাবে না কিন্তু একই সময়ে তাদেরকে এই বলে ছেড়েও দেয়া যাবে না যে, তুমি যা ইচ্ছা কর - এটাও পাগলামি। আমাদেরকে ভাই এবং বোনদের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মতবিনিময় -এর একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে, বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে।

তারা যদি একে অন্যের সাথে সম্মানজনকভাবে কথা বলে ঠিক আছে। ছেলেরা যখন জানবে কোথায় তাদের তাকাতে হবে এবং কিভাবে শুধু কাজের কথায় আলোচনা সীমিত রাখতে হবে এবং কখন তারা সীমা অতিক্রম করছে বুঝতে পারে তখন তাদের এ পথে পা বাড়ানো উচিত এবং বড়দের উচিত গাইড করা। নারী এবং পুরুষের মেলামেশা, এসব কোথায় হয় জানেন? এসব হয় যেখানে নারী পুরুষ একসাথে প্রচুর সময় কাটায়। তো আমি কলেজে যাচ্ছি কিছু মানুষের সাথে, কাজে যাচ্ছি কিছু মানুষের সাথে এবং আমি জানি লাঞ্চের সময় সবাই একসাথে হয় এবং এটা সেটা এবং এটা প্রতিদিন হচ্ছে, এতে কী হয়? এতে শয়তান হয়তো আমাকে একেবারে পুরো বিচ্যুত করতে পারছে না। কিন্তু ১% করে করে আমার বিচ্যুতি ঘটায়।

একজন অভিভাবকের প্রশ্ন

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচুর মিনি চাইনিজ রেষ্টুরেন্ট এবং সাইবার ক্যাফে গড়ে উঠেছে কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময় ও ভয়ের কারণ হলো যে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যবসার নামে চলে চরম বেহায়াপনা। বিভিন্ন স্কুল-কলেজে পড়ুয়া ছাত্র ও যুবকেরা প্রেমের নামে প্রতারণা করে ছাত্রী মেয়ে বান্ধবীদেরকে নিয়ে এ সমস্ত চাইনিজ ও সাইবার ক্যাফেতে সারাদিন আড্ডা দেয় এবং মেয়েদের সরলতার সুযোগ নিয়ে তাদের ইজ্জত লুণ্ঠন করে। আমাদের কোমলমতি মেয়েদেরকে ব্ল্যাক মেইলিং করে তাদের পর্নো সিডি/ডিভিডি বাজারে ছেড়ে অশ্লীলতার এ মহোৎসব শুরু করেছে, বিশেষ করে স্কুল-কলেজ পড়ুয়া মেয়েরা এর শিকার হয়ে জীবনের মহামূল্যবান সম্পদ হারাচ্ছে। এ সম্পর্কে ইসলামের বিধান কী?

উত্তর ঃ

এ সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য পরিষ্কার। ইসলাম অন্যায়কে কখনোই মেনে নেয় না। অসৎ কর্মকে কখনোই সমর্থন করে না। পাপ ও ঘৃণাজনক কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগায় না। পৃথিবীর বুকে একমাত্র ইসলামই সর্বক্ষেত্রে মানবতার কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় সদা সচেষ্ট। তাই উল্লিখিত পরিস্থিতিতে যারা অন্যায় বৃদ্ধি করার মতো পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরী করে দিচ্ছে (প্রতিষ্ঠানের মালিক পক্ষ) আর যারা অন্যায় কাজে লিপ্ত হচ্ছে (ছাত্র-ছাত্রী বা যুবক-যুবতীরা), সবার জন্যই ইসলামী বিধান অনুযায়ী শাস্তি অবধারিত।

অবশ্য এ প্রশ্নে অভিভাবক ছাত্রী বা মেয়েদের অবলা বা সরলা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এমন ক্ষেত্রে ছাত্রী বা মেয়েদের প্রতি লক্ষ্য করে জবাব হচ্ছে ঃ এগুলো আরও বাড়বে যদি মেয়েরা তাদের সম্মান সম্পর্কে সতর্ক না হয়। এখন প্রশ্ন ঃ মেয়েরা ছেলেদের সাথে বন্ধুত্ব করতে যাবে কেন? এবং তাদের দাওয়াতে কোন রেষ্টুরেন্টে অথবা কোন সাইবার ক্যাফেতে তারা যাবে কেন? আর যখন প্রশ্নকর্তা বলছেন 'মেয়েদের সরলতা নিয়ে' ছেলেরা এমনটি করছে। এক্ষেত্রেও দায়ী মেয়েরা কারণ এমন সরলতার কোন দাম নেই। সরলতার কারণে কি কেউ বিষ খায়? সরলতার কারণে কি কেউ গলায় দড়ি দিয়েছে বা পানিতে ডুবে মরেছে! এরকমতো হয় না। এটা কি ধরনের সরলতা?

যুবতী মেয়ের ভাবা উচিত তার জীবনের মূল্যবান সম্পদ তার সতীত্ব। কারো সাথে ফোনে কথা বলে বন্ধুত্ব বানিয়ে কোন জায়গায় বেড়াতে যাবার অর্থ সরলতা নয় বরং এটা চরম বোকামি ও জেনে শুনে নিজের ঘাড়ে ভয়ংকর বিপদের বোঝা চাপানো। একবার নির্জনে এসব তথাকথিত ছেলেবন্ধুর সাথে ঘনিষ্টতা করলে নিজের দুনিয়া ও আখিরাত দুটোই নষ্ট হবে। তার পরবর্তী জীবন আর সহজ থাকে না। খুব কঠিন হয়ে যায়। অনেকে সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যাও করে। এসব ঘটনা দেশের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়েও খুব দেখা যাচ্ছে।

এসব বিপদ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো ছাত্রী জীবনে কোন ছেলেদের সাথে অবৈধ মেলামেশা বা প্রেমে লিপ্ত না হওয়া। বিয়ের আগে প্রেম অর্থাৎ বিবাহ-বহির্ভূত প্রেম ইসলাম হারাম করেছে। ইসলামে এটা জায়িয নেই। এতে নিজের সর্বনাশ করা ছাড়া আর কোন লাভ নেই। কাজেই এটাকে সরলতা বা

কোমলতা কোনভাবেই বলা যায় না। এটা যেন ইচ্ছে করেই সাপের কামড় খাওয়া বা ইচ্ছে করে গর্তে পড়ে আত্মহত্যা করার শামিল।

সুতরাং কোন (তথাকথিত) পুরুষ বন্ধুর সাথে কোন মেয়ে ঘরের বাইরে যাওয়া মোটেই উচিৎ নয়। ছেলেমেয়েদের নৈতিক শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে মা-বাবাদেরকে আরো বেশী সতর্ক হওয়া উচিত। আল্লাহ আমাদেরকে ও আমাদের সন্তানদেরকে হিফাযত করুন।

সন্তানদের ভবিষ্যৎ পেশা সম্পর্কে সতর্কতা

আমার সন্তানের ভবিষ্যৎ পেশা (প্রফেশন) কী হবে তা ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার আগে থেকেই চিন্তা করতে হবে। পেশা নির্ধারণের ব্যাপারে একটি পরিষ্কার নীতিমালা অবলম্বন করা উচিত আর তা হচ্ছে আয়-রোজগারের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা। কারণ হালাল ইনকাম ফরয আর ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত হচ্ছে হালাল ইনকাম। এই ক্ষেত্রে অবশ্যই তাকওয়ার পরীক্ষা।

ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে কিভাবে পেশা নির্ধারণ করবো? সহজ formula হচ্ছে, যে সকল পেশা সরাসরি হারামের সাথে যুক্ত তা জায়িয নয়। যেমন কোন কোম্পানী হারাম পণ্য উৎপাদন করে বা বিক্রি করে বা ডেলিভারি করে বা সূদের কারবার করে ইত্যাদি। এছাড়াও যে সকল পেশায় মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয় বা বেপর্দা হতে হয় তাও হালাল নয়। যেমন একটি উদাহরণ দেয়া যাক ঃ আমরা মনে করতে পারি যে ব্যাংকে চাকুরী করাতো ভাল কিন্তু এখানে খেয়াল করার বিষয় হচ্ছে যে সূদী ব্যাংকের মূল বিজনেজ হচ্ছে সূদ, সূদ হচ্ছে তাদের প্রডাকসনস বা উৎপাদন, তাই যে কোম্পানীর উৎপাদন হারাম সেখানে চাকুরী করাও হারাম। তবে এই বিষয়ে কারো সাথে যেন তর্কে না যাই বরং তর্ক এড়িয়ে তাকওয়ার উপর জ্ঞান অর্জন করলে পরিষ্কার উত্তর পওয়া যাবে।

ফেইসবুক সম্পর্কে সাবধানতা

আমাদের সন্তানেরা দিন-দিন ফেইসবুকে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছি যে এর নেগেটিভ দিকগুলো কী কী? অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে এই আসক্তি এতো প্রকোট আকার ধারণ করেছে যে তা কন্ট্রলের বাইরে চলে যাচ্ছে। এই বিষয়ে আমাদের মা-বাবাদের সময় থাকতে

সচেতন হওয়া উচিত। বাংলাদেশ সরকারের তথ্যপ্রযুক্তির উপর একটি আইন রয়েছে এবং এই আইনের আওতায় অনেক ফেইসবুক ব্যবহারকারী এরেষ্টও হচ্ছে। তাদের অপরাধ তারা ফেইসবুকের মাধ্যমে কাউকে হুমকী দিয়েছে বা ভুল তথ্য প্রচার করে সমাজে অরাজকতা সৃষ্টি করেছে। ফেইসবুকের মাধ্যমে অনেক ছেলেমেয়েরাই নিজেরা নিজেদের নানা রকম বিপদ ডেকে আনছে।

আরো একটি জঘন্নতম কাজ হচ্ছে হাইস্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা তাদের নানা ভঙ্গির ছবি ফেইসবুকে আপলোড করে রাখছে এবং দুনিয়ার নারী-পুরুষ তা দেখছে এবং উপভোগ করছে। কোন একটি পারিবারিক প্রোগাম হলেই তার ছবিগুলো ছেলেমেয়েরা ফেইসবুকে আপলোড করে দেয় এবং পারিবারিক ছবিগুলোর মাঝে মেয়েদের ছবিগুলোও থাকে এবং পরপুরুষরা তা উপভোগ করে (নাউযুবিল্লাহ)। মনে রাখতে হবে এই কাজ ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম।

আমার সন্তান কি সাইবার বুলিং-এর শিকার?

সাইবার বুলিং (Cyber bullying) হচ্ছে অনলাইনে অর্থাৎ ইন্টারনেটে একজন (বা বহুজন) যখন আরেকজনকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে সেটা। এর বেশীর ভাগই হয়ে থাকে কিশোর/কিশোরী যারা স্কুল-কলেজে যায় তাদের ক্ষেত্রে। অনেক বাবা/মাই জানেন যে স্কুলে গেলে কোনো কোনো ছেলেমেয়ে স্কুলের অন্যদের হাসি-ঠাট্টা বা তামাশার শিকার হয়। কিছু কিছু সময় এই ঠাট্টাতামাশা মারামারিতেও রূপান্তরিত হয়। এ বিষয়গুলো যে কোনো বাচ্চার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে এবং তাদের মানসিকভাবে বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে একটি বাধার সৃষ্টি করে। অনেক স্কুলে এই ব্যাপারগুলো হরহামেশাই ঘটে থাকে। এগুলো ছেলেমেয়েদের স্কুল জীবনের একটা অংশ হিসেবেই অনেক মা/বাবা ধরে নেন। স্কুলে কেউ তাদের বাচ্চাকে নিয়ে হাসাহাসি করলে যদি সেই বাচ্চা তার মা/বাবাকে বলে তাহলে তারা বুঝতে পারে। অথবা স্কুলে অন্য কোনো বাচ্চার সাথে মারামারি হলে তার কোনো চিহ্ন দেখে মা-বাবা সেটা বুঝতে পারেন।

কিন্তু সাইবার বুলিং হয় ইন্টারনেট জগতে। বর্তমান যুগে অতি ছোটকাল থেকেই বাচ্চারা ইন্টারনেট ব্যবহার শুরু করছে। এর মাধ্যমে যেমন তারা পৃথিবীর অনেক কিছু সম্পর্কে জানছে, তেমনি ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাদের বন্ধু/বান্ধবের

সংখ্যা বাড়াচ্ছে। অনলাইন জগৎ এই অপরিণত বয়সের ছেলেমেয়েরা অনেকের সাথে বন্ধুসুলভ মনোভাব নেয়। একটি সময়ে এই অপরিণত বয়সের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা ইমেইলে, এসএমএসএ অথবা তাদের ফেইসবুক পেজে ঘৃণামূলক বা অবজ্ঞামূলক মেসেজ পাবে যা তাদের মনে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলতে পারে। হেয় প্রতিপন্ন করার স্বার্থে পাঠানো এই মেসেজগুলো অনেক কিশোর/কিশোরী তাদের বাবা মার সাথে আলাপ করতে চায় না।

২০১৩ সালে ক্যানাডার বৃটিশ কলম্বিয়া অঙ্গরাজ্যে ১৫ বছরের একজন কিশোরী আত্মহত্যা করে। সে ছিল স্কুলে এবং অনলাইনে সাইবার বুলিং এর শিকার। কিশোরীটির জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ইউটিউবে তার অভিজ্ঞতার কথাগুলো প্রকাশ করে নিজের জীবন নেবার আগে। দুই বছর আগে আমেরিকার নিউজার্সিতে ১৮ বছরের একজন স্কুলছাত্র ব্রীজ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে যখন সে জানতে পারে অন্য একজন ছাত্র তার অগোচরে কম্পিউটারের ক্যামেরা দিয়ে তার ছবি ধারণ করেছে এগুলো শুধুমাত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঘটনাগুলোর একাংশ মাত্র। আমাদের দক্ষিণ এশীয় সমাজ ব্যবস্থার আলোকে অনেক ছেলেমেয়েরাই হয়তো তাদের মা-বাবার সাথে এদেশীয় ছেলেমেয়েদের তুলনায় অনেক কাছাকাছি। তবুও এ ব্যাপারে আমাদের সচেতন থাকা উচিত।

একজন মা-বাবা কিভাবে বুঝবেন যে তার সন্তান এই সাইবার বুলিং এর শিকার? যখন একজন মা-বাবা খেয়াল করবেন যে তার সন্তান, যে ঘন্টার পর ঘন্টা কম্পিউটারে বসে থাকত, সে কম্পিউটারে আর বসতে চাইছে না; যে সেলফোনে বা মোবাইলে কথা বলত অবিরল সে আর ফোন ধরছে না, ইত্যাদি। অনেক সময় সন্তানেরা তাদের সমস্যাগুলো, বিশেষ করে যেটা সাইবার বুলিং এর মতো মানসিক একটা ব্যাপার। মা-বাবার সাথে ভাগাভাগী করতে চায় না। অতএব সন্তানের যে কোন ধরনের অভ্যাসের পরিবর্তন হলে মা-বাবাকে তা খেয়াল করতে হবে। সন্তানের সাথে বসে এ ব্যাপারে কথা বলতে হবে। কথা বলার সময়, সন্তানের সমস্ত কথাগুলো শোনার জন্য দরকার হলে নিজেকে বোকা বোকা ভাব নিতে হবে। প্রশ্ন করে করে সব কিছু জানতে হবে। যদি সন্তানের অভ্যাস পরিবর্তনগুলোর কারণ সাইবার বুলিং হয় তাহলে সে ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ব্যাপারে অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে কিছু করাটা ঠিক হবে না। যদি সাইবার বুলিং সন্তানের স্কুলের কারও কাছ থেকে হয়ে থাকে, তবে স্কুল কর্তৃপক্ষকে তা জানানো হবে প্রথম পদক্ষেপে। সন্তানকে মানসিকভাবে সার্পোট দিতে হবে এ সময়। সন্তানেরা যাতে সাইবার বুলিং এর

শিকার না হয় সে জন্য সকল মা-বাবা তাদের সন্তানদের প্রথম ইন্টারনেট ব্যবহারের ভালো এবং খারাপ দু'টি দিক নিয়েই উপদেশ দিতে পারেন এবং অনলাইনে বন্ধু বাছাই করার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম বেঁধে দিতে পারেন। অপরিচিত কারোর সাথে যাতে আমার সন্তান যোগাযোগ না রাখে সে ব্যাপারে তাদেরকে বুঝাতে হবে। সন্তানদের সাথে খোলাখুলিভাবে আলোচনার পাশাপাশি সামাজিকভাবে আমাদেরও উচিৎ একে অপরকে অবগত করা এ ব্যাপারে।

ইসলামিক ওয়েবসাইট ভিজিট করার বিষয়ে সতর্কতা

মা-বাবাদের বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় যে এখন ইন্টারনেটের যুগ, আমাদের সন্তানেরা সাধারণত ইন্টারনেট থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে ইনফরমেশন নিয়ে থাকে। মনে রাখতে হবে যে আমাদের শত্রুরা ইসলামের নামে অসংখ্য ওয়েবসাইট তৈরী করে রেখেছে আমাদের নতুন জেনারেশনকে বিভ্রান্ত করার জন্য। তাই অবশ্যই এ সকল ভুয়া ওয়েবসাইট থেকে আমাদের সন্তানদেরকে দূরে রাখতে হবে। এবং এর পাশাপাশি authentic ওয়েবসাইট থেকে ইসলামী তথ্য সংগ্রহ করার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের সন্তানদের জন্য যে বইটি আমরা প্রকাশ করেছি (এই সিরিজের ৮ নং বই) সেখানে বেশ কিছু authentic ওয়েবসাইট এর ঠিকানা দেয়া হয়েছে যা থেকে আমরা বিষয়ভিত্তিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারি।

এছাড়া আরো সতর্ক বিষয় হচ্ছে যে, আহমেদিয়া কাদিয়ানী, ইসমাইলিয়া আগা খান, শিয়া সম্প্রদায়, সুফী সম্প্রদায়েরও অনেক ওয়েব সাইট রয়েছে। সেখানে তারা তাদের ফিলোসফি তুলে ধরেছে। এই ওয়েবসাইটগুলো দেখে মনে হবে ইসলামের কিন্তু যেহেতু তাদের সাথে মূল ইসলামের আকীদাগত পার্থক্য রয়েছে তাই এগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে।

আমার সন্তান কি কার্টুন পছন্দ করে?

এ যুগের বাচ্চারা জন্মের পর যখন থেকে একটু-একটু বুঝতে শিখে তখন থেকেই টিভিতে নানারকম কার্টুন দেখতে খুব পছন্দ করে। দিন-দিন এমন অবস্থা হয় যে তাদেরকে টিভির সামনে থেকে সরানোই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। যাহোক, কার্টুন দেখা কোন অন্যায় না। কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হচ্ছে তারা যে কার্টুনগুলো দেখছে তার মধ্যে কী আছে? এই সকল কার্টুন থেকে তারা

কী শিক্ষা পাচ্ছে? আমরা মা-বাবারা কি কখনো এই বিষয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখেছি? বিষয়টা বুঝার জন্য আমাদের সন্তানদের সাথে সাথে আমরাও কি কখনো এই সকল কার্টুন মনোযোগ দিয়ে দেখেছি? বুঝার সুবিধার্থে নিম্নে কিছু ফেমাস কার্টুনের দৃশ্যের উদাহরণ তুলে ধরা হলো ঃ

“Jasmine was in a forbidden relationship with Aladin, Snow White lived alone with seven men, Pinocchio was a liar, Robin Hood was a thief, Tarzan walked without clothes on, a stranger kissed sleeping beauty and she married him, Cinderella lied and sneaked out at night to attend a party. Almost 70 of the Tom and Jerry cartoon shows that Tom is extensively addicted to the opposite sex. And he reacts strangely when he sees anyone of the opposite sex. Guardians are not weary of what it represents but the kids are watching this very easily with family!”

আমি কি জানি পৃথিবী কোন দিকে যাচ্ছে? ইবলিস শয়তান সূরা আ’রাফের ১৭ নং আয়াতে open declaration দিয়ে বলেছে “আমি মানব জাতির ডান দিক থেকে আসবো, বাম দিক থেকে আসবো, সামনের দিক থেকে আসবো, পিছন দিক থেকে আসবো”। তাই ইবলিস শয়তান কিন্তু বসে নেই, সে তার declaration অনুযায়ী দিনরাত তার এজেন্ডাগুলো বাস্তবায়নের জন্য পরিশ্রম করে যাচ্ছে। সে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী একটিভ। আমরা জানি মক্কায় আবু জাহিল এবং তার গ্রুপ যখন রসূল ﷺ -কে হত্যার চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেই মিটিং-এর সভাপতি ছিল স্বয়ং ইবলিস (শয়তান)।

আমাদের দুর্বল ঈমানের কারণে আজকে এই পৃথিবীকে লীড দিচ্ছে ইবলিস শয়তান। এই শয়তানের এজেন্ডাগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে মানুষকে Free thinker করে তোলা, অর্থাৎ সে কোন ধর্মেই বিশ্বাস করবে না। সে না হবে খ্রীষ্টান, না হবে ঈহুদী বা না হবে মুসলিম। কিন্তু তার অবচেতন মন তো আর শূন্য থাকবে না আর সেই শূন্য জায়গাটা দখল করে নিবে ইবলিশ (শয়তান), তখন তার প্রভু হবে শয়তান।

এখন আমরা আবার বাচ্চাদের কার্টুনে ফিরে যাই। এখনকার কার্টুনগুলো খুবই উন্নতমানের, সব দিক থেকে হাইকোয়ালিটি সম্পন্ন। আমি কি জানি এই উন্নত

কার্টুনগুলোর writer, analyst, designer, programmer কারা? তাদের background বা qualifications কী? এরা একেকজন PhD holder, Doctorate। Medical Science অনুযায়ী বাচ্চাদের ব্রেইন থাকে active, এরা এই বয়সে যা দেখে বা শুনে সেভাবেই তাদের ব্রেইন ডেভেলপ হতে থাকে। আর এই সকল কার্টুনের মাধ্যমে তাদের ব্রেইনে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে এক ধরনের virtual poison যার বিষক্রিয়ায় তারা আক্রান্ত হয়ে দিন-দিন বেড়ে উঠছে এবং Free thinking-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই বিষয়ে আরো গভীরে বিস্তারিত জানার জন্য আমাদেরকে কিছু পড়াশোনা করতে হবে। এই জন্য Youtube-এ দেখতে পারি ঃ "The Arrivals"-এর সিরিজগুলো।

আমি কি এখনো সাবধান হবো না? ইউরোপ-আমেরিকা-ক্যানাডা এখন বিভিন্ন বয়সের বাচ্চাদের উপযোগী ইসলামিক কার্টুন এবং মুভি তৈরী করে যা অনায়াসেই আমি সংগ্রহ করতে পারি এবং সন্তানদেরকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি। নিম্মে একটা লিষ্ট দেয়া হলো ঃ

- Prophet Muhammed (PBUH) - Cartoon
- Kindness in Islam - Sound Vision
- Finding Courage - Sound Vision
- Happy to be a Muslim - Sound Vision
- Zakat Helps Everyone - Sound Vision
- Ramadan Mubarak - Sound Vision
- Home Sweet Home - Sound Vision
- One Big Family - Sound Vision
- Adam's World - Sound Vision
- Yaa Rabb - Music Video
- Songs of Asmaa Allah Al Husna - Music Video
- Lion of Ain - Jaloot - Cartoon
- Alif is for Asad - Alphabet Learning Video with song
- The Story of Prophet Musa - Cartoon
- Animals Allah Created Learning Video
- The Wealth of Salah - Cartoon
- Salam's Journey - Cartoon
- Habil Kabil - Cartoon
- Prophet Stories

আরো কিছু বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্কতা

সতর্কতা এক ঃ সলাতের জন্য পূর্ব শর্ত কাপড় পাক হওয়া এবং শরীর পাক হওয়া। ছেলেমেয়েরা যখন স্কুল-কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে থাকে বা কোন শপিং মলে থাকে তখন তারা বাথরুমে গেলে শরীর এবং কাপড় পাকের কথা চিন্তা করে না। তাই আমাদের সন্তানদেরকে এই বিষয়ে সতর্ক করে দিতে হবে যেন তারা সঠিকভাবে পানি এবং টয়লেট পেপার ব্যবহার করে।

সতর্কতা দুই ঃ কাপড়-চোপড় যেন সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এছাড়া শরীর থেকে যেন কোন প্রকার দুর্গন্ধ বের না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে এবং এজন্য নিয়মিত ডিওডোরান্ট অবশ্যই ব্যবহার করা উচিত। সাথে সবসময় একটা আতর বা বডি স্প্রে রাখা ভাল। কারণ এই ছোট-খাট বিষয়গুলোও একজন মুসলিমের চারিত্রিক পরিচয় বহন করে। আমার সন্তানদেরকে যেন বলি বাসায় ঢুকে কাপড়-চোপড় চেইঞ্জ করে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে।

সতর্কতা তিন ঃ সন্তানের বয়স দশ হলেই তাদের বিছানা আলাদা করে দিতে হবে, এটিই ইসলামের নিয়ম। যেমন, সর্বপ্রথমে মা-বাবার থেকে আলাদা করে দিতে হবে। ভাই বোনকে এক বিছানায় ঘুমাতে না দেয়া। দুই ভাইকে এক বিছানায় ঘুমাতে না দেয়া। দুই বোনকে এক বিছানায় ঘুমাতে না দেয়া। অর্থাৎ একটি সন্তানকে একটি করে আলাদা বিছানা দেয়া, হতে পারে সেটা একই রুমে বা বাংক বেড (দুইতলা খাট)।

সতর্কতা চার ঃ তারা যখন পাবলিক প্লেসে থাকে যেমন ঃ স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, শপিং মল ইত্যাদিতে এবং তারা যেন কোনভাবেই ওয়াক্তের সলাত মিস না করে। আশেপাশে যদি কোন মসজিদ না থাকে তাহলে যেন তারা অবশ্যই ওয়াক্তের সলাত কোন জায়গায় পরিষ্কার কাগজ বিছিয়ে পড়ে নেয়। অথবা মাঠে ঘাসের উপর সলাত আদায় করে নেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে যে কোন শুকনো জায়গাতেই সলাত আদায় করা যায়। এছাড়া জুতা পড়েও সলাত আদায় করা যায়। এটা সহীহ বুখারীর হাদীস। ইবলিশ (শয়তান) কিন্তু কোন ভাবেই চাইবে না যে আমার সন্তান সঠিক সময়ে সলাত আদায় করুক।

সতর্কতা পাঁচ ঃ কোন বাসায় বেড়াতে গেলে কোন কোন বাচ্চা হয়তো খাওয়ার ক্ষেত্রে সৌজন্যতা রক্ষা করে না, তারা খাই খাই ভাব দেখায়। এতে হয়তো মা-বাবা লজ্জার মধ্যে পরে যান। এই বিষয়েও সন্তানকে বাসায় থাকতেই ট্রেনিং দিতে হবে যে মানুষের বাসায় গিয়ে কী আচরণ করতে হবে, কীভাবে খেতে হবে বা অন্যের বাসায় সোফায় উঠে লাফানো ঠিক না ইত্যাদি। কিন্তু তারপরেও যদি শিশু সন্তান খাওয়া-দাওয়া নিয়ে সৌজন্যতা রক্ষা না করে, তাকে মারা যাবে না বা এ জন্য তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না। বিষয়টিকে আরো ধৈর্যের সাথে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

সতর্কতা ছয় ঃ আজকাল কলেজ-ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া অনেক ছেলেরাই ছোট বাচ্চাদের মতো বাসায় হাফ প্যান্ট পরে। মনে রাখতে হবে একটি ছেলে বালেগ হয়ে যাওয়ার পর থেকে অর্থাৎ যখন থেকে তার উপর সলাত (নামায) ফরয হয়ে যায় তখন থেকে সে আর অন্যের সামনে হাফপ্যান্ট পরতে পারবে না। ছেলেদের জন্য পোষাকের সীমা হলো নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত সবসময় ঢাকা থাকতে হবে। অন্যের সামনে এই অংশটুকু কখনোই খুলতে পারবে না।

সতর্কতা সাত ঃ এ যুগের ছেলেমেয়েরা প্রচুর সময় নষ্ট করে থাকে কম্পিউটার গেইম খেলে। মা-বাবারা দেখা যায় এ বিষয়ে খুব একটা দৃষ্টি দেন না। আমি কি কখনো হিসেব করে দেখেছি যে সে ২৪ ঘন্টার মধ্যে কত ঘন্টা সময় ব্যয় করছে শিক্ষার কাজে আর কত ঘন্টা সময় ব্যয় করছে কম্পিউটার গেইম খেলে? গেইম অবশ্যই খেলবে কিন্তু তার একটা লিমিট থাকা প্রয়োজন। তাই কম্পিউটার গেইম খেলার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে রুটিন করে দেয়া উচিত। সব সময় শারীরিক খেলার দিকে উৎসাহিত করা উচিত।

সতর্কতা আট ঃ হারাম হলেও দেখা যাচ্ছে অনেক মুসলিম ছেলেমেয়েরাই বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড তৈরী করে থাকে। যেসব মা-বাবারা এই বিষয়টা পছন্দ করেন না তখন তারা ব্যাপারটা কোন ক্রমেই মা-বাবাকে জানতে এবং বুঝতে দেয় না। তারা সাধারণত বাসার বাইরে মেলামেশা করে থাকে এবং সুযোগ বুঝে চাহিদা অনুযায়ী একে অপরের সাথে নিয়মিত অনৈতিক কাজ করে থাকে যা ইসলামে নিষেধ। এবং এই অবৈধ সম্পর্কের কারণে একসময়ে পরিবারের জীবনে নেমে আসে চরম দুঃখ। এই ব্যাপারে আমাকে হিকমতের সাথে (technicaly) এগুতে হবে। তাই আমাকে অনেক বেশী সতর্ক হতে হবে। তারা সাধারণত কম্পিউটারে চ্যাটিং করে এবং মোবাইলে এস.এম.এস পাঠিয়ে

থাকে। খুব মনোযোগ সহকারে যদি আমরা এই বইটি পড়ি তাহলে দেখতে পাবো যে এই বইয়ের আগা-গোড়াই এই সমস্যার সমাধান দেয়া হয়েছে।

সতর্কতা নয় ঃ আবার দেখা গেছে যে অনেক মা-বাবা ইসলামিক মাইন্ডের এবং তাদের বাসায়ও ইসলামী পরিবেশ। মা-বাবা মেয়েকে সাধারণত হিজাব পড়িয়েই স্কুলে পাঠিয়ে থাকে কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে যে মেয়ে বাসার বাইরে গিয়ে হিজাব খুলে ফেলছে। আবার স্কুল শেষে যখন বাসায় ফিরছে তখন বাসার কাছাকাছি এসে হিজাব পরে নিচ্ছে পরিবারকে সন্তুষ্ট করার জন্যে। মনে রাখতে হবে যে আমার বাসায় হয়তো ইসলামী পরিবেশ কিন্তু বাসার বাইরে তো আর ইসলামী পরিবেশ না। আমার এই ছেলে বা মেয়ে দিনের বেশীরভাগ সময়ই থাকে বাসার বাইরে। তাই এই ব্যাপারেও সতর্ক হতে হবে, সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে।

সতর্কতা দশ ঃ আমরা মাঝেমধ্যেই সন্তানের স্কুলে গিয়ে খোঁজ-খবর নিতে পারি। যদি কোন সন্তান দেখে যে তার বাবা বা মা নিয়মিত স্কুলে এসে খোঁজ-খবর নেয় তাহলে সে বাচ্চা অবশ্যই অন্যদের থেকে আলাদা হবে, সে সহজে কোন অন্যায়ের দিকে এগুবে না, একটু হলেও তার বুক কাঁপবে। আর যদি দেখে যে তার বাবা বা মা কেউ-ই কোনদিন স্কুলে আসেন না কোন খোঁজ-খবর নেন না তাহলে তারা কোন না কোনভাবে লাইনচ্যুত হয়ে যেতে পারে, তারা জীবন নিয়ে অন্যরকম চিন্তা করতে পারে। কারণ টিনএইজ লাইফটাই হচ্ছে প্রচন্ড রিস্কি লাইফ।

আমার সন্তানদের জন্য বিশেষ সচেতনতা

হে আমার রব! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান করুন।
(সূরা সাফফাত ঃ ১০০)

চ্যাপ্টার ১২

ইসলামের দৃষ্টিতে সেক্স

মানব জীবনের লক্ষ্যই উন্নতি ও প্রগতি। এ উদ্দেশ্য কখনও বল্গাহীনভাবে কামনা চরিতার্থের মাধ্যমে লাভ করা যায় না। স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলাম প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হওয়া পছন্দ করে না। যদি প্রত্যেকেই তার কামনা-বাসনার দাসে পরিণত হয় তা হলে মানবজীবন ভুল পথে পরিচালিত হতে বাধ্য। যে ব্যক্তি সব সময় তার দৈহিক কামনা চরিতার্থ করতে লিপ্ত থাকে তার জীবনীশক্তি অতি দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এরূপ প্রবৃত্তির অনুচরদের দ্বারা সমাজ-জীবনের কোন মহৎ কাজ সম্ভব নয়।

বল্গাহীন ভোগ-বিলাসের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি যাতে তার নিজের, অপরের, তার পরিবারের বা তার সমাজের কোন ক্ষতিসাধন বা বিপর্যয় ঘটাতে না পারে, তার জন্যই ইসলামের রীতিনীতি রচিত হয়েছে। এ সকল রীতিনীতি পালন সাপেক্ষে জীবনের সকল সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করার পূর্ণ অধিকার মুসলিমদের রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম সকলকে পূর্ণভাবে জীবনকে ভোগ করার আহ্বান জানায়। ইসলাম মানুষের বৈধ যৌনস্পৃহাকে স্বাভাবিক বলে স্বীকার করে নেয়।

আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত ঃ "রসূল ﷺ আমাদেরকে বিয়ে করতে নির্দেশ দিতেন। আর অবিবাহিত নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করা থেকে খুব কড়া ভাষায় নিষেধ করতেন।" (মুসনাদে আহমাদ) রসূল ﷺ আরোও বলেছেন ঃ "কুমারিত্ব ও অবিবাহিত নিঃসঙ্গ জীবনযাপনের কোন প্রথা ইসলামের মধ্যে নেই।" (মুসনাদে আহমাদ)

রসূল ﷺ আর এক হাদীসে উল্লেখ করেছেন ঃ "মানুষ তার স্ত্রী-সহবাসের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পুরস্কার লাভ করে।" একজন সাহাবী বিস্ময় প্রকাশ করে

রসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন লোক স্ত্রীসহবাস করার জন্য পুরস্কার পাবে, এ কেমন কথা?" উত্তরে রসূল ﷺ বললেন, "তুমি কি বুঝতে পারছো না যে, যদি সে এরূপ না করে নিষিদ্ধভাবে এই কাজে লিপ্ত হত তাহলে সে গুনাহের কাজ করত? সুতরাং যদি সে আইনানুযায়ী স্ত্রীসহবাস করে তাহলে সে পুরস্কার পাবে।" (সহীহ মুসলিম)

এ কারণেই ইসলামের বিধান মতে যৌনপ্রবৃত্তি দমনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। যদি যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌনস্পৃহার উন্মেষ হয় তাহলে তাতে দূষণীয় কিছু নেই এবং তাদের পক্ষে এরূপ স্পৃহাকে কদর্য বা অন্যায় কিছু মনে করারও কারণ নেই। ইসলাম যা চায় তা হচ্ছে এই যে, যুব-সম্প্রদায়ের উচিত তাদের স্পৃহাকে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং উপযুক্ত সময় ও পরিবেশ না আসা পর্যন্ত যৌনকার্য হতে বিরত থাকা। এরূপ বিরতির অর্থ দমন নয়। যারা যৌনবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের মতামতকে গুরুত্ব দেন, তারা নিশ্চয়ই জানেন যে তিনিও বলেছেন যে, যৌনকার্য হতে নিবৃত্তি ও যৌনস্পৃহা দমন এক কথা নয়। যৌন প্রবৃত্তি দমন করলে স্নায়ুর উপর অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে নানাবিধ মানসিক পীড়ার উৎপত্তি ঘটে। সাময়িকভাবে যৌনকার্য হতে বিরত থাকলে এরূপ স্নায়বিক ও মানসিক পীড়ার কোন কারণ ঘটে না।

যৌনস্পৃহাকে সুনিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্য এই নয় যে, জীবনের সর্বপ্রকার আনন্দ ও ভোগ থেকে দূরে থাকতে হবে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে শক্তিশালী ও উন্নত করতে হলে সর্বক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা আবশ্যক। যদি প্রত্যেকেই ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে থাকে তাহলে জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলার অভাব ঘটে। এরূপ বিশৃঙ্খল জাতিকে বাইরের শত্রু সহজেই কাবু করতে পারে। প্রত্যেক জাতিকে তাই আত্মত্যাগ, আত্মসংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়। ইসলামের শিক্ষাও তাই। উদাহরণ স্বরূপ সিয়ামের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, যারা ধর্মের অনুশাসন মেনে চলে তাদের জীবন খুবই পীড়াদায়ক, কারণ পাপের ভয় সব সময় তাদেরকে বিব্রত করে রাখে। তবে ইসলামের বেলায় একথা খাটে না, কারণ ইসলামে শাস্তির চেয়ে আল্লাহর মাগফিরাতের কথাই বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

তাওবার উপকারিতা আল্লাহর রহমত এবং মাগফিরাত সম্পর্কে আল কুরআনে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর রহমতের দ্বার কত প্রশস্ত! তিনি শুধু তাওবাকারীর তাওবাই গ্রহণ করেন না, তাকে তিনি পুরস্কৃতও করেন এবং সৎ ও

আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত করেন। এখানে জেনে রাখা দরকার তাওবা মানে "আল্লাহর দিকে ফিরে আসা", অর্থাৎ তাওবা করার পর ঐ অন্যায় কাজটি দ্বিতীয়বার না করার প্রতিজ্ঞা করা এবং তা পালনে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা।

যৌনতা বিষয়ে শিশুর প্রশ্নের জবাব দেয়া

যৌনতা বিষয়ে শিশুর প্রশ্নের জবাব কেন দেব?

- যৌনতা বিষয়ে শিশুরা কৌতুহলী।
- শিশুরা সবসময় তাদের চারপাশের সবকিছু দেখে দ্বিধান্বিত হয়ে থাকে।
- সবসময় প্রশ্ন করার জন্য আহ্বান করলে, শিশুটি কোনকিছুতে দ্বিধান্বিত হলে ভুল উৎসের কাছে যাবার বদলে সে মা-বাবার কাছে আসবে।
- এটি একটি শিশুদের সাথে বাবা মায়ের সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তোলার পথ। বিশেষ করে, যদি শিশুকালে শিশুর এই ধরনের প্রশ্নের জবাব দেয়া হয় তাহলে সে যখন কিশোর-কিশোরী হবে তখনও মা-বাবার কাছেই তার গোপন ও জরুরী বিষয়ে পরামর্শ চাইবে।
- আমাদের শিশুদের সাথে সংস্কৃতিক, পরিবারিক মূল্যবোধকে জানানোর এটি একটি উত্তম সুযোগ।

যৌনতা বিষয়ে শিশুর প্রশ্নের জবাব কখন দেব?

- যখন তারা প্রশ্ন করে। আমরা উত্তরটি না জানলেও বলতে পারি ঃ 'উত্তম প্রশ্ন, পরে আমরা এ ব্যাপারে কথা বলব'। পরে জবাব দিতে হবে।
- যখন আমরা সুযোগ পাই, যেমন টিভি দেখা - গর্ভবতী মহিলাকে দেখলে, পোষাপ্রাণীর বাচ্চা হলে।
- তাদের বলার জন্য চাপ না দিয়ে-তারা যদি উত্তরটি নাও জানে তবু প্রশ্ন করা যেতে পারে 'তুমি কি মনে কর? তুমি এ সম্পর্কে কি জান?' এতে বুঝায় যে যখনি প্রশ্ন আসবে তখনই তাদের সাথে কথা বলতে পারা যাবে।
- সময় ও সুযোগ বুঝে (দু'জনের জন্যই স্বস্তিকর, ঘুমানোর সময় অথবা একসাথে হাঁটার সময়) জবাব দিতে হবে।
- সবচেয়ে উত্তম হয় যদি পরিবারে নিয়মিত (সর্বনিম্ন সাপ্তাহিক হলে ভালো) ইসলামী আলোচনার আয়োজন করা যায়। এই নিয়মিত আয়োজনে ইসলামের নানা বিধান নিয়ে আলোচনা করা হবে। যদি এমন আয়োজন করা যায়, তাহলে একটা সময় এমনিতেই ফরয গোসল, স্বপ্ন দোষ

ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা আসতেই হবে এবং তখন ক্রমান্বয়ে উপযুক্ত সময়ে সেক্স এডুকেশন ইন ইসলাম নিয়েও আলোচনা করা সহজ হবে।

যৌনতা বিষয়ে শিশুর প্রশ্নের জবাব দেয়ার সময় আমরা কী বলব?

- উত্তরটি সঠিক, সৎ, সংক্ষিপ্ত এবং সরলভাবে দিতে হবে।
- বয়স অনুযায়ী তারা যাতে বুঝতে পারে সে অনুযায়ী শব্দ এবং ধারণার ব্যবহার করে উত্তর দিতে হবে।
- সাংস্কৃতিক, পরিবারিক, ধর্মীয় মূল্যবোধ যা আমার জন্য মূল্যবান সেগুলি শিক্ষা দিতে হবে।
- তার বয়সে যেটি গ্রহণযোগ্য এবং উপযুক্ত সেগুলি শিক্ষা দিতে হবে।
- শিশুদের জানাতে হবে যে তারা আমার কাছে প্রশ্ন নিয়ে আসলে আমি খুশি হই, বিরক্ত হই না।
- বক্তৃতামূলক এবং রাগান্বিত কথাবার্তা এড়িয়ে চলতে হবে।
- শালীনতা শিক্ষার মাধ্যমে এ বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

যৌনতা বিষয়ে শিশুর প্রশ্নের জবাব কিভাবে দিতে হবে?

- মা-বাবা শিশুর যৌনতা নিয়ে আলোচনা চর্চার জন্য এই চারটি পয়েন্ট মনে রাখা প্রয়োজন ঃ ক) তথ্য; খ) মূল্যবোধ; গ) দায়িত্ব; ঘ) আত্মশক্তি।
- যখন আমি অস্বস্তি বা বিব্রত বোধ করি তা চিহ্নিত করতে হবে।
- কিভাবে প্রশ্নটির জবাব দিতে হবে তা ভাবার জন্য সময় নিতে হবে।
- যখন আমি কোন প্রশ্নের উত্তর না জানি, তা উল্লেখ করতে হবে।
- প্রশ্নের সঠিক উত্তর বের করে দু'জনে একসাথে তা পড়া যেতে পারে।
- শিশুদের ইতিবাচক ভঙ্গীতে প্রশ্নের জবাব দেয়া উচিত।

যৌনসুস্থতাসহ শিশুর বিকাশের জন্য যেভাবে মা-বাবা সাহায্য করতে পারে

১. ছেলেমেয়েদের জন্য যত্নশীল স্পর্শ এবং আন্তরিকতা তাদের নিজেদের এবং অন্যান্যদের সম্পর্কে ইতিবাচক অনুভূতি তৈরী করবে।
২. আমাদের মেয়ে অথবা ছেলে শিশুদের জন্য সমান সুযোগ দেয়া।

৩. শিশুর সাথে এমন ভাষায় এবং এমনভাবে কথা বলতে হবে যা উভয় লিংগকে বুঝায়।
৪. ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে হবে যে তার শরীরের গোপনাংগসমূহ হল তার শরীরের ব্যক্তিগত অংশ।
৫. ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে হবে যে তার শরীর একটি নিজস্ব বিষয় এবং ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে যে কে তার শরীর স্পর্শ করবে বা স্পর্শ করতে পারবে না।
৬. প্রশ্ন করার জন্য আমাদের শিশুদের স্বাগত জানিয়ে বলতে হবে যে, 'তুমি প্রশ্ন করেছ বলে আমি খুশি হয়েছি'। যদি উত্তরটি আমাদের জানা না থাকে, ছেলেমেয়েদের নিয়ে একসাথে আমরা উত্তরটি খুঁজতে পারি।
৭. পরিবারের সকলকে (শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক) তাদের অনুভূতি জানানোর জন্য উৎসাহিত করা যেতে পারে।
৮. বাচ্চাদের বুঝতে সাহায্য করতে হবে যে কিভাবে তাদের ব্যবহার অন্যদের প্রভাবিত করতে পারে।
৯. বাচ্চাদের তার বয়স এবং বিকাশ অনুযায়ী সীমা নির্ধারণ করতে ও উপযুক্ত আচরণ সম্পর্কে শিখতে সাহায্য করতে হবে।
১০. কোনটি উপযুক্ত আচরণ এবং কোনটি উপযুক্ত আচরণ নয় তা বাচ্চাদের সরাসরি ও স্পষ্ট করে বলা যাতে তারা অপরাধবোধে না ভোগে বা লজ্জা না পায়।
১১. আমাদের শিশুদের জন্য ইতিবাচক আদর্শ ভূমিকা পালনকারী হতে হবে।

বাবা মায়ের জন্য আরো কিছু টিপস

১. যখনি আমার চোখের বাইরে আমার শিশুটি খেলতে শিখে তখন থেকেই তার প্রকৃত ভালমন্দ শুরু হয়।

২. বাচ্চাকে শুধু এই বলা ঠিক না যে তার শুধু "না" বলার অধিকার আছে। বাচ্চাদের অধিকারকেও শ্রদ্ধা করতে হবে। বাচ্চাকে জোড় করে চুমু, সুড়সুড়ি দেয়া, কোন অপছন্দনীয় ভাষা বা প্রাপ্তবয়স্কের সাথে সময় কাটাতে দেয়া যাবে না।

৩. বাচ্চার কারণ বিহীন প্রতিক্রিয়া বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। যেমন - "আমি আমার প্রাইভেট শিক্ষককে পছন্দ করি না", হয়তো কথাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকেত বহন করে। সেটি গুরুত্ব সহকারে শুনতে হবে।

৪. জরুরী পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানোর জন্য বাচ্চার সাথে "কী হবে" খেলা যেতে পারে। "যদি তুমি একা থাক তাহলে কী হবে?" "যদি তুমি তোমার জুতাটি স্কুলে হারিয়ে ফেল এবং বাইরে বৃষ্টি পরতে থাকে, কী হবে?" কেউ যদি তার গোপনাংগ স্পর্শ করতে বলে তা হলে কী হবে। ইত্যাদি।

৫. বাচ্চাকে বলতে হবে যে, কোন প্রাপ্তবয়স্ক কেউ শিশুকে কোন বিষয় গোপন রাখতে বললে তা যেন সে না করে তার বাবা-মাকে বলে।

৬. স্বস্তিকরভাবে যৌন নির্যাতন কথাটি বর্ণনা করতে হবে। যেমন- "তোমার ব্যক্তিগত স্থান স্পর্শ করলে" অন্যান্য উদাহরণ ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন - "তোমাকে চুম্বন করলে বা জড়িয়ে ধরলে" এবং "তোমার কাপড় খুলে ফেলতে বললে"। ইত্যাদি।

৭. বাচ্চা নির্যাতনের কথা বললে, আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে ধীরে ধীরে বিস্তারিত জানার জন্য চেষ্টা করতে হবে। বলা যেতে পারে "আমি খুশি হয়েছি যে তুমি সেটা আমাকে জানিয়েছো" এবং "এতে তোমার কোন দোষ নেই।"

যৌন হয়রানী থেকে সতর্কতা

অনেক বাচ্চাকেই Sexual abuse করা হয়ে থাকে বড়দের দ্বারা যেমন, বাবার বন্ধু, চাচা, মামা, খালু, প্রাইভেট শিক্ষক, আরবী শিক্ষক, বেবীসিটার ইত্যাদি। কিন্তু বাচ্চারা অনেক সময়ই তা মা-বাবার কাছে বলে না বা বলতে ভুলে যায়। তাই এই বিষয়ে প্রতিটি মা-বাবাকেই সতর্ক থাকা উচিত। দু'টি সত্য ঘটনা শিক্ষণীয় হিসেবে তুলে ধরা যাক।

ঘটনা-১ ঃ ঘটনার সত্য-মিথ্যা জানি না, একদিন Toronto Sun পত্রিকায় পরিচিত এক মুরুব্বীর ছবিসহ নিউজ ছাপা হয়েছে, নিউজের বিষয় বস্তু Child Abuse। মুরুব্বীর বয়স ৭০ এর কাছাকাছি এবং অবসর প্রাপ্ত। তিনি এই অবসর সময়ে বাচ্চাদেরকে বিভিন্ন বাসায়-বাসায় আরবী পড়ান। যাহোক হয়তো কোন বাচ্চাকে নিয়ে দুর্ঘটনা একদিন ঘটে গেছে। অবাক হওয়ার কিছু নেই, এই ধরনের ঘটনা অনেক-ই ঘটে থাকে কিন্তু আমরা তা জানি না। তাই এই বিষয়ে বাবা-মাকে সচেতন থাকতে হবে।

ঘটনা-২ ঃ এই ঘটনাটি আরো হৃদয়বিদারক। বাচ্চাটির মা-বাবা দু'জনেই হয়তো চাকুরী করেন তাই বাচ্চাকে পরিচিত এক ভাবীর বাসায় নিয়মিত দিয়ে

যান বেবী সিটিং এর জন্য। ভাবী কোন একদিন বাচ্চাটিকে তার হাজব্যান্ডের কাছে রেখে দোকানে গিয়েছেন কিছু আনার জন্যে। ঐদিন বাসায় আর কেউ-ই ছিল না এবং ইবলিস শয়তানের প্ররোচনায় দুর্ঘটনা তখনই ঘটে গেছে। ভাবীর হাজব্যান্ড তার অনুপস্থিতিতে বাচ্চাটিকে রেপ করেছে এবং অতিরিক্ত ব্লিডিং হওয়াতে অবশেষে বাচ্চাটি মারা গেছে। ভয়ের কিছু নেই, হয়তো এই ধরনের ঘটনা বিরল। সব বেবীসিটারকেও সন্দেহ করা ঠিক নয় তবে সতর্ক থাকা ভাল।

পর্নগ্র্যাফি থেকে দূরে রাখার বিষয়ে কতিপয় পদক্ষেপ

সব যুগেই পর্নগ্র্যাফি এক অভিশাপ ছিলো। তবে ইন্টারনেটের কারণে এটার সহজলভ্যতা অনেক বেশি হওয়ায় এই বিষয়ে আমাদের অধিক সচেতনতা দরকার। এই অভিশাপ সকলের জন্য। যারাই এটাতে আসক্ত হয়েছে তারাই মানসিক এবং শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং সমাজও কোনো না কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বিশেষ করে যুবসমাজ আজ ধ্বংসের মুখে। আমাদের সন্তানেরা তাদের ব্যক্তিগত হিফাযতে পর্নগ্র্যাফি পোষ্টার বা ম্যাগাজিন রাখতে পারে। সে ক্লাসে বসলেও তার মনের মধ্যে বারে বারে ঐ এডাল্ট চিত্র ভেসে আসবে। আবার দেখা যাচ্ছে ইন্টারনেটে ইমেইল বা অন্য কোন কাজ করতে থাকলে মনিটরের আশে পাশে দিয়ে এডাল্ট ছবি যুক্ত বিজ্ঞাপন চলে আসে যা আমাদের সন্তানদের মনের মধ্যে প্রভাব ফেলে।

এই পর্নগ্র্যাফির এডিকশন মাদক আসক্তির মতোই, কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশী। এখন এর প্রতিকার কী? ইন্টারনেটের প্রতিকার খুব সহজ। ইন্টারনেট সার্ভিস প্রভাইডাররা সাধারণত ভাইরাস প্রটেকশনের সাথে সাথে এডাল্ট প্রোটেকশন সার্ভিসও দিয়ে থাকে। এই সার্ভিসের জন্য তাদের টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলতে হবে। তারা ভাইরাস গার্ডের সাথে সাথে পর্নগ্র্যাফি প্রটেকশনও দিয়ে দিবে তারপর থেকে কেউ চাইলেও পর্নগ্র্যাফি ব্রাউজ করতে পারবে না। কিন্তু এডাল্ট ম্যাগাজিন বা পোষ্টার বা ডিভিডি এগুলো থেকে সন্তানদেরকে দুরে রাখতে হলে মা-বাবাদেরকে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। সন্তানদের সাথে যথেষ্ট সময় দিতে হবে বন্ধুর মতো।

আজকাল বাংলাদেশের প্রতিটি ছেলেমেয়ের হাতের মুঠোয় মোবাইল ফোন, স্মার্ট ফোন। এর যেমন ভাল দিক রয়েছে তেমনি খারাপ দিকও রয়েছে। যেমন ছেলেমেয়েরা তাদের মোবাইলের মধ্যে পর্নগ্র্যাফি কপি করে রেখে দেয় এবং

অবসর সময়ে তা উপভোগ করে থাকে। এই দৃশ্য আজ বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জেও পৌঁছে গেছে। অনেক দোকানে এই পর্নগ্র্যাফির কপি বিক্রি করে এবং উঠতি বয়সের ছেলেরা তা নিজেদের মোবাইলে সেইভ করে নিয়ে একে অপরের সাথে শেয়ার করে এবং আনন্দ উপভোগ করে। এভাবে এই উঠতি বয়সের ছেলেগুলো দিন দিন মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যায়।

পর্নগ্র্যাফিতে আসক্তির সমস্যা ও সমাধান

পর্নগ্র্যাফির বিষয়টি আল্লাহ এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন যে বলে শেষ করা যাবে না। ঠিক যেভাবে তিনটি আয়াত রয়েছে শেষ বিচারের দিন নিয়ে। "যারা তাদের যৌন-অঙ্গকে সংযত রাখে। কিন্তু তাদের স্ত্রী অথবা মালিকানা ভুক্ত দাসীদের বেলায় তিরস্কৃত হবে না। অতএব যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।"

শয়তানের প্ররোচনায় পরে বড়রাও অনেক সময় এগুলো দেখে থাকে। হয়তো মাঝেমধ্যে কারো কারো এ নিয়ে অনুশোচনা হয়, কিন্তু আবারও ফিরে যায় এসবে, বিশেষ করে যখন সে একা একা থাকে। কেউ হয়তো ভাবছে 'অন্তত আমিতো আর কারো ক্ষতি করছি না। অন্য কাউকে দেখাচ্ছি না। নিজেই দেখছি। এটুকু ঠিকই আছে।' কিন্তু আমরা কি জানি? ভিতরে ভিতরে আমাদের আত্মা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ভিতরে আর আত্মার কিছু বাকি নেই। আমাদের সলাত হয়ে গেছে অন্তঃসারশূন্য। সে সময়ে আমি একটুও চোখের পানি ফেলতে পারবো না, কেননা আমার হৃদয়ে আল্লাহর ভয় এতটাই কমে গেছে। কারণ হলো সেসব নোংরামি, যা আমরা দেখে আসছি এতদিন ধরে। তারই ফল। এগুলো আমাদেরকে পরিণত করছে মানুষরূপে পশু হিসেবে। যার ফলে আমি এখন আর স্বাভাবিকভাবে তাকাতেও পারি না, যখন একজন নারী আমার পাশ দিয়ে যায়-আমি যেন দেখি একটি মাংসপিন্ড হেঁটে যাচ্ছে। সারাক্ষণ আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। চোখ নামিয়ে ফেলতে আমার রীতিমত কষ্ট হয়। যখন আমি শপিং মলে কিংবা ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে অথবা কর্মক্ষেত্রে, নয়তো রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, আমি পারছি না নিজেকে সংযত রাখতে। এমন একটা সুযোগও আমি হাতছাড়া করি না যা দিয়ে আমার অন্তরটা কলুষিত হয়। আমি পরিপূর্ণভাবে একজন আসক্ত ব্যক্তি। তারপরও আমি আর সলাতে মন আনবো কিভাবে? কোন্ দুনিয়ায় আছি আমরা? কোন্ দুনিয়ায় বাস করছি? এই সমস্যা শুধু ভাইদের নয় এই সমস্যা রয়েছে অনেক বোনেরও। এটা একটা

অত্যন্ত দুঃখজনক বাস্তবতা। এটা সেই যুদ্ধ যেটা আমাদের অন্তরকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

এই জিনিস আমাদের ঘর পর্যন্ত প্রবেশের পথ করে নিচ্ছে, রাস্তা বানিয়ে নিচ্ছে। আমিও চাই আমার সন্তানদেরকে এসবের হাত থেকে যতদুর সম্ভব বাঁচাতে। যখন আমার সন্তান স্কুলে যায় তখন তার সহপাঠি কোন মোবাইল ডিভাইসে ওইসব নিয়ে এসে তা সবাইকে দেখায়। এটা খুবই বাস্তব একটা চিত্র। মোটেও কাল্পনিক কিছু নয়। এগুলো থেকে পালানোর কোন পথ নেই, এগুলো সব জায়গায় সবখানে। আর আমাদের বেলায় কী হয়? আমরা হয়তো কম্পিউটারে ইন্টারনেটে একটা ভিডিও দেখছি, হঠাৎ মনিটরের পাশ দিয়ে একটা বাজে জিনিস চলে আসে তা দেখে হয়তো কেউ ক্লিক করে বসেন, শেষ পর্যন্ত গিয়ে ঐ জঘন্য কিছু একটা দেখে ফেলেন। এগুলোকে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের কোন বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা নেই। ফেইসবুক, ইউটিউব, টুইটার, ইন্টারনেট এগুলো যদি আমরা সঠিক কাজে লাগাতে না পারি তাহলে এগুলো ব্যবহার করা ঠিক হবে না। এটাই বাস্তব। এগুলো এখন অক্সিজেনের মত একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। আমাদের তরুণদের সাথে এই বিষয়ে পরিস্কার কথাবার্তা বলতে হবে। তাদেরকে শিখাতে হবে কিভাবে এসব জিনিসকে মোকাবিলা করতে হয়। কিভাবে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। আমরা অনেকেই মা-মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী মিলে যা ইচ্ছা তাই দেখছি। এগুলোকে বন্ধ করতে হবে। লজ্জাস্থান বন্ধ করা মানেই যে, ব্যাভিচার/যিনা না করা তা কিন্তু নয়। এর মানে সেসকল জিনিস যা আমাদের ঐ প্রলোভনের দিকে ধাবিত করে, ঠেলে নিয়ে যায় সেগুলোতে।

আমরা যেন আমাদের ১১-১২ বছরের বাচ্চাকে কখনও স্মার্টফোন না দেই। যদি তারা না দেয়ার কারণে অখুশী হয় এতে চিন্তার কোন কারণ নেই। আপনার আর আমার সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ তা হল আমাদের অন্তর, আমাদের হৃদয়। আর এই নির্লজ্জতা আমাদের অন্তরটাকে ধ্বংস করে দেয়। সবচেয়ে মূল্যবান যে জিনিসটি আমাকে সুরক্ষিত রাখতে হবে তা হলো আমাদের ঈমান। আমার সলাত কী যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে? নাকি আমি এভাবেই চলতে থাকব আর ভান করব? আমাকে শিখতে হবে, কীভাবে আমার প্রতিক্রিয়াটি সঠিক হবে। আর সঠিক প্রতিক্রিয়া তখনই আসবে যখন আমরা সলাত-কায়েমকারীদের অন্তর্ভুক্ত হব।

সন্তান প্রতিপালনে সূরা লুকমানে উপদেশাবলী এবং শিশুদের প্রতি নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর ভালোবাসার নমুনা

চ্যাপ্টার ১৩

আল কুরআনে সূরা লুকমানে লুকমান ﷺ তার ছেলেকে যেভাবে উপদেশ দিয়েছেন, তা এই চ্যাপ্টারে আলোচনা করা হল। কারণ, লুকমান ﷺ তার ছেলেকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা এতই সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য যে, মহান আল্লাহ তা'আলা তা কুরআনে কারীমে উল্লেখ করে কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত উম্মতের জন্য তিলাওয়াতে উপযোগী করে দিয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা আদর্শ করে রেখেছেন। লুকমান ﷺ কোন নাবী বা রসূল ছিলেন না, তিনি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। নিয়মিত জ্ঞান চর্চা করতেন এবং তার সন্তানদের সঠিক শিক্ষা দিতেন তাই মহান আল্লাহ তাকে খুব ভালবাসতেন এবং তাঁর নামে কুরআনে একটি সূরা নাযিল করেছেন। লুকমান ﷺ তাঁর ছেলেকে যে উপদেশগুলো দিয়েছেন তা নিম্নরূপ ঃ মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুরআনে বলেন ঃ

প্রথম উপদেশ

"হে প্রিয় বৎস আল্লাহর সাথে শিরক করো না, নিশ্চয় শিরক হল বড় যুলুম।"
(সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৩)

এখানে লক্ষণীয় যে, প্রথমে তিনি তার ছেলেকে শিরক হতে বিরত থাকতে নির্দেশ দেন। একজন সন্তান তাকে অবশ্যই জীবনের শুরু থেকেই আল্লাহর তাওহীদে বিশ্বাসী হতে হবে। কারণ, তাওহীদই হল, যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতার একমাত্র মাপকাঠি। তাই তিনি তার ছেলেকে প্রথমেই বলেন, আল্লাহর সাথে ইবাদতে কাউকে শরিক করা হতে বেঁচে থাক। যেমন, মৃত ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করা অথবা পীর-আউলিয়াদের নিকট সাহায্য চাওয়া বা প্রার্থনা করা ইত্যাদি। এছাড়াও এ ধরনের আরও অনেক কাজ আছে,

যেগুলো শিরকের অন্তর্ভুক্ত। রসূল ﷺ বলেন, "দু'আ হল ইবাদত"। সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টির নিকট দু'আ করার অর্থ হল, সৃষ্টির ইবাদত করা, যা শিরক।

দ্বিতীয় উপদেশ

"আর আমি মানুষকে তার মা-বাবার ব্যাপারে [সদাচরণের] নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে, তাকে গর্ভেধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে; সুতরাং আমার ও তোমার মা-বাবার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন-তো আমার কাছেই।" (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৪)

তিনি তার ছেলেকে কেবলই আল্লাহর ইবাদত করা ও তার সাথে ইবাদতে কাউকে শরীক করতে নিষেধ করার সাথে সাথে মা-বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করার উপদেশ দেন। কারণ, মা-বাবার অধিকার সন্তানের উপর অনেক বেশি। মা তাকে গর্ভধারণ, দুধ-পান ও ছোটবেলা লালন-পালন করতে গিয়ে অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা ও কষ্ট সইতে হয়েছে। তারপর তার বাবাও লালন-পালনের ব্যয়ভার, লেখাপড়া ও ইত্যাদির দায়িত্ব নিয়ে তাকে বড় করছেন এবং মানুষ হিসেবে গড়ে তুলছেন। তাই তারা উভয়ই সন্তানের পক্ষ হতে অভিসম্পাত ও সেবা পাওয়ার অধিকার রাখে।

তৃতীয় উপদেশ

"আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না। এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে। আর আমার অনুসরণ কর তার পথ, যে আমার অভিমুখী হয়। তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, যা তোমরা করতে।" (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৫)

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, 'যদি তারা উভয়ে তোমাকে পরিপূর্ণরূপে তাদের দ্বীনের আনুগত্য করতে বাধ্য করে, তাহলে তুমি তাদের কথা শুনবে না এবং তাদের নির্দেশ মানবে না। তবে তারা যদি দ্বীন কবুল না করে, তারপরও তুমি তাদের সাথে কোন প্রকার অশালীন আচরণ করবে না। তাদের দ্বীন কবুল না করা তাদের সাথে দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করাতে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। তুমি

তাদের সাথে ভালো ব্যবহারই করবে। আর মু'মিনদের পথের অনুসারী হবে, তাতে কোন অসুবিধা নেই।'

চতুর্থ উপদেশ

"হে আমার প্রিয় বৎস! নিশ্চয় তা [পাপ-পুণ্য] যদি সরিষা দানার পরিমাণও হয়, অতঃপর তা থাকে পাথরের মধ্যে কিংবা আসমানসমূহে বা জমিনের মধ্যে, আল্লাহ তাও নিয়ে আসবেন; নিশ্চয় আল্লাহ সুক্ষ্মদর্শী সর্বজ্ঞ।" (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৬)

আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, অন্যায় বা অপরাধ যতই ছোট হোক না কেন, এমনকি যদি তা শস্য-দানার সমপরিমাণও হয়, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তা'আলা তা উপস্থিত করবেন এবং মীযানে (দাড়িপাল্লায়) ওজন দেয়া হবে। যদি তা ভালো হয়, তাহলে তাকে ভালো প্রতিদান দেয়া হবে। আর যদি খারাপ কাজ হয়, তাহলে তাকে খারাপ প্রতিদান দেয়া হবে।

পঞ্চম উপদেশ

"হে আমার প্রিয় বৎস সলাত কায়েম কর।"
(সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৭)

তুমি সলাতকে তার ওয়াজিবসমূহ ও রোকনসমূহ সহ আদায় কর। সমাজে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত প্রতিষ্ঠা কর।

ষষ্ঠ উপদেশ

"তুমি ভালো কাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ হতে মানুষকে নিষেধ কর।"
(সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৭)

বিনম্র ভাষায় তাদের দাওয়াত দাও, যাদের তুমি দাওয়াত দেবে তাদের সাথে কোন প্রকার কঠোরতা করো না।

সপ্তম উপদেশ

"যে তোমাকে কষ্ট দেয় তার উপর তুমি ধৈর্যধারণ কর।"
(সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৭)

এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, যারা ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং খারাপ ও মন্দ কাজ হতে মানুষকে নিষেধ করবে তাকে অবশ্যই কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে এবং অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে। যখন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে তখন তোমার করণীয় হল, ধৈর্যধারণ করা ও ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া।

অষ্টম উপদেশ

"আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।"
(সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৮)

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, 'যখন তুমি কথা বল অথবা তোমার সাথে মানুষ কথা বলে, তখন তুমি মানুষকে ঘৃণা করে অথবা তাদের উপর অহংকার করে, তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে না। তাদের সাথে হাস্যোজ্জ্বল হয়ে কথা বলবে। তাদের জন্য উদার হতে হবে এবং তাদের প্রতি বিনয়ী হতে হবে।'

নবম উপদেশ

"অহংকার ও হঠকারিতা প্রদর্শন করে জমিনে হাটা চলা করবে না।"
(সূরা লুকমান, ৩১ ঃ১৮)

কারণ, এ ধরনের কাজের কারণে আল্লাহ কাউকে পছন্দ করেন না। এ কারণেই মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" অর্থাৎ যারা নিজেকে বড় মনে করে এবং অন্যদের উপর বড়াই করে, মহান আল্লাহ তা'আলা তাদের পছন্দ করেন না।

দশম উপদেশ

"আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর।"
(সূরা লুকমান, ৩১ ঃ১৯)

খুব স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে হবে। খুব দ্রুত হাঁটা যাবে না আবার একেবারে মন্থর গতিতেও না। মধ্যম পন্থায় চলাচল করতে হবে অর্থাৎ নমনীয় হয়ে হাটা চলা করা অভ্যাস করতে হবে। চলাচলে যেন কোন প্রকার সীমালঙ্ঘন না হয়।

একাদশ উপদেশ

নরম সুরে কথা বলা। লুকমান হাকীম তার ছেলেকে নরম সুরে কথা বলতে আদেশ দেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,
"তোমার আওয়াজ নিচু কর।" আর কথায় কথায় কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করবে না। বিনা প্রয়োজনে তুমি তোমার আওয়াজকে উঁচু করো না। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, *"নিশ্চয় সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল, গাধার আওয়াজ।" (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৯)*

আল্লামা মুজাহিদ বলেন, 'সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল, গাধার আওয়াজ। অর্থাৎ, মানুষ যখন বিকট আওয়াজে কথা বলে, তখন তার আওয়াজ গাধার আওয়াজের সাদৃশ্য হয়। আর এ ধরনের বিকট আওয়াজ মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট একেবারেই অপছন্দনীয়। বিকট আওয়াজকে গাঁধার আওয়াজের সাথে তুলনা করা প্রমাণ করে যে, বিকট শব্দে আওয়াজ করে কথা বলা হারাম। কারণ, মহান আল্লাহ তা'আলা এর জন্য একটি খারাপ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।

পূর্বের আয়াতগুলো থেকে শিক্ষা

১. আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয়, যেসব কাজ করলে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত হয়, বাবা তার ছেলেকে সে বিষয়ে উপদেশ দিবে।

২. উপদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে তাওহীদের উপর অটল ও অবিচল থাকতে হবে এবং শিরক থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেবে। কারণ, শিরক হল, এমন এক যুলুম বা অন্যায়, যা মানুষের সমস্ত আমলকে নষ্ট করে দেয়।

৩. প্রত্যেক ঈমানদারের উপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব হল, মা-বাবার কৃতজ্ঞতা বা শুকরিয়া আদায় করা। তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা, কোন প্রকার খারাপ ব্যবহার না করা এবং তাদের উভয়ের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা।

৪. আল্লাহর নাফরমানি হয় না, এমন কোন নির্দেশ যদি মা-বাবা দিয়ে থাকে, তখন সন্তানের উপর তাদের নির্দেশের আনুগত্য করা ওয়াজিব। আর যদি আল্লাহর নাফরমানি হয়, তবে তা পালন করা ওয়াজিব নয়।

৫. প্রত্যেক ঈমানদারের উপর কর্তব্য হল, আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী মু'মিন-মুসলিমদের পথের অনুকরণ করা, আর অমুসলিম ও বিদ'আতীদের পথ পরিহার করা।

৬. প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করতে হবে। আর মনে রাখতে হবে কোন নেক-কাজ তা যতই ছোট হোক না কেন, তাকে তুচ্ছ মনে করা যাবে না এবং কোন খারাপ-কাজ তা যতই ছোট হোক না কেন, তাকে ছোট মনে করা যাবে না এবং তা পরিহার করতে কোন প্রকার অবহেলা করা চলবে না।

৭. সলাতের যাবতীয় আরকান ও ওয়াজিবগুলিসহ সলাত কায়েম করা প্রত্যেক মু'মিনের উপর ওয়াজিব; সলাতে কোন প্রকার অবহেলা না করে, সলাতের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া এবং খুশুর সাথে সলাত আদায় করা ওয়াজিব।

৮. জেনেশুনে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করতে হবে। না জেনে এ কাজ করলে অনেক সময় হিতে-বিপরীত হয়। আর মনে রাখতে হবে, এ দায়িত্ব পালনে যথা সম্ভব নমনীয়তা প্রদর্শন করতে হবে; কঠোরতা পরিহার করতে হবে।

৯. মনে রাখতে হবে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে বারণকারীকে অবশ্যই ধৈর্যশীল হতে হবে। ধৈর্যের কোন বিকল্প নেই। ধৈর্য ধারণ করা হল একটি মহৎ কাজ। আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকেন।

১০. হাটা চলায় গর্ব ও অহংকার পরিহার করা। কারণ, অহংকার করা সম্পূর্ণ হারাম। যারা অহংকার ও বড়াই করে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না।

১১. হাটার সময় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে হাটতে হবে। খুব দ্রুত হাঁটা ঠিক নয় এবং একেবারে ধীর গতিতেও হাঁটা ঠিক নয়।

১২. প্রয়োজনের চেয়ে অধিক উচ্চ আওয়াজে কথা বলা হতে বিরত থাকতে হবে। কারণ, অধিক উচ্চ আওয়াজ বা চিৎকার করা হল গাধার স্বভাব। আর দুনিয়াতে গাধার আওয়াজ হল, সর্ব নিকৃষ্ট আওয়াজ।

শিশুদের প্রতি
নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর ভালোবাসা

নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর অন্তরে শিশুদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও অকৃত্রিম ভালোবাসা ছিল। একবার নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর কানে হুসাইন رضي الله عنه-এর কান্নার শব্দ এলো। এতে তিনি ভীষণভাবে ব্যথিত হলেন। তিনি ফাতিমা رضي الله عنها-কে বললেন, তুমি কি জান না, তার কান্না আমাকে কষ্ট দেয়? আনাস رضي الله عنه বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ শিশু-কিশোরদের কাছ দিয়ে যাতায়াতকালে তাদের সালাম করতেন। একবার রসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণদানের নিমিত্তে মিম্বরে আরোহণ করে দেখতে পেলেন যে, হাসান رضي الله عنه ও হুসাইন رضي الله عنه দৌড়াদৌড়ি করছেন এবং পা পিছলে পড়ে যাচ্ছেন। তিনি ভাষণদান বন্ধ করে মিম্বর থেকে নেমে এলেন। শিশু দু'টির দিকে অগ্রসর হয়ে দুই বাহুতে উঠিয়ে নিলেন। তারপর মিম্বরে আরোহণ করে বললেন, হে লোকসকল! তোমাদের ধন-সম্পদ এক পরীক্ষার বস্তু, আল্লাহর এ বাণী সত্যিই।

একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত আদায় করছিলেন। আর তখন হাসান رضي الله عنه ও হুসাইন رضي الله عنه এসে তাকে সিজদারত অবস্থায় পেয়ে একেবারে পিঠে চড়ে বসলেন। তিনি সিজদা দীর্ঘায়িত করলেন। আর তারা পিঠ থেকে না নামা পর্যন্ত তাদেরও নামিয়ে দিলেন না। রসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরালে সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা লক্ষ্য করলাম যে, আপনি সিজদা দীর্ঘায়িত করেছেন। তিনি উত্তরে বললেন, আমার নাতিদ্বয় আমাকে ঘোড়া বানিয়েছে। কাজেই তাদের তাড়াতাড়ি নামিয়ে দেয়াটা আমার পছন্দ হয়নি।

রসূলে কারীম ﷺ কখনো কখনো শিশুদের কান্না শুনতে পেলে সলাত সংক্ষেপ করে দিতেন। আনাস رضي الله عنه বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এর তুলনায় সন্তান-সন্ততির প্রতি অধিক স্নেহ-মমতা পোষণকারী আমি কাউকে দেখিনি। তার পুত্র ইবরাহীম رضي الله عنه মদিনার উঁচু স্থানে ধাত্রীমায়ের কাছে দুধপান করতেন। তিনি প্রায়ই সেখানে যেতেন এবং আমরাও তার সঙ্গে যেতাম। তিনি ওই ঘরে যেতেন অথচ সেই ঘরটি প্রায়ই ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। কারণ ইবরাহীমের ধাত্রী মায়ের স্বামী ছিলেন একজন কর্মকার। তিনি ইবরাহীমকে কোলে তুলে নিতেন এবং আদর করে চুমু দিতেন, এরপর চলে আসতেন। বর্ণনাকারী বলেন, যখন ইবরাহীম رضي الله عنه ইন্তেকাল করেন তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইবরাহীম আমার পুত্র। সে

দুধপানের বয়সে ইন্তেকাল করেছে। সুতরাং জান্নাতে তাকে একজন ধাত্রী দুধপান করাবে। নাবী ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদের যত্ন নেবে এবং তাদের আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেবে। নাবী ﷺ আরও বলেছেন, তোমরা শিশুদের ভালোবাস এবং তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর। তাদের সঙ্গে কোনো ওয়াদা করলে তা পূর্ণ কর। কেননা তারা তোমাদেরকে তাদের রিজিক সরবরাহকারী বলে জানে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে, নাবী ﷺ-এর অকৃত্রিম ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা, সবার জন্য নিবেদিত। তিনি শিশুদেরকে খুব ভালোবাসতেন, আদর করতেন, স্নেহ করতেন। কাজেই আমাদেরও শিশুদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা রাখা উচিত। ইবন উমর ﷺ বলেন, রসূলে কারীম ﷺ-এর নেতৃত্বাধীন কোনো যুদ্ধে এক মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। এতে রসূলে কারীম ﷺ গভীরভাবে মর্মাহত হন এবং নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেন। তিনি শিশুদের এতটাই ভালোবাসতেন অথচ আমাদের সমাজের শিশুরা কতই না অবহেলিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত। আমরা কি পারি না এই বঞ্চিত শিশুদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে সমাজকে কলঙ্কমুক্ত করতে?

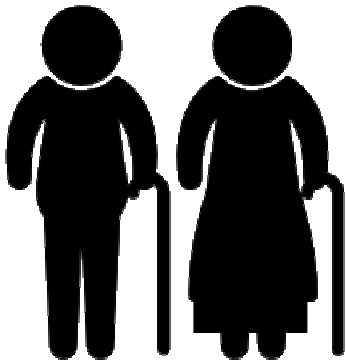

সন্তানের নিকট মা-বাবার গুরুত্ব

তোমরা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না
মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করো । (সূরা আন-নিসা ৪ ঃ ৩৬)

চ্যাপ্টার ১৪

মা দিবস ও বাবা দিবস
(Mother's Day - Father's Day)

পাশ্চাত্যের মতো আমাদের দেশেও মা দিবস ও বাবা দিবস চালু হয়েছে। এর ভাল দিকও রয়েছে যেমন এই দিনগুলোতে মা এবং বাবার অধিকার ও সন্তানের দায়িত্ব নিয়ে নানা রকম সেমিনার এবং পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হয়, এতে আমাদের সন্তানরা অনেক কিছু জানতে পারে। তবে এই বিষয়ে আমাদেরকে একটু সতর্ক থাকতে হবে। তারা যেন মা দিবস এবং বাবা দিবসে অভ্যস্ত হয়ে না যায়, এই কালচার যেন তাদের রক্তে প্রবেশ করতে না পারে।

আমরা জানি পাশ্চাত্যে ছেলেমেয়েরা ১৮ বছর হলেই মা-বাবাকে ছেড়ে চলে যায় এবং তারা পরবর্তী জীবনে একাকীই বড় হতে থাকে। একসময় মা-বাবার প্রতি তাদের আর টান থাকে না এবং তারা আর মা-বাবার কোন দায়িত্বও পালন করে না। দায়িত্ব পালন করাতো দূরের কথা অনেক সময় মা-বাবা জানেই না ছেলেমেয়েরা কোন দেশে বা কোন শহরে থাকে! তাই পাশ্চাত্য সমাজ দু'টি দিন নির্দিষ্ট করে নিয়েছে মা-বাবাকে স্মরণ করার জন্যে। একদিন বাবার জন্যে এবং অন্য আর একটি দিন মায়ের জন্যে। বছরের এই দিনটি আসলে ছেলেমেয়েরা মা-বাবাকে স্মরণ করে গ্রিটিংস কার্ড পাঠায়, গিফ্‌ট পাঠায়, ফুল পাঠায়, চকলেট/ক্যান্ডি পাঠায়। তারপর আবার একবছর কোন খোঁজ খবর রাখে না। কিন্তু ইসলাম তার উল্টো। মা-বাবার সমস্ত দায়-দায়িত্ব তাদের সন্তানদের উপর। সন্তানরা যদি এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে তাকে মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। ইসলামে প্রতিদিনই অর্থাৎ বছরের ৩৬৫ দিনই মা দিবস এবং বাবা দিবস।

একটি সত্য ঘটনা

টরন্টোতে বসবাসরত এক ভাইয়ের অভিজ্ঞতা। তিনি বাসে করে কোথাও যাচ্ছিলেন তার পাশের সিটে এক ক্যানাডিয়ান বৃদ্ধা মহিলা বসা ছিলেন। কিছু দূর যেতে যেতে কোন এক বাস স্টপ থেকে একটি যুবক ঐ একই বাসে উঠল, উঠে ঐ মহিলাকে দেখে বলল "হায় মম"। তারপর কিছু দূর যাওয়ার পর ঐ ছেলেটা আবার কোন একটা বাস স্টপে নেমে গেল। এবার ঐ ভদ্রলোক তার পাশের সিটের মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন 'ছেলেটা কে?' মহিলা বললেন এটা তারই ছেলে এবং এই শহরেই কোথাও থাকে, সে ঠিক জানে না। মহিলার ছেলে তাকে "হায় মম" বলেছে তাতেই মা বেজায় খুশি। এই মা তার ছেলের কাছে এর চেয়ে আর বেশী কিছু আশা করে না। কারণ এটাই এখানকার কালচার। Mother's Day-তে হয়তো ছেলে greetings card পাঠাবে এতেই মা খুশি। কারণ কালচার অনুযায়ীই সেও হয়তো তার মা-বাবাকে এভাবেই স্মরণ করেছে। উপরের এই ক্যানাডিয়ান ঘটনায় অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমাদের বাংলাদেশেও বৃদ্ধ মা-বাবাকে নিয়ে এর চেয়েও জঘন্নতম ঘটনা ঘটাচ্ছে তাদের ছেলেমেয়েরা আর তা পত্র-পত্রিকা খুললেই দেখা যায়। বাংলাদেশেও এখন অনেক বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইউটিউবে এর করুণ চিত্র রয়েছে।

মায়ের অধিকার

আমাদের বেশীরভাগ ছেলেমেয়েরাই জানে না কুরআন-হাদীসের আলোকে মা-বাবার গুরুত্ব। সর্বপ্রথমে বলতে হয় যে এখানে ছেলেমেয়েদের তেমন একটা দোষ নেই। কারণ মা-বাবারাই তাদেরকে এই বিষয়ে সময় থাকতে শিক্ষা দেয় না। প্রতিটি ছেলেমেয়ের জন্য বিষয়টি এতো গুরুত্বপূর্ণ যে তাদের জান্নাত ও জাহান্নাম নির্ভর করে মা-বাবার সন্তুষ্টির উপর। এই চ্যাপ্টারে আমরা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দেখবো যে মা-বাবাকে কীভাবে গুরুত্ব দিতে হয়। দেখবো আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ﷺ কীভাবে মা-বাবাকে সম্মান দিয়েছেন।

মায়ের অধিকার বাবার থেকে তিনগুণ বেশী

এক ব্যক্তি রসূল ﷺ-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! আমার সুন্দর আচরণের সবচেয়ে বেশী হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার

মা। সে জিজ্ঞেস করলো, অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে জিজ্ঞেস করলো, অতঃপর কে? নাবী কারীম ﷺ বললেন, তোমার মা। সে বললো, অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার বাবা। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

এই হাদীসে আমরা দেখলাম যে বাবার চেয়ে মায়ের গুরুত্ব তিনগুণ বেশী। এর কারণ সূরা লুকমান এবং সূরা আহকাফে বলা হয়েছে। মা এমন তিনটি কাজ করেন যা বাবা করেন না আর তা হচ্ছে- ১) নয়-দশ মাস গর্ভধারণ করা, ২) সন্তান প্রসব করা ৩) দুই বৎসর দুধ পান করানো। মা সন্তানের জন্য যে পরিমান কষ্ট করেন তা বাবা করেন না। তাই ইসলামে মাকে এতো বেশী সম্মান দেয়া হয়েছে। সন্তানের ক্ষেত্রে মায়ের গুরুত্ব এবং সম্মান যেমন বেশী তেমনি তার সন্তানের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যও বেশী। সন্তানের শিশুকালটি সাধারণত ঘরেই কাটে আর তার লালন-পালন এবং শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে মা-ই বেশী ভূমিকা রেখে থাকেন। তবে আজকাল বাবারাও এই বয়সে যথেষ্ট ভূমিকা রাখেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ
আমি মানুষকে মা-বাবার সাথে সুন্দর আচরণের তাগিদ দিয়েছি। তার মা অনেক কষ্টে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং বহু কষ্ট করে ভূমিষ্ট করেছে। গর্ভে ধারণ করা ও দুধ পান করানোর (কঠিন কাজের) সময়কাল হলো আড়াই বছর। (সূরা আল-আহকাফ ঃ ১৫)

তিনি আরো বলেন ঃ
আমি মানুষকে তার মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরের মধ্যে। এ নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (সূরা লুকমান ঃ ১৪)

বাহ্য ইবন হাকিম তাঁর বাবার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি কার সাথে সবচাইতে বেশী ভালো ব্যবহার করব? তিনি বললেন ঃ তোমার মায়ের সাথে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কার সাথে? তিনি বললেন ঃ তোমার মায়ের সাথে। তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন ঃ তারপর কার সাথে? এবারও তিনি বললেন ঃ তোমার মায়ের সাথে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কার সাথে?

তিনি বললেন ঃ তোমার বাবার সাথে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের সাথে। (ইবন মাজাহ)

মিকদাম ইবন মা'দিকারাব ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মায়েদের সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন। অর্থাৎ তাদের সাথে সদাচরণ করার আদেশ দিচ্ছেন। একথা তিনি তিনবার বললেন। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের বাবাদের সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয় আল্লাহ পর্যায়ক্রমে নিকটবর্তীদের সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন [সদাচারের]। (সহীহ মুসলিম)

সন্তানকে বুঝিয়ে বলতে হবে মা-বাবার সাথে ভাল আচরণে তাদের কী লাভ

মহান আল্লাহ আল কুরআনে বলেন ঃ

"আর তোমরা আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। এবং মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার কর।" (সূরা নিসা ঃ ৩৬)

"আল্লাহ আমাকে মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর তিনি আমাকে অত্যাচারী ও হতভাগা করেননি।" (সূরা মারইয়াম ঃ ৩২)

আল্লাহ বলেছেন ঃ
"এবং তোমার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অবশ্যই অন্যের ইবাদত করবে না এবং মা-বাবার সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে থাকবে। তাঁদের মধ্যে কোনো একজন অথবা উভয়েই যদি তোমাদের সামনে বার্ধক্যে পৌঁছে যায়, তাহলে তাঁদেরকে উহ্! শব্দ পর্যন্ত বলবে না এবং তাদেরকে ধমকের স্বরে অথবা গালি দিয়ে কোনো কথার জবাব দেবে না। বরং তাদের সাথে আদব ও সম্মানের সাথে কথা বলো এবং নরম ও বিনীতভাবে তাঁদের সামনে অবনত হয়ে থাক এবং তাঁদের জন্য এ ভাষায় দু'আ করতে থাক যেমন, হে আল্লাহ! তাঁদের উপর (এ অসহায় জীবনে) রহম করো। যেমন শিশুকালে (আমার সহায়হীন সময়ে) তাঁরা আমাকে রহমত ও অপত্যস্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩-২৪)

মা-বাবার আনুগত্য করা ওয়াজিব

আবূ দারদা ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন - রসূল ﷺ আমাকে ৯টি বিষয়ে ওয়াসিয়ত করেছেন ঃ

১) ইচ্ছাকৃতভাবে কখনো ফরয সলাত ত্যাগ করবে না। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সলাত ত্যাগ করল আল্লাহর কাছ থেকে সে জিম্মা মুক্ত হয়ে গেল ।
২) কেটে টুকরো টুকরো করলে অথবা আগুনে জ্বালিয়ে দিলেও আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না ।
৩) কখনো মদ্যপান করবে না, কারণ মদ্য হল সকল অপকর্মের চাবিকাঠি ।
৪) তোমার মা-বাবার আনুগত্য কর । যদি তারা তোমাকে তোমার দুনিয়ার (যাবতীয় কাজ) থেকে বের হয়ে যেতে বলে তবে তাদের নির্দেশ পালনার্থে তাই করবে ।
৫) যদিও তুমি তোমাকে অনেক বড় মনে কর তবুও তুমি যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পলায়ন করো না ।
৬) যদিও তুমি ধ্বংস হয়ে যাও তবুও তুমি যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পলায়ন করো না ।
৭) তোমার পরিবার বর্গের উপর হতে (আদবের) লাঠি উঠিয়ে নিও না ।
৮) তাদেরকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভয় দেখিও ।

(সহীহ বুখারী)

মা-বাবার সেবা-যত্ন আনুগত্য করা এবং সব সময়ই তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করা ওয়াজিব।

তবে মা-বাবা বার্ধক্যে উপনিত হলে তাঁরা সন্তানের সেবা-যত্নের প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন এবং সন্তানের দয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। অপরদিকে বার্ধক্যের চাপে মানুষের মেজাজ রুক্ষ ও খিটখিটে হয়ে যায় এবং বিবেক-বুদ্ধিও কম বেশী লোপ পায়। ফলে তাঁরা অবুঝ শিশুর মতো দাবী দাওয়া পেশ করতে থাকে, যা পূরণ করা সন্তানের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। তখন সন্তানের পক্ষ থেকে সামান্য বিমুখতাও তাঁদের অন্তরকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। পবিত্র কুরআন এসব অবস্থায় মা-বাবার সন্তুষ্টি ও তাঁদের সুখ-শান্তি বিধানের আদেশ দেয়ার সাথে সাথে সন্তানকে তার শৈশবকাল স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, আজ মা-বাবা যতটুকু তোমার মুখাপেক্ষী, এক সময় তুমি তাঁদের

এর চাইতেও বেশী মুখাপেক্ষী ছিলে। তখন তাঁরা যেমন তাঁদের আরাম আয়েশ হারাম করে তোমার চাওয়া পাওয়া ও বাহানা পূরণ করেছিলেন, তোমার অবুঝ কথাবার্তাকে স্নেহ মমতার আবরণ দ্বারা ঢেকে দিয়েছিলেন, তেমনি তাঁদের মুখাপেক্ষিতা ও অসহায়ত্বের দুঃসময়ে তাঁদের অবদানের কথা স্মরণ করে ঋণ পরিশোধ করা ও তাঁদের সেবা-যত্ন করা এবং তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করা তোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। আলোচ্য আয়াতসমূহে মা-বাবার বার্ধক্যে উপনীত হওয়া সম্পর্কিত কতিপয় আদেশ দান করা হয়েছে।

এক ঃ তাঁদেরকে উহ্-শব্দটিও বলা যাবে না। অর্থাৎ তাঁদের কথা শুনে সামান্যতম বিরক্তি প্রকাশ পায়, এমন ধরনের কোন শব্দ উচ্চারণ করা যাবে না। তাঁদের কথা যতই অযৌক্তিক ও কর্কশ হোক না কেন।

দুই ঃ মা-বাবার মর্যাদার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কথা-বার্তা বলার সময় তাদের মান-সম্মানের প্রতি খেয়াল রেখে কথা বলতে হবে। তাঁদের অযৌক্তিক দাবী ও রুক্ষ মেযায হাসিমুখে সইতে হবে। কোন সময় বিরক্ত হয়ে এমন কোন কথা উচ্চারণ করা যাবে না, যাতে তাঁরা সামান্যতমও মনে কষ্ট পায় এবং যা তাঁদের মান-সম্মানের পরিপন্থী হয়।

তিন ঃ এ আদেশে মা-বাবার সাথে কথা বলার আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাঁদের উভায়ের সাথে পরম ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতির সাথে নত ও বিনম্র স্বরে কথা বলতে হবে।

চার ঃ মা-বাবার সামনে নিজেকে নত ও বিনম্রভাবে পেশ করতে হবে। মা-বাবার প্রতি পূর্ণ আন্তরিকতা, মায়া-মমতা এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে নিজেকে ছোট করে তাঁদের সামনে হাজির হতে হবে।

পাঁচ ঃ মা-বাবার সন্তুষ্টি ও সুখ-শান্তি ষোল আনা নিশ্চিত করা মানুষের সাধ্যাতীত। কাজেই সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে তাঁদের জন্য দু'আ করতে হবে, আল্লাহ যেন অনুগ্রহ করে তাঁদের সকল সমস্যা সমাধান করে দেন এবং তাঁদের সব ধরনের কষ্ট দূর করে দেন। সর্বশেষ আদেশ হচ্ছে, মা-বাবার মৃত্যুর পরও তাঁদের জন্য অব্যাহতভাবে দু'আ করে যেতে হবে।

সাহাবী আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তার নাক ধুলি মলিন হোক! তার নাক ধুলি মলিন হোক! তার নাক ধুলি মলিন হোক (অর্থাৎ সে ধ্বংস হোক) জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! কে সে?

তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি মা-বাবা উভয়কে অথবা তাঁদের কোন একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেলো অথচ সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না। (সহীহ মুসলিম)

কা'ব ইবন 'উজরা ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা মিম্বরের কাছে এসো জামায়েত হও। আমরা সকলে মিম্বরের কাছে এসে জামায়েত হলাম। তিনি মিম্বরের প্রথম ধাপে আরোহন করে বললেন ঃ আমীন। দ্বিতীয় ধাপে আরোহন করে পুনরায় বললেন আমীন। তৃতীয় ধাপে আরোহন করে আবারো বললেন ঃ আমীন। তিনি মিম্বার থেকে অবতরণ করার পর আমরা তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, আজ আমরা আপনার কাছ থেকে এমন কিছু কথা শুনেছি যা ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি। তিনি বললেন ঃ জিবরাইল (এইমাত্র) আমাকে এসে বললেন ঃ সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে রমাদান মাস পেয়েছে, অথচ তার গুনাহ মাফ হয়নি। আমি বললাম আমীন (আল্লাহ কুবল করুন)। আমি দ্বিতীয় ধাপে আরোহণ করলে তিনি (জিবরাঈল) বললেন ঃ সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হলো, অথচ সে দুরূদ পড়ল না। আমি বললাম ঃ আমীন। আমি মিম্বারের তৃতীয় ধাপে আরোহন করলে জিবরাঈল বললেন ঃ সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে মা-বাবা উভয়কে অথবা তাঁদের কোন একজনকে পেল, কিন্তু তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালো না। আমি বললাম ঃ আমিন। (সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ বৃদ্ধ বয়সে মানুষ দ্রুত মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। শরীর ক্রমাগত শক্তিহীন, দুর্বল ও নিস্তেজ হতে থাকে। কর্মক্ষমতা ও আত্ম নির্ভরশীলতা হারিয়ে ফেলে। এমনকি এক পর্যায়ে চলা-ফেরা করার ক্ষমতাও তাদের থাকে না। তখন দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব তাঁদেরকে গ্রাস করে ফেলে। ফলে তাঁরা পরনির্ভরশীল তথা সন্তান-সন্ততির উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অপর দিকে বার্ধক্যের চাপে ও চতুর্মূখী রোগ যাতনায় তাঁদের মেজায খিটখিটে, কথা-বার্তা কর্কশ, আচার-আচরণ রূঢ় হয়ে যায়। এ সময়টা হয় মানুষের জন্য চরম দুর্দিন। বান্দার এ অসহায় ও দুর্দিনে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি বিশেষ করুণার হাত প্রসারিত করেন এবং দয়া ও রহমতের দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। ফলে সন্তানের জন্য মা-বাবার সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁদের অসন্তুষ্টিকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি হিসেবে পরিগণিত করা হয় এবং তাঁদেরকে সন্তানের জন্য জান্নাত ও জাহান্নাম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। কারণ মা-বাবার এ কঠিন

মুহূর্তে তাঁরা যে সন্তানের প্রতি সন্তুষ্ট হন আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তার জন্য জান্নাত নির্ধারণ করে দেন।

পক্ষান্তরে যে সন্তান তার অস্তিত্ব, জন্ম, শৈশব ও কৈশোর জীবনে তার জন্য মা-বাবার এ চরম অসহায় অবস্থায় তাঁদের সেবা-যত্নে আত্মনিয়োগ করার পরিবর্তে তাঁদের অবাধ্য হয় এবং তাঁদের অবাধ্যতা করে ও তাঁদের মনে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হয়ে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করে দেন।

বৃদ্ধ মা-বাবাকে বা তাদের কোন একজনকে পেয়েও যারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারেনি তারা ধ্বংস হোক- রসূল ﷺ-এর কাছে এ কথাটা জিবরাঈল ﷺ বললেও এ কথাটা জিবরাঈল ﷺ-এর নয় বরং এটা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্ত। জিবরাঈল ﷺ হচ্ছেন বাণী বাহক মাত্র। আল্লাহ তা'আলার এ সিদ্ধান্তের প্রতি জিবরাঈল ﷺ-এর পূর্ণ সমর্থন ছিল। রসূলুল্লাহ ﷺ এ সিদ্ধান্ত কে বিনা বাক্যে গ্রহণ করেছেন। বরং তিনি এর সাথে পূর্ণ একাত্ম হয়ে এ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য আমীন বলে আল্লাহর কাছে দু'আ করেছেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ উম্মাতের প্রতি অত্যন্ত উদার হৃদয়ের ছিলেন। উম্মতের শাস্তির কথা শুনে তিনি বিচলিত হয়ে পড়তেন। উম্মতের ইহকাল ও পরকালীন সুখ-শান্তি ও কল্যাণ সাধন করাই ছিল তাঁর নবুয়্যতী জীবনের মিশন। তা সত্ত্বেও মা-বাবার অবাধ্য এবং তাঁদের মনে কষ্ট দানকারী সন্তানের ধ্বংসের জন্য তিনি বদদু'আ করেছেন। কাজেই তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তবে যদি তারা তাওবা করে এবং নিজেদের ভুল স্বীকার করে মা-বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। তাঁদের সেবা- যত্নে আত্মনিয়োগ করে তাঁদের সন্তুষ্টি অর্জন করে। আর মা-বাবা মারা গেলে নিজেদের কৃত অপরাধের জন্য আল্লাহর দরবারে নির্ভেজালভাবে তাওবা করে, মা-বাবার জন্য দু'আ ও দান-সদাকা করতে থাকে এবং মা-বাবার পক্ষের আত্মীয় স্বজনের সাথে ও মা-বাবার বন্ধু-মহলের সাথে সদ্ব্যবহার করতে থাকে, তাহলে আশা করা যায় যে, তারা অনিবার্য ধ্বংস থেকে রেহাই পাবে।

মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ *আপনার প্রতিপালক ফায়সালা করে দিয়েছেন যে তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর আর কারো ইবাদত করবে না এবং মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। (সূরা বানী ইসরাঈল ঃ ২৩)*

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ
আমি বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা করবে না এবং মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। (সূরা আল-বাকারা ঃ ৮৩)

তোমরা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করো। (সূরা আন-নিসা ঃ ৩৬)

তিনি অন্য এক আয়াতে বলেন ঃ
তোমার মা-বাবা যদি আমার সাথে এমন সব বিষয়কে শরীক করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে। (সূরা লুকমান ঃ ১৫)

মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করা নাবীগণের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ
হে ইয়াহইয়া! দৃঢ়তার সাথে এই গ্রন্থ ধারণ করো আমি তাকে শৈশবেই বিচার বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দান করেছিলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে দয়াদ্রতা ও পবিত্রতা দান করেছি। সে ছিল পরহেজগার। মা-বাবার অনুগত এবং সে উদ্ধত অবাধ্য ছিলো না। (সূরা মারইয়াম ঃ ১২-১৪)

ঈসা ﷺ বলেন ঃ
তিনি (আল্লাহ) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সলাত কায়েম ও যাকাত আদায় করতে এবং মায়ের অনুগত থাকতে। (সূরা মারইয়াম ঃ ৩১-৩২)

মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ﷺ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমল আল্লাহর নিকট সবচাইতে বেশি প্রিয়? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ সময় মতো সলাত আদায় করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন কাজ? তিনি বললেনঃ মা-বাবার সাথে সুন্দর আচারণ করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা । (সহীহ বুখারী)

মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহারের উপকারিতা

- মা-বাবা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। সন্তানের জন্ম ও তাদের লালন-পালনে আল্লাহর পরেই মা-বাবার অবদান সবচাইতে বেশী। মা-বাবার অবদান ও ইহসানের কৃতজ্ঞতা জানালে আল্লাহর ইহসানের কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। তাদের অকৃতজ্ঞতা আল্লাহর অকৃতজ্ঞতারই শামিল।
- মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করলে ঈমান পরিপূর্ণ হয় এবং ইসলামী জীবন যাত্রা সুন্দর হয়।
- মা-বাবার আনুগত্য করা উত্তম ইবাদত ও শ্রেষ্ঠ আনুগত্য।
- মা-বাবার সন্তুষ্টি জান্নাতের চাবিকাঠি। মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার জান্নাতের পথে ধাবিত করে। যাকে আল্লাহ মা-বাবার সেবা-যত্ন করার সৌভাগ্য দান করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাকে তিনি জান্নাতের পথে চলারই সুযোগ করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এ সৌভাগ্য অর্জন করেছে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।
- মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করলে, তাঁদের সেবা-যত্ন করলে হায়াত বৃদ্ধি পাবে।
- মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করলে পরকালে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষের কাছে সে প্রশংসিত হবে।
- যে ব্যক্তি মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করে, তার সন্তানরাও তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং তাকে মর্যাদা প্রদান করবে। মা-বাবার সাথে ভালো আচরণ করলে আল্লাহ তার সন্তানদেরকেও সেই শিক্ষাই দেবেন।
- মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করলে এবং তাদের সেবা-যত্ন করলে বিপদ মুসিবত দুর হয় ও দুশ্চিন্তা মুক্ত হওয়া যায়।
- যে ব্যক্তি মা-বাবার বন্ধুদের সাথে সদাচরণ করবে, তার নূর বিলুপ্ত করা হবে না।
- মা-বাবার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি। মা-বাবাকে সন্তুষ্ট করার কাজ করতে থাকলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।
- আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করা, হাজ্জ ও উমরাহ পালন করা ইসলামের গুরুত্বপুর্ণ ইবাদত। যে ব্যক্তি মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করে, তাঁদের

অধিকার আদায় করে এবং তাদের সেবা যত্ন করে, আল্লাহ তাকে কবুল হাজ্জ ও উমরাহর সমান সাওয়াব দান করেন।

- মা-বাবার সেবা-যত্ন করা যুদ্ধের সমতুল্য ইবাদত। ক্ষেত্র বিশেষে তার চাইতেও বড়। মা-বাবার খেদমতে নিয়েজিত থাকলে দ্বীন প্রতিষ্ঠাকারী মুজাহিদগণের মধ্যে গণ্য হওয়া যাবে এবং যুদ্ধের ময়দানে অংশ গ্রহণকারীদের সমতুল্য মর্যাদার অধিকারী হওয়া যাবে।

মা-বাবার জন্য অর্থ ব্যয়

যেভাবে সন্তানের উপর মা-বাবার অধিকার রয়েছে তেমনিভাবে সন্তানের সম্পদের উপরও তাদের অধিকার রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"হে নাবী লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, আমরা কি ব্যয় করবো? আপনি তাদেরকে বলে দিন, যে মালই তোমরা ব্যয় করো না কেন? তার প্রথম হকদার হলো তোমার মা-বাবা।" (সূরা আল বাকারা ঃ ২১৫)

এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট স্বীয় বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বললো, তিনি যখনই ইচ্ছা করেন আমার সম্পদ নিয়ে নেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তার বাবাকে ডাকলেন। লাঠি ভর করে এক দুর্বল বৃদ্ধ হাযির হলেন। তিনি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। বৃদ্ধলোকটি জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রসূল! এক সময় আমার এ ছেলে দুর্বল অসহায় ও কপর্দকহীন ছিল। আমি তখন ছিলাম শক্তিশালী ও বিত্তশালী। আমি কখনও তাকে আমার সম্পদ নিতে বাধা দেইনি। আজ আমি দুর্বল ও কপর্দকহীন, সে শক্তিশালী ও বিত্তশালী। এখন তার সম্পদ আমাকে দেয় না। একথা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার বাবার। (ইবনু মাজাহ)

ছেলে ও তার উপার্জন তার বাবার জন্যই

ইবনু মাযাহ জাবির رضي الله عنه হতে এই মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ﷺ আমার সম্পদ ও সন্তানাদি আছে, আর আমার বাবা আমার সম্পদ বিনষ্ট (খরচ) করতে চায়। রসূলূল্লাহ বললেন ঃ তুমি এবং তোমার সম্পদ (সবই) তোমার বাবার। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

ইবনু আবী শায়বাহ মায়ায ইবনু জাবাল ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সন্তানের উপর মা-বাবার কী হক? তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তোমার সমস্ত ধন সম্পদ যদি তাদেরকে দিয়েও দাও তবুও তাদের হক আদায় করতে পারবে না।

মা-বাবার প্রতিদান

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন সন্তান বাবার স্নেহে-ভালবাসা, লালন-পালন এবং কষ্টের হক আদায় করতে বা তার বদলা দিতে সক্ষম নয়। তবে সে যদি তাঁকে কারো দাস রূপে পায়, অতঃপর তাঁকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেয়, তাহলে কিছু হক আদায় হয়। (সহীহ মুসলিম)

মা-বাবার অবাধ্যতা জঘন্যতম পাপ

"তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন, তোমরা তাঁদের ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলবে না এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না। বরং তাদের সাথে সম্মান ও শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলবে এবং বিনয় ও নম্রতাসহকারে তাদের সামনে নত হয়ে থাকবে। আর এ দু'আ করতে থাকবে ঃ হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম করো, যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩-২৪)

আবদুর রহমান ইবন আবূ বাকরা ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সবচাইতে বড় কবীরা (জঘন্যতম) গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করবো না। একথা তিনি তিন বার বললেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, কেন নয়, অবশ্যই করবেন, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন ঃ আল্লাহর সাথে শিরক করা, মা-বাবার অবাধ্যতা করা। তিনি হেলান দিয়ে বসা ছিলেন, অতঃপর সোজা হয়ে বসে বলতে লাগলেন, (খুব ভালো করে শোন!) মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। তিনি বারবার একথা বলতে থাকনে। অবশেষে আমরা (মনে মনে) বললাম, হায়! তিনি যদি চুপ হয়ে যেতেন। (সহীহ বুখারী)

আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস ﷺ বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ কবীরা গুনাহসমূহ হচ্ছে, ১. আল্লাহর সাথে শরীক করা ২. মা-বাবার অবাধ্য হওয়া, ৩. মানুষ হত্যা করা ও ৪. মিথ্যা শপথ করা। (সহীহ বুখারী)

মা-বাবাকে গালি দেয়া কবীরা গুনাহ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির নিজের মা-বাবাকে গালি দেয়া অন্যতম কবীরা গুনাহ। সাহাবীগণ বললেন, কোন লোক কি নিজের মা-বাবাকে গালি দেয়? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ দেয়। কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির বাবাকে গালি দেয়, প্রত্যুত্তরে সেও তার বাবাকে গালি দেয়। অনুরূপভাবে সে অপর কোন ব্যক্তির মাকে গালি দেয়, এর উত্তরে সেও তার (গালি দাতার) মাকে গালি দেয়। (সহীহ বুখারী)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জঘন্যতম কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, কোন ব্যক্তির নিজের মা-বাবাকে লা'নত করা। বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল! কোন ব্যক্তি কিভাবে তার মা-বাবাকে লা'নত করতে পারে? তিনি বললেন ঃ কোন ব্যক্তি অন্যের বাবাকে গালি দেয়, প্রত্যুত্তরে সেও তার বাবাকে গালি দেয়। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি অন্যের মাকে গালি দেয়, এর উত্তরে সেও তার মাকে গালি দেয়। (সহীহ মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে পশু জবাই করে, যে ব্যক্তি জমির সীমানা বদলে দেয় এবং যে ব্যক্তি নিজের মা-বাবাকে গালি দেয়, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি লা'নত (অভিসম্পাত) করেন। (সহীহ বুখারী)

যে বাবাকে অভিশাপ দেয় তার উপর আল্লাহর অভিশাপ

সাহাবী আবু তুফায়েল আমির ইবন ওয়াসিলা ﷺ বলেন, আমি আলী ﷺ এর নিকট ছিলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি এসে তাঁকে বলল, রসূলুল্লাহ ﷺ কি আপনাকে এমন কোন কথা বলেছেন, যা অন্য কাউকে বলেননি? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এমন কোন কথা বলেননি, যা তিনি অন্যকে বলেননি। তবে তিনি আমার নিকট চারটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সে চারটি বিষয় কী? তিনি বলেন ঃ তিনি (রসূলুল্লাহ ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বাবাকে অভিশাপ

দেয়, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অভিসম্পাত করেন। যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে পশু জবাই করে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অভিসম্পাত করেন। যে ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করে এবং যে ব্যক্তি জমির সীমানা বদলে দেয়, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অভিসম্পাত করেন। (সহীহ মুসলিম)

অবাধ্য সন্তান জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। ১. মা-বাবাকে কষ্টদানকারী অবাধ্য সন্তান। ২. পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী ও ৩. দাইয়্যুস। আর তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না। ১. মা-বাবার অবাধ্য সন্তান। ২. মদপানে আসক্ত ব্যক্তি ও ৩. দান করে খোঁটাদানকারী। (না'সাঈ)

মা-বাবার অধিকার আদায় করা ও না করার পরিণাম

আব্দুল্লাহ ইবন আমর ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মা-বাবার অসন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। (তিরমিযী)

আবূ উমামা ﷺ থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রসূলুল্লাহ! সন্তানের উপর মা-বাবার কি অধিকার আছে? তিনি বলেন ঃ তাঁরা উভয়ে তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম। (ইবনু মাজাহ)

মায়ের সাথে অবাধ্যতা

সাহাবী মুগীরা ইবনে শোবা রা. থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর মায়ের অবাধ্যতা, কন্যা শিশুকে জীবিত কবর দেয়া, কৃপণতা করা ও ভিক্ষা বৃত্তি হারাম করে দিয়েছেন। আর বৃথা তর্ক-বিতর্ক, অধিক জিজ্ঞাসা সম্পদ নষ্ট করাকে তোমাদের জন্য অপছন্দ করেছেন। (সহীহ বুখারী)

মা-বাবার অবাধ্যতার অপকারিতা

- মা-বাবা আল্লাহর বড় নিয়ামত। অবাধ্য সন্তান আল্লাহর নিয়ামতের অস্বীকার করে। ফলে সে মা-বাবার অনুগ্রহকেও অস্বীকার করে।

- মা-বাবার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি। তাদের অসন্তুষ্টি আল্লাহর অসন্তুষ্টি। মা-বাবার অবাধ্য সন্তান আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে দূর হয়ে যায়।
- মা-বাবার অবাধ্যতা সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। যে ব্যক্তি মা-বাবার সাথে অসদাচরণ করে তার সন্তান, তার প্রতিবেশী ও তার সমাজের লোকেরাও তার সাথে অসদাচরণ করবে।
- মা-বাবার অবাধ্যতার কারণে সমাজ থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা দূরীভূত হয়।
- অবাধ্য সন্তান, মা-বাবার অবাধ্যতার প্রতিফল দুনিয়াতেও পাবে।
- মা-বাবার অবাধ্যতার কারণে চেহারার লাবণ্যতা ও নূর দূরীভূত হয়।
- অবাধ্য সন্তান কিয়ামতের দিন আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে।

মা-বাবার দু'আ কবুল হয়

সাহাবী আবূ হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন ব্যক্তির দু'আ কবুল হয়। এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। এক ঃ মাজলুমের দু'আ, দুই ঃ মুসাফিরের দু'আ, তিন ঃ সন্তানের বেলায় মা-বাবার দু'আ। (তিরমিযী)

অনেক সন্তানেরাই জানে না মা-বাবার মৃত্যুর পর কী করণীয়

"আবু উসাইদ ﵁ বলেন, আমরা নাবী ﷺ এর সামনে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! মা-বাবার মৃত্যুর পরও কি এমন কোনো পদ্ধতি সম্ভব যে, আমি তাদের সাথে সুন্দর আচরণ অব্যাহত রাখতে পারি? নাবী ﷺ বললেন, হ্যাঁ। চারটি পন্থায় তুমি তা করতে পার (১) মা-বাবার জন্য দু'আ এবং ইসতিগ্‌ফার (২) তাদের কৃত ওয়াদাসমূহ এবং বৈধ ওসিয়ত (দান) পূরণ, (৩) বাবার বন্ধু-বান্ধব এবং মার বান্ধবীদের সম্মান ও আদর-যত্ন এবং (৪) তাঁদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় ও সুন্দর আচরণ করা, যারা মা-বাবার দিক থেকে তোমাদের আত্মীয় হন।" (আল আদাবুল মাফরুজ)

১) দু'আ ও ইসতিগ্‌ফার ঃ সলাতের পর এবং অন্য সময় আল্লাহর নিকট কেঁদে কেঁদে দু'আ করা উচিত যে, হে আল্লাহ! আমার মা-বাবাকে ক্ষমা করুন। তাঁদের গুণাহসমূহকে মুছে দিন এবং তাঁদেরকে আপনি তাই দান করুন যা

আপনি নেক বান্দা-বান্দীকে দিয়ে থাকেন। হে আল্লাহ! যখন আমরা সন্তানরা তাঁদের সাহায্য, স্নেহ ও লালন-পালনের মুখাপেক্ষী ছিলাম তখন তারা সবকিছু আমাদের জন্য ত্যাগ করেছিলেন। হে আল্লাহ! এখন তাঁরা তোমার নিকট সমুপস্থিত। শৈশবকালে অসহায় অবস্থায় আমরা তাঁদের মুখাপেক্ষী ছিলাম। এখন তাঁরা সেই সময়ের চেয়ে বেশী তোমার রহমাত ও সুদৃষ্টির মুখাপেক্ষী। হে আল্লাহ! তুমি তাঁদেরকে নিজের রহমাতের ছায়া দান কর এবং নিজের জান্নাতে তাঁদের আশ্রয় দাও। *"রব্বির হামহুমা কামা রব্বা ইয়ানিস্ সগিরা"*

২) মা-বাবার ওয়াদা ও ওসিয়ত পূরণ করা ঃ মা-বাবা জীবিত অবস্থায় অনেক লোকের সাথে ওয়াদা করে থাকতে পারেন। বিভিন্ন ব্যাপারে কিছু ওয়াদা করতে পারেন। মৃত্যুর আগে ওসিয়ত (দান) করতে পারেন। মা-বাবার মৃত্যুর পর সন্তানের জন্য তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণের একটি পন্থা অবশিষ্ট থাকে। তা হলো তাঁদের কৃত ওয়াদাসমূহ ও ওসিয়ত পূরণ করা। আর এভাবেই তাঁদের রূহকে খুশী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। কিন্তু তাঁদের জায়িয বা বৈধ ওসিয়তই পূরণ করতে হবে, তাঁদের অবৈধ ওসিয়ত নয়।

৩) মায়ের বান্ধবী এবং বাবার বন্ধুদের সাথে আচরণ ঃ মা-বাবার মৃত্যুর পর তাঁদের সাথে আচরণের তৃতীয় পন্থা হলো, মায়ের বান্ধবী এবং বাবার বন্ধুদের সাথে সুন্দর আচরণ করা। সামাজিক জীবনে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদের মতো তাঁদেরকেও শ্রদ্ধা করতে হবে। তাঁদের মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। বিভিন্ন প্রশ্নে পরামর্শের সময় তাঁদেরকে শরীক করা এবং সবসময় শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্বক তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ করা আবশ্যক। নাবী কারীম ﷺ বলেছেন ঃ বাবার বন্ধুদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা সবচেয়ে সুন্দর আচরণ।

৪) মা-বাবার আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুন্দর আচরণ ঃ মা-বাবার মৃত্যুর পর আচরণের চতুর্থ পন্থা হলো, মা-বাবার আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুন্দর আচরণ করা। মায়ের পক্ষের আত্মীয় যেমন- খালা, মামা, নানা-নানী প্রভৃতি এবং বাবার পক্ষের আত্মীয় যেমন চাচা, ফুফু, দাদা-দাদী ইত্যাদি। এ সকল আত্মীয়র প্রতি অমনোযোগী থাকা এবং বেপরোয়া ভাব প্রদর্শন প্রকৃতপক্ষে মা-বাবার প্রতি অমনোযোগী থাকার নামান্তর এবং একজন মু'মিন ও মু'মিনা মা-বাবার সাথে এ ধরনের আচরণ করতে পারে না। আল্লাহর রসূল ﷺ এর বলেছেন, তোমরা তোমাদের বাবা ও দাদার সাথে কখনও বেয়াদবসুলভ আচরণ করবে না। মা-বাবার সাথে বেয়াদবী করা আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়ার শামিল।

প্যারেন্টিং বিষয়ে
শায়েখ নুমান আলী খানের পরামর্শ

চ্যাপ্টার ১৫

আমার সন্তানের সাথে আমার সম্পর্ক কতটুকু?

আমাদের ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে চিন্তার বিষয় হলো তারা কথা বলার জন্য মানুষ খুঁজে পায় না। এটা তাদের বিপর্যয়ের আর একটি কারণ। আমাদের সন্তানরা ক্লাস ফাইভ-সিক্সে উঠতে উঠতে তারা কিছু নতুন নতুন শব্দ শিখে। এই বয়সে তারা কিছু আজেবাজে শব্দ আয়ত্ত করে; তারা কিছু বাজে ওয়েবসাইটে ঢোকা শিখে যায়; তারা তাদের পিএসপি, ট্যাবলেট, আইফোনে বিভিন্ন নোংরা জিনিস ডাউনলোড করা শিখে। তারা কম বয়সেই এসব বিষয়ে পারদর্শী হয়ে যায়। যেসব জিনিস আমরা ২৫ বছর বয়সেও শিখিনি সেগুলো তারা ১২ বছর বয়সেই জানতে পারে। এটাই বাস্তবতা।

এখনো কোন কোন অভিভাবক জানেন না যে ফেইসবুক কি? টুইটার কি? কিন্তু এই আধুনিক যুগে আমাদের সন্তানরা এসব সামাজিক যোগোযোগের ওয়েবসাইটে ঢুকে, যেখানে অচেনা মানুষ কিশোরী মেয়ে বা ছেলের সাথে কথা বলতে পারে। যেহেতু এই বয়সের ছেলেমেয়েরা আবেগপ্রবণ হয়। তাই একসময় তারা সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। একে অপরের সাথে দেখাও করে। এরপর বিভিন্ন কিছু ঘটে যায়। এটা বর্তমানে মুসলিম-অমুসলিম সকল ছেলেমেয়েদের বাস্তবতা। এগুলোই ঘটছে। এসবের ব্যাপারে আমাদের চোখ বুজে থাকলে হবে না, আমাদের চোখ খুলতে হবে। কেউ কেউ হয়তো বলতে পারেন, "না না, আমার সন্তানরা এমন না।"

প্লিজ আমাদের জেগে উঠতে হবে! অন্য বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলার আগে এসব ব্যাপারে কিছু প্রাথমিক সমাধান যা আমাদের করতে হবে তা হল, বাসায় ওপেন এক্সেস ইন্টারনেট রাখা যাবে না। বিশেষ করে ১২ বছরের ছোট বাচ্চা

থাকলে, এটা রাখা যাবে না! এটা একটা ভয়ানক কাজ। তাদেরকে ল্যাপটপ দেয়া যাবে না। নিরাপত্তার জন্য মোবাইল দিতে চাইলে এমন মোবাইল দিতে হবে যেটাতে কেবল ফোন নাম্বার লেখা যায়, কোন টেক্সট ম্যাসেজ বা ইন্টারনেট চালানো যায় না। নতুবা আমরা নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে আনছি। এ নিয়ে নিজেই পরবর্তীতে আফসোস করতে হবে। আমরা হয়তো ভাবতে পারি এগুলো আমি তাদের ভালবেসে কিনে দিয়েছি, আসলে আমি তাদের ধ্বংস করছি। তারা এখনোতো বড় হয়নি যে নিজেরাই বুঝে নিবে যে এটা তার করা উচিত নাকি উচিত না।

ধরে নেয়া যাবে না যে তারা নিজেরাই সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে নিবে। অনুগ্রহ করে এসব জিনিস থেকে তাদের দূরে রাখতে হবে। আমাদের সন্তানদের বিনোদনের জন্য অন্যান্য পথ আছে। এটা প্রথম বিষয়। আমাদের সন্তানেরা যখন টিনেজে/কৈশোরে উপনীত হয় তখন তারা নিজেকে স্বাধীন ভাবতে থাকে। যখন তারা নিজেকে স্বাধীন ভাবতে থাকে তখন তারা মা-বাবার কথা শুনতে চায় না। তখন অভিভাবকরা এমন কাউকে চান যার কথা তারা শুনবে। ইতিমধ্যে যা ক্ষতি হবার তা তো হয়ে গেছে। যখন আমাদের হাতে সুযোগ ছিল তখন আমরা সঠিকভাবে তা কাজে লাগাইনি। তাই যাদের সন্তান এখনও ছোট তাদের উচিত এ সময়কে কাজে লাগানো।

দেখা যাক বাচ্চারা স্কুলে টিফিন পিরিয়ডের সময় সাধারণত কি নিয়ে কথাবার্তা বলে। "আমার মা আমাকে NC17 ভিডিও গেম কিনে দিয়েছে। আর আমার বয়স মাত্র ৮ বছর। মা আমাকে খুব ভালবাসে।" "আমার গ্রান্ড থেফট অটো আছে", "তুমি ঐ মুভিটা দেখেছো? ওটা PG-13! "বা" মুভিটা Rated-R আর আমি দেখেছি। সেটার ডিভিডি-ও আমার কাছে আছে।" বাচ্চারা এসব নিয়েই কথা বলছে। এই জিনিসগুলো আমাদের সন্তানদের নষ্ট করে ফেলছে। আর একে আমরা ভালবাসা বলবো? একে বাচ্চাদের জন্য উদ্বেগ বলে? আমাদের চোখ খুলতে হবে! আমরা সন্তানদের এমন সব জিনিসের সামনে উন্মুক্ত করে দিচ্ছি, আর এটা ধীরে ধীরে খারাপের দিকেই যাচ্ছে। বিশেষ করে মিডিয়াতে, যেই মুভিটা ১০ বছর আগে ১৩ বছর বয়সের নিচে অনুমোদিত ছিলো না সেটা এখন অনুমোদিত হয়েছে। স্টান্ডার্ড নিচে নেমে গিয়েছে। আমি না, তারাই এসব নিয়ে কথা বলছে। এখন সমকামিতার মত বাজে বিষয়গুলি এমনকি কার্টুনেও সাধারণ হয়ে গেছে। এখন আর টম এন্ড জেরির মত কার্টুন নেই। সব কিছু বদলেছে। চারিদিকে কী হচ্ছে সে ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

আমাদের সন্তানেরা কি দেখছে? তারা কী ভাষায় কথা বলছে? যেসব জিনিস তাদের কাছে নরমাল মনে হয়, সেগুলো তাদের জীবনের অংশ হয়ে গেছে। যখন আমরা মসজিদে যাই তখন আমরা দাড়িওয়ালা মানুষদের দেখি; তারা নামায পড়ে, ভিন্নভাবে কথা বলে। আমাদের বাচ্চারা কি এই দৃশ্য দেখতে পায় নাকি বাইরের পৃথিবীকে দেখে?

সন্তানদের সাথে আমাদের আখিরাত নিয়ে কথা বলতে হবে। অন্যের জন্যে ভালো কিছু করার কথা বলতে হবে। কাউকে সাহায্য করার কথা বলতে হবে। তারা আমাদেরটা দেখেই শিখে নিবে। আমাদের তাকে লেকচার দিতে হবে না এ ব্যাপারে, তারা কেবল বাবা-মাকে দেখবে। সবচেয়ে কার্যকর প্যারেন্টিং সেটাই যেখানে বাচ্চাকে কোনো কাজ করাতে বাবা-মার কিছু বলতেই হয় না, তারা দেখতে দেখতে শিখে ফেলে। কারণ তারা এসবই সব সময় দেখছে।

কেউ কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যে 'আমি যদি নুমান আলীর লেকচার নিয়ে এসে আমার বাচ্চাদেরকে বসিয়ে শুনাতে পারি ইনশাআল্লাহ এরপরে তারা নীতিবান হয়ে যাবে। শুধু কয়েকটা ইউটিউব ভিডিও দেখাবো। আর সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে?' এতে আসলে তেমন উপকার হবে না। আর আমরা হয়তো এতোদিনে সেটা বুঝে ফেলেছি। আসলে আমরা নিজেরাই হচ্ছি যার যার সন্তানের প্রকৃত কাউন্সিলর। আমি আমার সন্তানের প্রকৃত কাউন্সিলর। আমাদের তাদের সবচেয়ে ভালো বন্ধু হতে হবে।

আমরা জানি, পুরানো যুগে তাদের লাইফ স্টাইলের কারণে মা-বাবা আর সন্তানদের মাঝে একটা প্রকৃতজাত সম্পর্ক বিরাজ করত। কিন্তু নতুন যুগে, আব্বু দিনের বেশির ভাগ সময় অফিসে বা ব্যবসা নিয়ে থাকেন। বাসায় আসেন ক্লান্ত হয়ে। আর যে সময়ে তিনি ক্লান্ত হয়ে বাসায় আসেন, তার অধিকাংশ বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়েছে। আর যখন তিনি অফিসে যান, বাচ্চারা তখনো ঘুম থেকেই উঠেনি। আর তেমন যদি নাও ঘটে, বাচ্চাদের ৫ মিনিটের জন্যে দেখতে পান যখন তারা ব্রেকফাস্ট করছে। তার মানে সাত দিনের মাঝে পাঁচ দিনই বাবা আর বাচ্চার মাঝে কোনো কথোপকথন হয় না। তাও যদি হয় সেটা- 'তুমি হোমওয়ার্ক শেষ করেছ? আচ্ছা, আমার জন্যে এক গ্লাস পানি নিয়ে আসো।' এতটুকুই। এর মাঝেই সীমাবদ্ধ। তারপর আসে ছুটির দিন। কিন্তু ছুটির দিনগুলোতে এখানে দাওয়াত থাকে, ওখানে পার্টি থাকে, তারপর সকালে ১২ টা পর্যন্ত ঘুমানো লাগে, বাসায় কিছু কাজ করা লাগে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা তখনও সন্তানদের সংগে সময় কাটাই না। তাদের সংগে সত্যিকারের

কথাবার্তা বলি না। তাদের সাথে আমাদের আসলে প্রকৃত যোগাযোগই হয় না। এটাই মূল সমস্যা।

আমাদের বাচ্চাদের জন্যে সময় বের করে নিতে হবে সপ্তাহের মাঝে আর সপ্তাহের শেষে। এটাই সকলের জন্যে কার্যকর উপদেশ। আমাদের সন্তানদের জন্যে সময় খুঁজে নিতে হবে, কেবল তাদের সাথে কথা বলার জন্যে। শুধু শুনতে হবে তারা কী বলছে আর কথা বলতে হবে তাদের সাথে। যদিও তারা আজগুবি কথাবার্তা বলে। আমাদের উচিত তাদের জীবনের একটা অংশ হওয়া। আমাদের অনেকের ক্ষেত্রেই, যার যার সন্তানের কাছে মা-বাবার একমাত্র ভূমিকা হলো তারা বাড়ির একটা দেয়ালের মতন। এটা সব সময়ই থাকে কিন্তু এর সাথে কেউ কথা বলে না।

আমরা কি জানি এই ধরনের বাবা মায়ের সাথে কি হয়? তারা তাদের আচরণের প্রতিফলন পায় যেই মুহূর্তে সন্তানেরা টিনেজার হয়। যখন তাদের ১৪/১৫ বছর বয়স হয় তারা কিছুটা স্বাধীন হয়ে যায়। তখন তারা মা-বাবার কথা শুনতে চায় না। কোন কোন অভিভাবক সমস্যা সমাধানের জন্য মসজিদে যান ঃ ইমাম সাহেব! আমাকে একটা সূরা বলে দিন, একটা দু'আ বলে দিন যাতে আমার ছেলেটা ভালো হয়ে যায়।' আসলে এভাবে কোনো সমস্যার সমাধান হয় না। যখন তাদের বয়স ১৭, ১৮, ১৯, ২০ হয়ে গিয়েছে আমাদের তখন জরুরি সঙ্কট অনুভব করলে চলবে না। তাদেরকে গড়ে তুলতে হবে অনেক অনেক আগে থেকে।

এখন কিছু প্র্যাক্টিকাল পরামর্শ দেয়া যাক সেসব অভিভাবকের জন্যে যাদের সন্তানের বয়স ১০ এর নিচে। মা-বাবার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো সন্তানকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা দেয়া। যখন নাবীরা ﷺ দ্বীন শিক্ষা দিতেন, তারা সকলের জন্যে তা করতেন। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইসলাম আর কুরআন শিক্ষা নিয়ে কথা বলছেন, বাচ্চাদের শেখার বা উপদেশ গ্রহণ করার কথা তিনি খুব কম সময়ই উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনি এ সম্পর্কে বলেছেন সেটা সব সময়ই বাচ্চাদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে। কথাটা আবার খেয়াল করি। আল্লাহ যখনই কুরআনে বাচ্চাদের সঠিক পথ প্রাপ্ত হওয়ার কথা বলছেন, সেটা সব সময়ই বাবা-মায়ের পক্ষ থেকে হয়েছে। আর মা-বাবার মধ্য থেকে তা সবসময়ই বাবার পক্ষ থেকে হয়েছে। কারণ মা তো সর্বক্ষণ বাচ্চার পাশেই থাকেন। একজন মাকে কোনো অতিরিক্ত কষ্ট পোহাতে হয় না বাচ্চার পাশে সবসময় থাকার জন্যে কিংবা বাচ্চার সবসময় খেয়াল রাখতে কিংবা তাকে

উপদেশ দিতে। একজন মা-কে সাধারণতঃ মা হওয়ার ব্যাপারে সাধারণতঃ ট্রেনিং নিতে হয় না, এটা প্রকৃতিগতভাবেই হয়ে থাকে। আল্লাহ তাদের মাঝে এই অনুভুতি দিয়ে রেখেছেন।

অন্যদিকে বাবাদের অবস্থা শোচনীয়। আমাদের একটা ট্রেইনিং-এর মধ্য দিয়ে যেতে হয় সত্যিকারের বাবা হওয়ার জন্যে। প্রকৃতিগতভাবে আমাদের মাঝে এ অনুভূতি আসে না। কেবল সন্তান জন্ম নিয়েছে বলেই মায়ের সব আবেগ-অনুভূতি বদলে যায়, মুহূর্তেই সব বদলে যায়। কিন্তু একজন বাবার ক্ষেত্রে অতোটা হয়না যতোটা মার ক্ষেত্রে হয়। কারণ বাবা হওয়ার যে উপলব্ধি তা স্বভাবগতভাবে আমাদের মাঝে আসে না। আমাদের বাবাদের এই অনুভূতি গড়ে তুলতে হয়, এর পিছনে শ্রম দিতে হয়। এ জন্যেই আল্লাহ বলেছেন লুকমান সময় করে নিচ্ছেন, সঠিক সুযোগটা বেছে নিচ্ছেন বাচ্চার সংঙ্গে কথা বলার জন্যে। আমরা দেখেছি ইয়াকূব ﷺ তাঁর সন্তানদের সাথে কথা বলছেন। আমরা ইব্রাহীম ﷺ-কে পেয়েছি, তিনি তাঁর সন্তানদের ঠিক একই উপদেশ দিয়েছেন যা ইয়াকূব ﷺ বলেছেন। খুব চমৎকার বিষয়টা। কারণ এ থেকে বুঝা যায় একজন বাবা তাঁর সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালন করছেন তাকে শুধু এটা শিখিয়ে নয়, যে নিজেকে কিভাবে গড়ে তুলতে হবে বরং তাকে কিভাবে একজন বাবা হতে হবে সেটাও শিখিয়েছেন। আমরাই আমাদের সন্তানকে শিখাবো কিভাবে একদিন ভালো বাবা হতে হবে।

সন্তান প্রতিপালনে আমাদের করণীয়

আমাদের সন্তানদের প্রতি যে সচেতনতা কাজ করে তা আমাদের দ্বীনেরই ভিত্তি। আমাদের ভবিষ্যতের জন্যে যে চিন্তা এটা আমরা পেয়েছি আমাদের বাবা ইব্রাহিম ﷺ-এর কাছ থেকে। আসলে তারও আগে আমরা প্রথম যেই সচেতন বাবার কথা জানতে পেরেছি তিনি ছিলেন নূহ ﷺ। নূহ ﷺ তার সন্তানের ব্যাপারে খুব বেশী উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে তার সন্তানকে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। তো আমাদের সন্তানের দ্বীনি বিষয়ে আমাদের সচেতনতা এই ধর্মের বহু পুরোনো ভিত্তি। আল্লাহ আমাদের একটা বিষয় শেখাতে চেয়েছেন যে, আমাদের নাবীদের সন্তানেরাও সমস্যাগ্রস্ত ছিল। ইব্রাহীম ﷺ-কে আল্লাহ অত্যন্ত নেককার দু'জন সন্তান দিয়েছিলেন, তাকে দিয়েছিলেন ইসমাঈল ﷺ এবং ইসহাক ﷺ। তিনি দু'জন অপূর্ব সন্তান পেয়েছিলেন। কিন্তু নূহ ﷺ তেমন পাননি। ইয়াকূব ﷺ পেয়েছিলেন কয়েকজন অনুগত সন্তান

আবার কয়েকজন সমস্যাগ্রস্ত সন্তান। তবে তার সন্তানদের বেশীরভাগই অবাধ্য ছিলেন।

তার মানে আমাদের নাবীদের মধ্যেই এমন কয়েকজন আছেন যাঁরা সন্তানের ব্যাপারে দুশ্চিন্তায় ছিলেন। আর এ কথাটা মাথায় রাখা জরুরি কারণ যদি নাবীদের তাদের সন্তানের ব্যাপারে সমস্যায় পড়তে হয়, তাহলে আমি....আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন....আমরা সন্তানের ব্যাপারে আমাদের সমস্যাকে এড়িয়ে যেতে পারব না! এটা আল্লাহর ক্বদরেরই অংশ। আল্লাহ আমাদের কয়েকজনকে অনুগত সন্তান দান করবেন, কিংবা আমাদের কিছু সন্তান অনুগত হবে আবার কিছু সন্তান আমাদের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ হবে। আর আমাদের সব ধরনের সন্তানকেই বড় করে তুলতে হবে। এটা আমাদের দ্বীনেরই একটা অংশ, আমাদের জীবনের অংশ।

দু'টি বাচ্চা কখনোই একই রকমের হবে না। কেবল একটা সূত্র প্রয়োগ করে আমাদের সব বাচ্চাকে বড় করতে পারবো না। উদাহরণস্বরূপ ইয়াকূব ﷺ-এর কথাই ধরি, আমরা এটা বিশ্বাস করি না যে তিনি ইউসূফ ﷺ-কে বেশী স্নেহ করেছিলেন এবং অন্যদের প্রতি কম যত্ন নিয়েছিলেন তাই তারা অমন আচরণ করেছিলো। তিনি একজন নাবী ছিলেন। অবশ্যই একজন নাবীর অন্যতম প্রধান কাজ হল ন্যায়নিষ্ঠভাবে জীবনযাপন করা। আর এতে সুবিচার হবে না আমি যদি আমার এক সন্তানের প্রতি স্নেহশীল হই আর অন্য সন্তানের প্রতি তা না হই। আমরা ইয়াকূব ﷺ-এর কাছে এমনটা আশা করি না। অর্থাৎ বাবা হিসেবে যতটুকু করা সম্ভব ছিল তিনি করেছিলেন কিন্তু তারপরেও তাঁর সন্তানেরা তাঁকে পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ! শেষে তারাও তাওবা করেছিলেন আর এটা তার প্রতি আল্লাহর উপহার।

কিন্তু নুহ ﷺ-এর ক্ষেত্রে তাঁর ছেলে শেষ পর্যন্ত তাওবা করেনি। তিনি নাবী ছিলেন দেখে আমরা হয়ত ভাবতে পারি যে, তাঁর ছেলেকে মাফ করে দেয়া হবে এটা ঠিক নয়। বুঝার সুবিধার্থে একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন- যিনি ভাল চাকরি করেন তার কিছু অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা থাকে। যেমন- হেলথ ইন্স্যুরেন্স, গাড়ি, টেলিফোন, বিভিন্ন রকম ভাতা ইত্যাদি। তাই নাবীর ক্ষেত্রে বিষয়টা একেবারেই এরকম নয়। নাবীর ছেলে হয়েছে বলেই আল্লাহর থেকে বাড়তি কোন সুযোগ-সুবিধাই সে পাবে না।

কোন নাবীকেই তাঁর পরিবারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি, না তাঁর স্ত্রী, না তাঁর সন্তান। এমনকি আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর ক্ষেত্রে। একটা হাদীসে আমরা দেখি যে তিনি যখন তার সন্তানের সঙ্গে কথা বলছেন... ফাতিমা তুয যাহ্‌রা ﷺ-এর সঙ্গে, তিনি বলছেন ঃ "ফাতিমা, মুহাম্মাদের কন্যা! আল্লাহর ব্যাপারে সতর্ক হও, কারণ আল্লাহর সামনে আমি তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারব না, তোমার উপরেও আমার কোন অধিকার থাকবে না!" তিনি এই কথা বলছেন নিজের মেয়েকে! অন্য কথায় তিনি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিখাতে চাইছেন।

কেবল আমরা মুসলিম হয়েছি বলে, আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করছি বলে...আমরা এমন সন্দেহ পোষণ করতে পারি না যে আমাদের নাবীজী ﷺ তাঁর সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার চেয়ে কোন অংশে কম করেছেন। তিনি ভবিষ্যতের সকল বাবাদের জন্য আদর্শ। বিশেষ করে কন্যা সন্তানের বাবাদের জন্যে। আমাদের মধ্যে যাদের মেয়ে আছে আমরা তো অনুগৃহীত। আমরা সম্মানিত নাবী ﷺ -এর সুন্নাকে বহাল রাখতে পেরে। কারণ তিনিও ছিলেন কন্যা সন্তানের বাবা। তাঁর ছেলেও হয়েছিল কিন্তু তারা খুব অল্প বয়সেই মারা গিয়েছিল। আল্লাহ তাকে একাধিক মেয়ে সন্তান উপহার দিয়েছিলেন এবং তাঁদের লালন-পালনের দায়িত্ব উপভোগ করতে দিয়েছেন। এটা এমন একটা দায়িত্ব যার জন্যে আমাদের সম্মানিত বোধ করা উচিত। এ কারণে মেয়ে সন্তান হওয়ার ব্যাপারে আমাদের চিন্তা ধারণা বদলে গিয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ মেয়ে সন্তান হওয়ার যে কালচার ইসলামের পূর্বে এমনকি আরব দেশেও যখন মেয়ে সন্তান হত তখন তারা চেহারা বিকৃত করতেন ঃ এহ! এখন আমি সমাজকে মুখ দেখাব কিভাবে। অবাক কথা এই যে, এই যুগে এসেও মুসলিম সমাজে কারো কারো পরিবারেই স্বামী তার স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে আছেন। সে প্রায় মরেই যাচ্ছিল সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে কিন্তু সন্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর মা এস.এম.এস করলেন ঃ 'ভালো খবর তো?' এ কথার মানে কি? তিনি আসলে জিজ্ঞেস করেছেন ছেলে হয়েছে কিনা। এরপর স্বামী কোন উত্তর না দিলে তিনি সান্তনা দিয়ে বলেন ঃ অসুবিধা নেই, এর পরের বার হবে ইনশাআল্লাহ। যেন মেয়ে হওয়ার ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক। সুবহানাল্লাহ। কত নীচে নেমে গিয়েছি আমরা।

আল্লাহ আসলে তাদের ব্যাপারে কুরআনে অভিযোগ করেছেন যারা তাদের কন্যা সন্তানকে মর্যাদা দেয় না। যখন মেয়ে জন্ম দেয় তার মুখ কালো হয়ে যায়। যেন কালোমেঘ তার মুখকে ঢেকে রেখেছে আর সে হতাশায় ডুবে ভাবছে আমার এই মাত্র একটা মেয়ে হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। তো আমাদের সন্তানদের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করা নিয়ে কথা বলার আগে আমাদের প্রথমে ভাবা উচিত মা-বাবা হিসেবে আমরা কতটা যোগ্য। এ বিষয়টা প্রথমে খেয়ালে আনতে হবে। আর এটা আসলে বেশ বড় একটা সমস্যা।

আমাদের মনে রাখতে হবে সন্তানের প্রতি সচেতনতা আমাদের দ্বীনের একটা ভিত্তি। দ্বীনের একটা মৌলিক অংশ। আলহামদুলিল্লাহ! সন্তানকে বড় করার কাজে আমরা বেশ ভালো যুগ যুগ ধরে। অবশ্যই পৃথিবী অনেক বদলে গিয়েছে নাবী ﷺ -এর জন্মের পরে। কিন্তু সন্তান লালন-পালনে মুসলিমদের সফলতা অন্য কিছুর তুলনায় অনেক ভালো ছিলো বর্তমান সময়ের আগ পর্যন্ত। আজকের দুনিয়া এতটা আকস্মিকভাবে বদলে যাচ্ছে যে, এটা শুধু সরকার কিভাবে পরিচালিত হবে তাতে প্রভাব রাখছে না। কিভাবে এক দেশ অন্য দেশের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখছে, কিভাবে ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠছে শুধু তাতেই প্রভাব বিস্তার করছে না বরং এটা আমাদের পরিবারগুলোকেও প্রভাবিত করছে। শুধু মুসলিম পরিবার নয়, সকল পরিবার।

বর্তমান বিশ্ব নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের পরিবারের এখন যেমন অবস্থা দেখতে পাচ্ছি এর আগে কখনো এমনটা ছিল না। সন্তানদেরকে এমনভাবে বড় করা হচ্ছে ইতিহাসের আর কোন যুগে কিংবা অন্য কোন সংস্কৃতিতে এমন আকার ধারণ করেনি। শুধু মুসলিম সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নয়, সবার ক্ষেত্রে। বিশ্বায়ন আর যোগাযোগ ব্যবস্থার বৃহৎ উন্নয়নের কারণে। তার উপর ভোগবাদের চরম পর্যায় সৃষ্টি হওয়ায় একে পুঁজিবাদ না বলে বরং বলা উচিত ভোগবাদ। আমরা পণ্যের আসক্ত ভোক্তায় পরিণত হয়েছি। আর এই মানসিকতা আমাদের ঘরের ভিতরেও প্রবেশ করে ফেলেছে।

একটা ছোট্ট উদাহরণ দেয়া যাক সে ব্যাপারে। আমাদের বাচ্চারা আমাদের কাছে কী নিয়ে সবচেয়ে বেশি আবদার করে? তারা কিসের জন্যে সব সময় বায়না ধরে বসে থাকে? চকলেট? না তারা এখন কেবল চকলেট চায় না! তারা এখন আইপ্যাড, প্লে স্টেশন ইত্যাদি চায়। তারা বড় হয়ে গিয়েছে? তারা এখন খেলনা দিয়ে খেলতে চায় না। তারা এসব আইপ্যাডের খবর কোথায় পায়? তারা কি স্বপ্নে দেখতে পায়? না। হয় তাদের বন্ধুর কাছে এসব আছে অথবা

টিভিতে দেখেছে। তারা যখন দেখল তার অন্য বন্ধুদের এসব আছে তারা বলে 'আমি ওরকম স্নিকার চাই' 'আমি ওরকম শার্ট চাই' 'আমি ওরকম খেলনা চাই'।

এরকম খেলনার আইডিয়া তারা কোথায় পায়? এসবের ইলহাম কোথা থেকে আসে? এসব এসেছে মিডিয়া থেকে। আমরা আমদের বাচ্চাদের সামনে মিডিয়ার জগৎটা উন্মুক্ত করে দিয়েছি। আর এই মিডিয়া, বাচ্চাদেরকে মূলতঃ এসব খেলনার জন্যে বায়না করতে শেখায়। যেন আমরা তাদের এসব খেলনা কিনে দেই। আর তখন আমরা এগুলো কিনি। তাছাড়া বাচ্চারাই যে এসবের একমাত্র শিকার তা কিন্তু নয়, আমরাও এর অন্তর্ভুক্ত। আমরা যেসব ব্রান্ডের ড্রেস পরি, তখন আমরা আসলে নিজেকে খুব হাই ক্লাস মানুষ ভাবতে শুরু করি যখন আমি একটা দামি ঘড়ি পরি। হঠাৎ যেন আমার মনে হতে থাকে সব মানুষের ভিড়ে আমার মান-মর্যাদা বেশী। যেই মুহূর্তে আমি একটা অ্যাপল স্টোর থেকে একটা আইফোন হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসি হঠাৎ যেন আমার নিজেকে খুব হ্যান্ডসাম লাগে! কিছু একটা তো হয়েছে। আমি বুঝতে পারছি না আমি কিভাবে এত কুল হয়ে গেলাম, এটা জাস্ট হয়ে গেল! আমরা আসলে ভেবে নিই মানুষ হিসেবে আমাদের মর্যাদা বেড়ে গিয়েছে এসব পণ্যের ক্রেতা হয়েছি বলে।

আর আমি যদি কোনো ব্র্যান্ড-এর কাপড় না পরি, অথবা ওই ফোনটা যদি আমার না থাকে কিংবা আমার এই খেলনাটা নেই অথবা ওই খেলনাটা নেই তাহলে আমি মূল্যহীন। কোন কারণে আমি অন্যদের সমমান সম্পন্ন নই। অন্যরা আমার চেয়ে ভালো। শুধু এই কারণে যে, তাদের হাতে যেটা আছে সেটা আমারটার থেকে ভালো। তো আমরা মুসলিম আমরা কেমন যেন অচেতন ভোক্তায় পরিণত হয়ে গিয়েছি। এমনটাই আমাদের অবস্থা।

এই সমাজে সন্তান লালনের কথা বলার আগে আমাদের এটা বুঝতে হবে যে, আর সারা দুনিয়াতে কী হচ্ছে? কার্যকর উপায়ে সন্তান লালনের কথা ভাবতে গিয়ে আমাদের এসব ব্যাপারে ভেবে দেখতে হবে। এটা একটা বড় সমস্যা। দ্বিতীয় বড় সমস্যা হল, আমার কাছে সাফল্যের মানে কি? কিসে আমাদের মর্যাদা বাড়ায়? এখনতো বাচ্চাদেরকে এই মানসিকতা দিয়ে বড় করা হচ্ছে যে তাদের মূল্য এই প্রোডাক্ট দ্বারা নির্ধারিত হয়... যে ব্রান্ডের কাপড় পরছে, যে বাসায় থাকছে, যে গাড়িটা চালিয়ে তাকে স্কুলে দিয়ে আসা হচ্ছে, যে ব্রান্ডের ব্যাগ কাঁধে নিচ্ছে, এসব ব্যাপার! এগুলোই আমাদের মূল্য যাচাই করছে! আর

এর সাথে যোগ হয়েছে আরও একটা সমস্যা ঃ জীবনে সফলতা বলতে কি বুঝায়?'

সাফল্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা ২০, ৩০, ৪০ বছর আগেও যা ছিল... মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশের জন্য ব্যাপারটা সত্য যে, আমাদের মধ্যে কারও কারও হয়ত শিক্ষার ভালো সুযোগ ছিল না, কিংবা আমাদের বাবা-মায়ের সুযোগ হয়নি। তো তারা তাদের সব ধরনের প্রচেষ্টা লাগিয়ে দেয় তাদের বাচ্চাকে শিক্ষিত করে তুলতে। আর আমি আমার জীবন থেকে এই শিক্ষা পেয়েছি তাই আমি বলি 'আমি আমার বাচ্চার জন্য সর্বোচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা রাখব'। যদিও এই ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে আমার তাকে প্রাইভেট স্কুলে পাঠাতে হয়, বাড়ি ভাড়া করতে হয়, অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিতে হয়, অস্বস্তিকর পরিবেশে থাকতে হয়, তারপরেও তাদের সুশিক্ষার স্বার্থে আমি তা করতে রাজি আছি। যদিও আমাকে অস্বাভাবিক লোন নিতে হয়... কেন? কারণ আমাদের কাছে সাফল্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ কি? আমাদের সন্তানদের সুশিক্ষা।

আর এখানে যারা আমাদের সন্তান, তাদেরকে বার বার বলা হয়েছে। তোমাকে শিক্ষা নিতেই হবে। তুমি একজন ব্যর্থ মানুষে পরিণত হবে যদি শিক্ষা না পাও। তোমাকে ডাক্তার হতে হবে, ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে, এটা পাস করতে হবে, ওটা পাস করতে হবে ইত্যাদি। এখন আমার জন্য কেবল একটাই দরজাই খোলা আছে আর সেটা হলো আখিরাত। কারণ আমি ডাক্তার হতে পারিনি দেখে আমার মা-বাবা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না। তবে খেয়াল করি ডাক্তার হওয়া আমাদের একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কাছে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? কারণ নাম ও টাকা। এজন্যে না যে আমি কারও জীবন বাঁচাতে পারছি কিংবা মানবতার সাহায্য করছি। এ ধারণার সাথে ডাক্তার হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই!

আমাদের মাঝে কোন উৎসাহ নেই নিজেদের সন্তানকে উদ্ধারকর্তা হিসেবে দেখার। মা-বাবা খুব খুশি হয়ে যায় যখন দেখে ছেলে ডাক্তার হয়ে ফিরছে। কিন্তু ছেলে যদি বলে 'আমি তিন বছরের জন্য ওয়াল্ড ভিশন এনজিওতে ভলান্টিয়ার কাজ করবো। আমি বাংলাদেশের বন্যা কবলিত এলাকায় যাবো, এরপর আমি আফ্রিকা যাবো তারপর ফিলিস্তিনিদের সাহায্যার্থে যাবো, আমি শুধু সেবা দান করব, এই তিন বছর বেতন নিব না, কোন লাভের জন্য কাজ করব না, শুধু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মানব সেবা করব।' তখন সেই মা-বাবা বলবে "ইয়া আল্লাহ! আমরা আমাদের সব টাকা পয়সা ঢেলে দিয়েছি তোমাকে ডাক্তার বানাবার জন্যে আর এখন তুমি এসব করবে? নিজের খেয়ে

বনের মহিষ তাড়াবে? তুমি কেন বিনা পারিশ্রমিকে অসহায় মানুষদের জীবন বাঁচাবে? তোমার সমস্যা কি?" এই হলো আমাদের বাস্তব চিত্র।

এদিকে আমরা ভাবি আমাদের ছেলেমেয়েদের মাঝে ঝামেলা আছে! আমাদের উচিত আয়নায় আমাদের নিজেদের দেখা। আমরা আসলে কাদের তৈরি করছি? কোন একটা ব্যাপার একদম গোড়া থেকে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। আমাদের কাছে সাফল্য হলো টাকা-পয়সা। শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা হলো এমন একটা ক্যারিয়ার যাতে অনেক টাকা আসে। সবকিছুর মূলেই অর্থ-সম্পদ। আমি যদি সফল হই, এর মানে এই যে, আমার অনেক টাকা আছে। আমি যদি সফল হই, এর মানে এই যে, আমি শিক্ষা অর্জন করেছি, কিন্তু শিক্ষা অর্জন করেছি কোন ফিল্ডে? যেখানে আমার একটা ভালো ক্যারিয়ার হবে, যার মানে যেখানে আমি অনেক টাকা পয়সা পাবো! এটাই এখন সাফল্যের সংজ্ঞা।

সবশেষে কথা একই। এই ধারণা আগের যুগ থেকে ভিন্ন। আগে সকলের ধারনা ছিলো আমি শিক্ষিত হয়েছি এর মানে হচ্ছে আমি নিজেকে বুঝি, আমার চারপাশের পরিবেশকে বুঝি, আর আমি পৃথিবীকে আরও সুন্দর বাসযোগ্য করে তোলার জন্য কাজ করছি। আর এর জন্য কখনো আমাকে ইতিহাস পড়তে হবে, কখনো সামাজ বিজ্ঞান পড়তে হবে, কখনো পলিটিক্যাল সাইন্স পড়তে হবে, কখনো সাংবাদিকতা নিয়ে পড়াশুনা করতে হবে। কেবল একটা ক্ষেত্র নিয়েই পড়ে থাকলে চলবে না। আর তাছাড়া যে দিক থেকেই বিচার করি না কেন, সবচেয়ে সফল কমিউনিটি হলো তারাই যারা নিজেদের ছেলেমেয়েকে কেবল একটা ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখেনি।

এখন সন্তান বড় করা সম্পর্কে অল্প কিছু কথা বলা যাক। সবচেয়ে আগে আমাদের মানসিকতা বদলাতে হবে। তারা যদি আমাদের মাঝে সফলতার সঠিক সংজ্ঞা খুঁজে না পায়, তারা যদি আমাদের ব্যক্তিত্বে এর প্রতিফলন না দেখতে পায়, আমাদের দৈনিক কথাবার্তায়, তবে আমরাও এটা আশা করতে পারি না যে তারা সফলতার সঠিক মানে নিজে থেকে বুঝে নিয়েছে। তাদের কাছে এ নির্দেশনা আমাদের পক্ষ থেকেই আসতে হবে। আমরা যা নিয়ে সব সময় কথা বলি, আমাদের কাছে যে বিষয়গুলো সব সময় গুরুত্বপূর্ণ, যখন স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সঙ্গে কথা বলি তখন বাচ্চা তা শুনতে থাকে, তাই না? তাদের কান সবসময় খোলা থাকে। এখন আমরা যদি বিল ফাঁকি দেয়া নিয়ে কথা বলি, বাড়িওয়ালা বা ভাড়াটিয়ার বদনাম করি কিংবা আমরা সবসময় নাটক-সিনেমা নিয়ে কথা বলি কিংবা অন্য পরিবার সম্পর্কে কেবল বাজে কথা

বলি, তারা কি করে না করে, এসব আলাপ-আলোচনা করি! তারা ভেবে নিবে যে বড়রা এমনই, আমার মা-বাবা এসব করে! এগুলো তাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে।

কিন্তু আমি আর আমার স্ত্রী যদি কুরআন নিয়ে কথা বলি, আখিরাত নিয়ে কথা বলি, অন্যের জন্য ভালো কিছু করার কথা বলি, কাউকে সাহায্য করার কথা বলি, তারা আমারটা দেখে শিখে নিবে। আমার তাকে লেকচার দিতে হবে না এ ব্যাপারে, তারা কেবল আমাকে দেখবে। সবচেয়ে কার্যকর প্যারেন্টিং সেটাই যেখানে বাচ্চাকে কোন কাজ করাতে মা-বাবার কিছু বলতে হয় না, তারা মা-বাবাকে দেখে দেখে শিখে ফেলে। কারণ তারা এসবই সব সময় দেখেছে।

সন্তানদেরকে সময় দেয়া

বর্তমানের তরুণ প্রজন্মের নিকট সবচেয়ে জনপ্রিয় ইসলামিক স্কলার হচ্ছে নুমান আলী খান। অনেক মা-বাবারাই তার কাছে যান এই বলে যে, "আপনি কী আমার সন্তানের সাথে একটু কথা বলতে পারবেন?" এই মা-বাবাদের মধ্যে বেশীরভাগই টিনেজারদের মা-বাবা। টিনেজারদের মা-বাবা প্রায় সময়ই তার কাছে যান বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে। যেমন বলেন, "আমার ছেলেটা না, আমার কথা শোনেই না আজকাল। আপনি ওর সাথে একটু কথা বলবেন?" তখন তিনি মনে মনে বলেন বরং আপনি নিজে আপনার ছেলের সাথে কথা বলছেন না কেন? কোথায় ছিলেন আপনি যখন তার সাথে কথা বলার প্রকৃত সময় ছিল?

মা-বাবা এবং স্বামী-স্ত্রী এই দু'টো খুবই মৌলিক সম্পর্ক। একটা আমাদের সন্তানদের সাথে, আরেকটা আমাদের জীবনসঙ্গীর সাথে। এই দু'টো সম্পর্কের ব্যাপারেই খুব বেসিক কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক। আমাদের সন্তান যখন ছোট, খুবই ছোট, ধরি যখন তাদের বয়স পাঁচ, ছয়, সাত, দুই, তিন, চার, তখন তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন্ জিনিসটি? তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আমাদের সমর্থন। তারা মা-বাবাকে গর্বিত করতে চায়। তারা যা যা করেছে সব মা-বাবাকে দেখাতে চায়।

ধরি, আমি জরুরী কোনো কাজের আলাপ করছি ফোনে, আর এ সময় আমার দুই বছরের ছেলে এসে বলবে, "আব্বু আব্বু আব্বু আব্বু।"..."ভাই একটু লাইনে থাকেন"..."কী হয়েছে?"..."হে হে হে" ব্যস! আমি আবার ফোনালাপে

ফিরে গেলাম, সে আবার আমাকে ডাকা শুরু করল। আমি বললাম, "আচ্ছা ঠিক আছে, কী হয়েছে বলো" ... "আমি তোমাকে একটা জিনিস দেখাবো" "কি দেখাতে চাও বাবা? সে হয়তো একটা লাফ দিয়ে বাবাকে দেখালো ... ব্যস এটাই! কিন্তু আমার এ ক্ষেত্রে কী করা উচিত? অনেক বাবাই হয়তো বিরক্ত হবে বা তাকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিবে, এটা মোটেও ঠিক না।

বরং বন্ধুর সাথে ফোনের কথা বন্ধ করে দিয়ে শিশুটিকে উৎসাহ দিয়ে বলা যেতে পারে, "আল্লাহ! দারুন তো! আবার করো দেখি।" আমাদের সন্তানরা যা যা করে আমাদের উচিত তার কদর করা। এটা তাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক। অন্য যে কোনো কিছুর চেয়ে বেশি তারা এটাই চায় আমাদের কাছ থেকে। ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য কি আমরা তা জানি কিনা? ছেলেরা এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না, আর মেয়েরা কথা বলা থামাতে পারে না।

আমার (নুমান আলী খান) মেয়েরা একজন ক্লাস ওয়ানে আরেক জন ক্লাস থ্রিতে পড়ে আমি ওদের স্কুল থেকে বাসায় নিয়ে আসি ২৫ মিনিট গাড়ি চালিয়ে। আর এই পুরোটা সময় তারা কি করে জানেন? একজন বলতে থাকে "জানো আজকে ক্লাসে কি হয়েছে? আমরা একটা ডাইনোসর রং করেছি, এটা করেছি, ওটা করেছি, প্রথমে আমি বেগুনী রং করলাম, তারপর ভাবলাম একটু সবুজ রং-ও দেই"- এভাবে বলতে থাকলো তো বলতেই থাকলো। থামার কোনো নামই নেই। থামা সম্ভবই না ওদের পক্ষে। আর আমাকেও মনোযোগ দিয়ে সেটা শুনতে হবে। আমি বললাম, "ও তাই? নীল রং দাও নি?" .. "না অল্প একটু নীল দিয়েছি"। আমাকে মনোযোগ দিতে হবে।

অন্য একটা গল্প বলি। আমার (নুমান আলী খান) বড় মেয়েটা, হুসনা, যখন ছোট ছিল তখন আঙ্গুল দিয়ে ছবি আঁকতে খুব পছন্দ করত। সে তার আঙ্গুলগুলো রঙের মধ্যে চুবিয়ে তারপর সেগুলো দিয়ে হাবিজাবি আঁকত। তো একদিন এক বিশাল কার্ডবোর্ড নিয়ে সে আমার কাছে হাজির! সেখানে নীল রং দিয়ে বিশাল কি যেন আঁকা, আগামাথা কিছুই বুঝলাম না। সে বলল, "আব্বু, দেখো আমি কী এঁকেছি?" আর আমি বললাম, বাহ, দারুন! একটা পাহাড়!" আর সে বলল, "না এটা তো আম্মু। আমি বললাম, "খাইছে!" "আম্মুকে এই কথা বোলো না কিন্তু"। তবে যে কথাটা বলতে চাচ্ছি তা হলো ওরা আমাদের সমর্থন পাওয়ার জন্য ব্যাকুল। ব্যাকুল তারা এর জন্য।

কিন্তু যাদের সন্তানরা টিনেজার, এমন কি হয় যে স্কুল থেকে আনার সময় তারা গাড়িতে উঠে কথা বলা থামাতে পারছে না? হয় এমন? জানো আজকে ক্লাসে কি হয়েছে? টিচার এটা বলেছে, ওটা করেছে, পরীক্ষায় 'এ' পেয়েছি" । না! তারা একদম চুপ! বরং মা-বাবারাই তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করে, "কেমন গেলো দিন?" ... "মোটামুটি".. "কি করলে সারাদিন?" ... "কিছু একটা" "আজকে কোথায় যাবে?" ... "যাব কোথাও" । কথা বলেই না তারা! তাদের কথা বলানো অনেকটা পুলিশের আসামীকে জেরা করার মত ব্যাপার । মা-বাবাকে তারা কিছুই বলে না, এক দুই শব্দে উত্তর দেয় । আর যখন মা-বাবা তাকে প্রশ্ন করছেন, তখন হয়ত সে তার বন্ধুকে এস.এম.এস পাঠাচ্ছে, "আব্বু আজকে বেশি প্রশ্ন করছে! ঘটনা কি? তুমি ওনাকে কিছু বলেছ নাকি.... ?"

ছোট বয়সে আমাদের বাচ্চারা আমাদের মনোযোগ পাওয়ার জন্য পাগল থাকে । আর যখন তারা বড় হবে, তখন আমরা তাদের মনোযোগ পাওয়ার জন্য পাগল হবো । কিন্তু তারা যখন ছোট থাকে তখন যদি আমরা তাদের মনোযোগ না দেই তারা খেলনা নিয়ে আমাদের কাছে আসলে যদি বলি, "ঘরে যাও! আমি সংবাদ দেখছি", "খেলা চলছে । এই, তুমি একটু সরাও তো!", "সারাদিন অনেক কাজ করেছি, এখন ওকে সামলাতে পারব না","বাসায় আমার বন্ধুরা এসেছে, কি বলবে ওরা? যাও ঘুমাতে যাও! যাও এখান থেকে" ইত্যাদি! এগুলো মোটেও ঠিক না ।

আমরা যখন ওদের সাথে এমন আচরণ করবো, যেন তারা আমাদের জন্য প্রতিবন্ধকতা, আমাদের কাজ হচ্ছে চাকরি করা, আর বাসায় এসে শুধু বিশ্রাম নেয়া? আসলে আমাদের কাজ শুরু হয়েছে তখনই যখন আমরা ঘরে ফিরি । সেটাই আমাদের আসল কাজ । চাকরিতে যে কাজ করেছি সেটা শুধুমাত্র এজন্য যেন ঘরের আসল কাজটা ঠিকমত করতে পারি । একজন প্রকৃত বাবা হই । আমাদের সন্তানদের সাথে সময় কাটাই । তারা শুধু এ জন্য নয় যে আমি তাদের স্কুলে ছেড়ে দিয়ে আসবো, আর বাসায় ফিরে শুধু ঘুমাতে যাবো, কোনো ঝামেলায় যাবো না, তাদের সাথে কথা বলবো না । এবং তাদের সাথে কথা না বলার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে তাদের একটা আইপ্যাড টাচ অথবা আইফোন ধরিয়ে দেয়া, তাদের নিজস্ব রুমে একটা কম্পিউটার বা ল্যাপটপ দিয়ে দেয়া হাই-স্পিড ইন্টারনেট সহ! সুতরাং আমাদেরকে তাদের চেহারাও দেখতে হবে না । তারা সারাদিন তাদের ঘরে ফেইসবুকিং করতে থাকবে, অনলাইনেই নিজেদের জন্য নতুন মা-বাবা খুঁজে নিবে না হয় ।

আসুন আমরা প্রকৃত বাবা হই, প্রকৃত মা হই। আমাদের মাতৃত্ব বা পিতৃত্বের বদলি হিসেবে এইসব জিনিসকে আসতে না দেই। কারণ যদি তা না দেই, তাহলে ওরা যখন স্বাবলম্বী হয়ে যাবে তখন বেশির ভাগ মা-বাবার কী হয়? বেশিরভাগ ছেলেমেয়েরা মা-বাবাকে দেখে কতগুলো টাকার মেশিন হিসেবে। শুধুমাত্র কখন তারা মা-বাবার কাছে আসে? "বাবা, আমাকে ৫০০ টাকা দাও তো" অথবা "শপিং মলে যেতে চাই, আমাকে একটু পৌঁছে দাও তো", বন্ধুদের বাসায় যাই?" "এটা করতে পারি?" "ওটা কিনতে পারি?" যখন তাদের কোনো কিছুর দরকার তখন তারা আমাদের কাছে আসে। এর বাইরে আমরা তাদের খুঁজেও পাবো না।

আর যখন তারা বড় হবে, নিজেরাই একটু কামাই করতে পারবে, তখন কি হবে? তাদের দেখাই পাবো না আর। কারণ আমাদের টাকার মেশিনও এখন আর দরকার নেই। এর প্রয়োজন শেষ। সন্তানদের সাথে আমরা যদি এই ধরনের সম্পর্ক তৈরী করি, তাহলে আমরা নিশ্চিত বিপর্যয়ের দিকে এগোচ্ছি। আমাদেরকে এখনই পরিবর্তন আনতে হবে। আর পরিবর্তনের উপায় হলো- হয়তো এটা অনেকের জন্যই করাটা কঠিন হবে- কিন্তু আমাদেরকে সন্তানদের সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে। আমাদেরকে তাদের সবচেয়ে কাছের বন্ধু হতে হবে। আমাদের সাথে সময় কাটানোটা তাদের কাছে উপভোগ্য হতে হবে।

সন্তানদের মিথ্যা বলার কারণ ও প্রতিকার

আমাদের যে বিষয়টিতে গুরুত্ব দেয়া উচিত, তা হল শিশুদের মিথ্যা কথা বলা। শিশুরা মিথ্যা বলে কিন্তু তারা বুঝাতে চাইবে যে তারা মিথ্যা বলেনি। তারা বলবে আমি এটা বলিনি, ওটা বলিনি, আমি এটা কখনও বলিনি, সত্যি বলছি। নিম্নে মা ও শিশুর উদাহরণ স্বরূপ একটি কথোপকথন দেখা যাক ঃ

মা: তুমি এটা আমাকে বলেছো, আমি সেখানে ছিলাম।
শিশু: আমি বলিনি।
মা: আমি এটা রেকর্ড করেছি। এই হল ভিডিও।
শিশু: আমি এটা বলিনি।

ভিডিও দেখার পরেও তারা বলে, আমি এটা বলিনি। তারা স্বীকার করে না। তারা কোন ভাবে নিজেদের বুঝিয়ে নেয়।

আমরা কি জানি কেন এটা ঘটে? এটা ঘটে, কারণ প্রথম বার সে যখন মিথ্যা বলেছিল এবং সে স্বীকার করে নিয়েছিল তখন মা রাগ হয়ে তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিল। যেন কিয়ামত ঘটে গেছে। তুমি? মিথ্যা বলেছ? আমার ঘরে? প্রথমে মা হয়তো বলেছেন যে, আমাকে সত্য বলো, কিচ্ছু হবে না। যখন সে সত্য স্বীকার করল, তখন মা তাকে প্রহার করলেন। পরবর্তী সময়ে, সে মনে মনে ভাবলো, আমি এতসব (বকা-ঝকা) গ্রহণ করতে রাজি। যখন আমি স্বীকার করে নিব আমি মিথ্যা বলেছি, আমি জানি এরপর কি হবে আমার। আমি এই অপরাধ (সত্য স্বীকার) আর করতে যাচ্ছি না। অপরাধ স্বীকারের কোন মূল্য এই বাসায় নেই।

আমাদেরকে এটা সর্বপ্রথম বন্ধ করতে হবে। আমি অতিরিক্ত শাস্তি দিতে পারবো না এমন কিছুর জন্য যা ঘটে গেছে এবং ইতিমধ্যেই আমাকে রাগান্বিত করেছে। এটা সংশোধন প্রক্রিয়া নয়। মা রাগান্বিত কারণ বাচ্চা মিথ্যা বলেছে, অথবা খারাপ কিছু করেছে। তারপর সে রাগান্বিত, কারণ সে কাজটি সম্পর্কে মিথ্যা বলেছে। তারপর সে রাগান্বিত কারণ সে জিজ্ঞেস করছে- সত্য বল, আমি তোমাকে শেষ বারের মত জিজ্ঞেস করছি। আমি শেষ বারের মত জিজ্ঞেস করছি। যদিও সে আরও ৬ বার জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছে। কিন্তু সে বলে, শেষ বারের মতো আমাকে বল, আমি এই শেষ বারের মত জিজ্ঞেস করছি, আমি আর দ্বিতীয় বার জিজ্ঞেস করবো না। তুমি কি এটা করেছ? (শিশু) না। ঠিক আছে আমি তোমাকে এই শেষ বারের মত জিজ্ঞেস করছি। তোমার বাবাকে বলার আগে আর একবার। আমি এটা করেনি ৩ বার। সে বিছানায় যাবে, কান্নাকাটি করবে, কিন্তু সে স্বীকার করবে না। সে এটার উপরে অটল থাকবে। এই ছেলেকে নিয়ে আমি কী করবো? এরপর মা বলেন, আমি জানি তুমিই এটা করেছ। আমি জানি তুমিই এটা করেছ। মা হয়তো আরও বেশি রাগান্বিত হয়ে যান। সে হয়ে যায় আরও বেশি রক্ষণাত্মক। সবশেষে, মা নিজের চুল ছিঁড়তে থাকেন। জানি না এটার শেষ কোথায়? এবার বাবা অফিস থেকে ঘরে আসলে মার অভিযোগ! আমি জানি না একে নিয়ে কী করব! সে মিথ্যা বলেছে! এবার বাবা আবার নতুন করে শুরু করলেন। বাবা: তুমি মিথ্যা বলেছ? শিশু: না।

কিভাবে আমরা এই সমস্যার সমাধান করবো? আমাদেরকে ঐ পরিস্থিতিগুলো নিতে হবে এভাবে, কিছু কিছু সময় আমরা তাদেরকে বিশ্বাস করবো, যদিও আমরা জানি তারা মিথ্যা বলছে। বলতে হবে, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। তুমি আমার সাথে মিথ্যা বলবে না। তুমি শেষবার কথা দিয়েছ যে, তুমি মিথ্যা

বলবে না। তাই আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। ঠিক আছে। তোমার কোন সমস্যা নেই। তাকে এই মিথ্যা বলাতে ৩/৪ বার সুযোগ দিতে হবে। কল্পনা করি। কি ঘটতে পারে। শিশুরা স্বভাবগতভাবে খারাপ না। তাদের প্রকৃতিতেই রয়েছে সততা। তাই যখন তারা খারাপ কিছু করে এবং আমরা সেজন্য তাদেরকে শাস্তি দেই না, তখন তাদের সুযোগ হয় বিবেককে প্রশ্ন করার। যদি আমরা এর জন্য তাদেরকে শাস্তি দেই, তাদের বিবেক কাজ করার সুযোগ পায় না। কারণ তারা এর জন্য ইতিমধ্যেই শাস্তি পেয়ে গেছে। যখন তারা শাস্তি পেয়ে যায়, তখন তাদের অপরাধবোধ আর কাজ করে না। তারা খারাপ কিছু করেছে এবং তার জন্য তারা মূল্যও দিয়েছে। তখন তাদের বিবেকের আর কিছু করার থাকে না।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আরো পরিস্কার হওয়া যেতে পারে। যেমন একটি শিশু তার ছোট বোনের গালে চড় দিয়েছে। আমরা বিষয়টা সামলানোর জন্য তাকে কোন প্রকার শাস্তি না দিয়ে তার সাথে বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য একটি উপযুক্ত সময় বেছে নিতে পারি। সবসময় এটা করার সুযোগ হয়তো পাবো না। এবং বলতে হবে, ঠিক আছে আমি তোমাকে বিশ্বাস করলাম, তুমি এটা করনি তোমার বোন ভুল করেছে, সে ভালভাবে মনে রাখতে পারে নি। তার গালের উপর যে লাল দাগ রয়েছে, সেটা হয়ত কোন ভাবে হয়েছে। ঠিক আছে, তোমার কোন সমস্যা নেই।

সময়ের ব্যবধানে এতে কি হবে আমরা কি তা জানি? এক সময় সে এসে মাকে বলবে, "আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই। আমি এটা করেছি... কান্না...।" তখন মায়ের উচিত হবে তাকে সান্তনা দেয়া, তাকে আদর করা। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি এখনো তোমাকে ভাল জানি। এখানে মা আসলে কি করলেন, মা তাকে রক্ষণাত্বক মনোভাব থেকে সরিয়ে আনলেন। কিন্তু এটা করার জন্য দীর্ঘ সময়ের চিন্তা-ভাবনা প্রয়োজন হয়। প্রথমেই আমরা এটা করতে সমর্থ হবো না। এটা খুব কঠিন এ ধরনের বিষয় ক্ষমা করে দেয়া। বিশেষভাবে যখন তারা আরেকটা বাচ্চাকে আঘাত করে। যদি তারা অন্য বাচ্চার সাথে অন্যায় করে। তাহলে আমাদেরকে সেই বাচ্চাটাকে সান্তনা দিতে হবে। আমি তোমাকেও বিশ্বাস করি। আমি তোমার প্রতি রাগান্বিত নই। এবং আমি জানি যে তুমি কোন অন্যায় করনি।

কিন্তু তুমি খুশি হতে পারবে না যদি সে শাস্তি পায়। এটা আরেক বিষয়, এক বাচ্চা শাস্তি পেলে আরেক বাচ্চা খুশি হয়ে যায়। এবং তারা এতে অভ্যস্ত হয়ে

যায় যে এভাবে বলে, বাবা অন্য দিন সে আমার কান টান দিয়েছে। এবং ছোট জন হয়তো কাছে এসে বললো বাবা, তুমি জানো আপি একদিন আমার কান টান দিয়েছে। বললাম, কখন? (শিশু) আমি জানি না, কোন এক গতকাল। আমি বললাম আমাকে তুমি কি করতে বল? তাকে শাস্তি দাও। আমি বললাম, এতে কি তুমি খুশি হবে? হ্যা... । কখনও কখনও শিশুরা কৌশল অবলম্বন করে যাতে অন্যজন শাস্তি পায়। তারা এটা করে। আমরা হয়তো এই পরিস্থিতিও তৈরী করতে চাই না। যদি এটা একদম ছোট বাচ্চা হয়, ২ বছরের তাহলে সমস্যা মনে হয় না। আমি হয়তো তাদের আনন্দ দিতে চাই। আমি হয়তো বড় জনকে ধরে এভাবে নিজের হাতে নিজে কয়েকবার আঘাত করি এবং বলি, বলো আও, সে তখন বলে আও, আও, আমি ব্যাথা পাই, আমি ব্যাথা পাই। এবং আমি ছোটজনের দিকে ফিরে বলি, তুমি এখন খুশি? হ্যাঁ... । এটা মজার।

কিন্তু বড় সন্তানের বেলায় একজন শাস্তি পেলে যদি অন্য জন খুশি হয় তাহলে এটা একটা সমস্যা। এটা একটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কেন তুমি খুশি এটা থেকে তুমি কি পেলে? এ বিষয়গুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। এ পর্যন্ত দু'টি বিষয় সামনে আসলো, বদ মেজাজ এবং মিথ্যা বলা। মিথ্যা বলার বিষয়টা সমাধান করা একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রচেষ্টা। আমরা ক্ষণিকের মধ্যেই কারো থেকে মিথ্যা বলার অভ্যাস দূর করতে পারবো না। কারণ তারা এটাকে মিথ্যা হিসেবে দেখে না, দেখে নিজেদেরকে রক্ষা করার উপায় হিসেবে। যখন বাচ্চারা অনেক বেশি মিথ্যা বলে, তখন জানি কি ঘটে? তারা তখন নিজেদেরকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। তখন তারা হয়ে যায় সেরা অভিনেতা। তারা বিভিন্ন ভূমিকা নেয়া শুরু করে। এবং তারা এটা জয় করে ফেলে এবং আমরা হয়ে যাই চরম হতভম্ব, এমনকি কোথা থেকে শুরু করবো ঠিক বুঝতে পারি না। যাই হোক, শুরু করতে হবে এই সমস্যাটাকে আক্রমণ করে না, বরং বাচ্চার ভয় তাড়ানোর মাধ্যমে।

টিনএইজ প্যারেন্টিং

চ্যাপটার ১৬

১৩ থেকে ১৯ বছর বয়স

এই বয়সটাকে বলে টিনেইজ (Teenage)। আমরা অনেক মা-বাবারাই জানিনা এই টিনেইজ অর্থ কি বা এ নাম কেন দেয়া হলো। শব্দটি ইংরেজী। ১৩ (থার্টিন) থেকে ১৯ (নাইনটিন) পর্যন্ত এই প্রতিটি বৎসরের শেষে "টিন" শব্দটি আছে তাই এই সাতটি বছরের ছেলেমেয়েদেরকে বলে "টিনএইজ"। এই বয়সে ছেলেমেয়েরা হাইস্কুল, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিতে যায়। প্যারেন্টিং এর মধ্যে এই বয়সটি হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই বয়সটি সন্তানদের জন্য বিপদজনক অর্থাৎ এই বয়সেই ছেলেমেয়েরা বেশী নষ্ট হয়ে যায়, বিপথে চলে যায়, বাবা-মায়ের কন্ট্রোলের বাইরে চলে যায়।

এই টিনেইজ বয়সে ছেলেমেয়েরা সাধারণত যে সমস্যাগুলোতে পরে

- এই বয়সে বিষন্নতায় ভুগে।
- এই বয়সে খারাপ ছেলেমেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব হয়।
- এই বয়সে সিগারেট ও মদ পানে অভ্যস্ত হয়।
- এই বয়সে নানা রকম ড্রাগ এডিকশনে জড়িয়ে যায়।
- এই বয়সে বিভিন্ন রকম সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সাথে জড়িয়ে যায়।
- এই বয়সে বিভিন্ন রকম গ্যাংয়ের সদস্য হয়।
- এই বয়সে টাকা দিয়ে জুয়া খেলার নেশায় পরে যায়।
- এই বয়সে রাত করে বাড়ি ফিরে।
- এই বয়সে সাধারণত স্কুল-কলেজ ফাঁকি দেয়।
- এই বয়সে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়ে পরে।
- এই বয়সে তারা পর্নগ্র্যাফির প্রতি আসক্ত হয়।
- উপরের এই সকল কারণে পড়ালেখায় খারাপ করে।

প্যারেন্টিং শিশুর ছোট কাল থেকেই হওয়া উচিত। যে শিশুকে ছোটবেলা থেকে সঠিক নির্দেশনায় গড়ে তোলা হয়নি, ভালো ভালো জিনিষ প্র্যাকটিস করানো হয়নি, তেমন একজন শিশুর টিনএইজ বয়সে এসে তার উপর হঠাৎ করে প্যারেন্টিং-এর সব ফর্মুলা কাজে নাও দিতে পারে। মনে রাখতে হবে যে, আমরা যারা শিশুকালে অবহেলা করেছি এবং সন্তানকে সঠিক নির্দেশনা দেইনি, আমরা যদি আমাদের কিশোর-কিশোরী সন্তানদের হঠাৎ করে সঠিক নির্দেশনা দিতে চাই, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে অনেক ধৈর্যের সাথে কাজটি করতে হবে।

তিনটি বাক্য টিনেইজ সন্তানদের সাধারণত বলা ঠিক না

বর্তমানের সাইকোলজিষ্টরা মা-বাবাদের টিনএইজ সন্তানদের সাথে যুক্তি তর্কের সময় নিম্নের তিনটি বাক্য বলতে বারণ করেন। মা-বাবা হয়তো রাগের বসে বা ফ্রাষ্ট্রেশন থেকে এই সকল কথা বলে ফেলেন এবং পরক্ষণেই ভুলে যান কিন্তু ছেলেমেয়েরা তা ভুলে না। তাদের সাথে চরম মুহূর্তে কথা বলার জন্য সঠিক পন্থা এবং ভাষা জেনে নিতে হবে, ধৈর্যধারণ করতে হবে। তারা যেন কোনভাবেই মা-বাবার কথা থেকে লজ্জা না পায়, ভয় না পায় এবং অপরাধবোধে না ভুগে।

১. তুমি আমাকে পাগল বানিয়ে দিচ্ছ! (You're making me crazy!)
২. তোমার সমস্যাটি কী? (What's wrong with you?)
৩. তোমার ভাল হওয়া উচিত অন্যথায় গোল্লায় যাও! (You'd better ..... or else!)

তাহলে কী বলা যেতে পারে?

১. আমরা বলতে পারি যে, তোমার এই ধরনের আচরণ আমি পছন্দ করি না। তবে তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে কেন এই জাতীয় ব্যবহার ভাল নয় বা উচিত নয় এবং তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে সে কীভাবে এই জাতীয় আচরণ পরিবর্তন করবে।

২. এই ধরনের বাক্য সন্তানদের লজ্জায় ফেলে দেয়। তখন তারা নিজেদের পজিটিভ সামর্থ নিয়েও দিধাদ্বন্দে পরে যায়। তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে তুমি যে কাজটি করছো তা আমাদের কারো জন্যই ভাল না।

৩. এই ধরনের বাক্য সন্তানদের মনে ভীতির সৃষ্টি করে এবং তাদের খারাপ পথে চলে যেতে সাহায্য করে। এই ক্ষেত্রেও তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে, তুমি যখন এমন আচরণ করো তখন আমি ভাল অনুভব করি না, যা পরিবাররের জন্য এবং প্রতিবেশীদের জন্যও ক্ষতিকারক।

আমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে টরন্টো ইউনিভার্সিটিতে Teenage Parenting এর উপর একটি কোর্স করেছিলাম। সেই কোর্সের কিছু উল্লেখযোগ্য অংশ মা-বাবাদের শিক্ষণীয় হিসেবে তুলে ধরা হলো। কোর্সটি পরিচালনা করেছিলেন ইংল্যান্ড থেকে আগত ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারি। তিনি ব্রিটিশ মুসলিম কমিউনিটিতে একজন Educationalist, Community activist and Parenting consultant হিসেবে দীর্ঘদিন যাবত কাজ করে যাচ্ছেন।

Course Components

1. Balanced growth and development
2. Parent-child relationship
3. Discipline and control
4. Family and Community perspective
5. Faith, Culture and Spirituality

Some Useful Tips

We should:

- Watch our own mood & try to be role models.
- Listen to them on identity, modesty, humility, discipline, self-control.
- Give them sufficient space and freedom.
- Understanding their changing life and psychology.
- Empathise with them & be transparent.
- Apologies for our mistake & accept their apology.
- Involve them in creative activities.
- Sensitively talk on important e.g. sex.
- Avoide being dawn into sibling arguments.

- Encourage them, recongnise their worth & reward them to gradually take responsibility.
- Avoide passing on our stress & keep family arguments out of them.
- Discipline them according to their age, but avoid scolding them in front of their friends.
- Maintain a good relationship with their school.
- Build a sound and everlating relationship with them.

Useful Tips for Teenage Parenting

Regarding post-adolescence children, we should:

- Treat them according to their age.
- Involve them in decision-making at home.
- Be consistent in our talk and behaviour.
- Apologise when we make mistakes.
- Be principled in our every day dealings.
- Negotiate and bargain with them when necessary.
- Give them space and necessary freedom.
- Encourage them to think and reflect.
- Inculcate the pride of being what they are.
- Make a habit to practise our faith.
- Socialise with good families.
- Creat good relations with neighbors.
- Arrange regular family sessions.
- Provide decent recreation.
- Enjoy their company.
- Create s spiritual environment around.

Parenting Styles

Parents are the people of authority; they are the leaders, teachers, mentors, role models and friends of their children.

How they talk & behave are important. There are basically four parenting styles. e.g.

Parenting Style	What does it mean?	Example
Authoritarian	• Often aggressive • Control freak • Voice is harsh, goal is to dominate or win • Children are just supposed to obey	*do's and don'ts*
Permissive	• Very libertine attitude, passive • Children should not be guided, as this inhibits their qualities • Voice is hesitant, goal is to avoid conflict	*s/he is still a child*
Authoritative	• Assertive but rational, flexible and consistent • Showing respect for oneself and others • Children needs guidance, but convincing • Voice is firm but sensible, goal is mutuality	*I'll explain, but please do it*
Neglectful	• Not interested • It's a burden	*I am busy*

Teenage & Romance

- Attraction for opposite sex is embedded in our life. This germinates during puberty when boys & girls see the world in the prism of romance. In permissive society sexual indulgence with lust for opposite sex can occupy a teenager's life.

- Parents need to understand this. They should give extra quality time to their teenage boys & girls & become extra empathetic, vigilant and patient.
- Parents should be open with them, albeit within dignity & Islamic mannerism, and discuss sensitive issues of sex & relationship in the context marital and family responsibility.
- Fathers should discuss masculine issues with their sons & mothers with daughters on feminine, within Islamic ethics.
- Older siblings should be brought in to help their younger siblings on this.

যে সকল ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেছে কিন্তু ছোটবেলায় বাবা-মা থেকে দ্বীনি শিক্ষা পায়নি

যে সকল পিতামাতার সন্তানরা বড় হয়ে গেছে কিন্তু সন্তানের ছোটবেলায় পিতামাতার ইসলামের উপর সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে সন্তান-দেরকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারেননি! সত্য হলেও আজ অতি দুঃখের বিষয় যে এই বড় হয়ে যাওয়া সন্তানরা পিতামাতার সামনে অনৈসলামী জীবনযাপন করছে। এখন আর তারা বাবা-মার উপদেশ গ্রহণ করছে না, তারা তাদের ইচ্ছানুযায়ী চলছে। এখন প্রশ্ন ঃ এই বাবা-মা কী করবেন?

হতাশ হওয়া যাবে না। হাল ছেড়ে দেয়া যাবে না। উপদেশের মাধ্যমে তাদেরকে বুঝাতে হবে আর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা'আলা যেন সন্তানদেরকে হিদায়াত দান করেন। আর পূর্বের ভুলের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে যেন আখিরাতের ময়দানে এই সন্তান পিতামাতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দেয়। এ বিষয়ে সঠিক সহায়তা পাওয়ার জন্য আমাদের প্রকাশিত ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজের ১১ নং বই "মুসলিম পরিবারের ছেলেমেয়েরা কেন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে?" বইটি পড়ার পরামর্শ রইলো।

হেলথ্ টিপ্স
(কিছু স্বাস্থ্য পরামর্শ)

চ্যাপটার ১৭

কিছু প্রশ্ন

১. আমার সন্তান কি ঠিক মতো পানি পান করতে চায় না?
২. আমার সন্তান কি প্রায়ই কোষ্ঠকাঠিন্যতে ভুগে?
৩. আমার সন্তান কি স্কুলে টিফিন দিলে তা না খেয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসে?
৪. আমার সন্তান কি স্কুলে অস্বাস্থ্যকর লাঞ্চ কিনে খায়?
৫. আমার সন্তান কি মাত্রাতিরিক্ত আহার করে?
৬. আমার সন্তান কি শাক-সব্জি ও ফল-মূল খেতে চায় না?
৭. আমার সন্তান কি একদম ছোট মাছ খেতে চায় না?
৮. আমার সন্তান কি দুধ-ডিম খেতে পছন্দ করে না?
৯. আমার সন্তান কি প্রায়ই দেরীতে ঘুমাতে যায়?
১০. আমার সন্তান কি প্রায়ই দেরী করে ঘুম থেকে উঠে?
১১. আমার সন্তান কি মাঝেমধ্যেই দাঁত ব্রাশ করতে চায় না?
১২. আমার সন্তান কি প্রতিদিন গোসল করতে চায় না?
১৩. আমার সন্তান কি অপরিষ্কার থাকে?
১৪. আমার সন্তান কি বাইরে থেকে এসে হাত-মুখ ধোয় না?
১৫. আমার সন্তান কি নোংড়া কাপড়-চোপড় পরতে পছন্দ করে?
১৬. আমার সন্তান কি প্রায় ঠান্ডাজনিত রোগে ভুগে?
১৭. আমার সন্তান কি প্রায় জ্বরে ভুগে?
১৮. আমার সন্তান কি একেবারেই ব্রেইন খাটাতে চায় না?
১৯. আমার সন্তান কি দিন দিন অলস হয়ে যাচ্ছে?
২০. আমার সন্তান কি মাঝেমধ্যে বিষন্নতায় ভুগে?

খাওয়ার রুটিন পরিবর্তন করা

আমাদের দেশে তিন বেলা খাওয়ার রুটিনটি স্বাস্থ্যসম্মত নয়। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান যা বলে আমরা তার উল্টোটা করি। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বলে সকালের নাস্তা হতে হবে খুবই ভারী, দুপুরের লাঞ্চ হবে সকালের চেয়ে একটু হালকা এবং রাতের ডিনার হবে দুপুরের লাঞ্চের চেয়ে আরো হালকা। রাতের ডিনার সেরে ফেলতে হবে সন্ধ্যার আগে অর্থাৎ ৬টার মধ্যে। রাতে আর কোন ভাত জাতীয় ভারী খাবার খাওয়া যাবে না। রাতে যদি খিদে লাগে তাহলে হালকা কিছু খাওয়া যেতে পারে যেমন ফল-মূল ইত্যাদি। আমাদের দেশে আমরা তিন বেলা খাবারের মধ্যে শর্করা জাতীয় খাবারের পরিমাণ বেশী রাখি যেমন ভাত বা রুটি জাতীয় খাবার যা শরীরে ফ্যাট তৈরী করতে সাহায্য করে। তাই খাবার মেনু থেকে শর্করার পরিমাণ কমিয়ে অন্যান্য আইটেম বাড়াতে হবে।

শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য ও সমাধান

শিশু একটু বড় হলেই সাধারণতঃ টয়লেট করার একটা নির্দিষ্ট সময় করে নেয়, এবং দিনে এক দু'বারের বেশি করে না। কিন্তু শিশু যদি কোনদিন একবারও তার সময়ানুযায়ী টয়লেট না করে তাহলে মা ভীষণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং কিছুক্ষণ পরপরই পটিতে বসিয়ে টয়লেট করানোর জন্য চেষ্টা করেন। এতদসত্ত্বেও প্রায়ই দেখা যায় শিশু ঠিকমত টয়লেট করছে না, অথবা করলেও তা বেশ শক্ত।

অধিকাংশ মা-ই তার সন্তানের ডায়ারিয়া বা পেট খারাপের ভয়ে শিশুকে পাতলা করে দুধ খাওয়ান। কৌটার গুঁড়ো দুধ খাওয়ালে কৌটার গায়ে নির্দেশ মোতাবেক ঘন না করে নিজেদের খেয়াল খুশী মত তা পাতলা করে খাওয়ান। গরুর দুধ খাওয়ালে তাতে পানি মিশিয়ে খুব পাতলা করে খাওয়ান যেখানে পুষ্টির পরিমাণের কথা মোটেও চিন্তা করেন না, অনেকে আবার তাদের অজ্ঞতার জন্য দুধ পাতলা করে খাওয়ান। যেমন- কয়েক আউন্স পানিতে আধা বা এক চামচ দুধ মিশিয়ে দুধের সাদা রং হলে তাকে শিশুর উপযুক্ত বলে মনে করেন। অনেকে আবার শিশু খেতে চায় না বলে গরমের দিনেও তাকে পানি খাওয়াতে পারেন না। এ সকল ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত দুধ ও পানির অভাবে স্বভাবতঃই শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়।

শৈশবে কোষ্ঠকাঠিন্যের আর একটি প্রধান কারণ মানসিক। মা-বাবা যদি অতি শৈশব থেকেই শিশুকে সময় মত মলত্যাগের অভ্যাস শুরু করান তার ফলেও কিন্তু শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। তা ছাড়া মা বাবা যদি প্রত্যহ মলত্যাগের ব্যাপারে তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ করেন তাহলে সেই শিশু স্বেচ্ছায় কোষ্ঠকাঠিন্যের পূনরাবৃত্তি করতে থাকে। কাজেই তাঁদের এ ব্যাপারে কোনরকম উদ্বেগ প্রকাশ করা উচিত নয়। অথবা শিশু মলত্যাগ করছে না বলে তাকে কখনই বকাবকি বা কোন রকম শাস্তি দেয়া উচিত নয়, তার ফল বিপরীতই হতে পারে।

কখনও কখনও কোন কঠিন রোগের লক্ষণ হিসেবেও কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে।

কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে শিশুকে দুধ পাতলা না করে পরিমাণমত ঘন করে খাওয়াতে হবে। তাই দুধ তৈরির নিয়মাবলী জেনে নেয়া দরকার। বাজারে যে সমস্ত টিনের দুধ পাওয়া যায় কৌটার গায়ে লেখা নিয়মানুযায়ী দুধ তৈরি করে খাওয়াতে হবে। সাধারণতঃ কৌটার ভেতরে যে চামচ থাকে তা দিয়ে এক চামচ দুধ এক আউন্স পানিতে মিশালে শিশুর জন্য উপযুক্ত দুধ তৈরি হয়।

কোন কোন parents শিশুর কান্না থামানোর জন্য (কারণ যাই হোক না কেন) feeding-এর সংখ্যা বাড়িয়ে দেন। এতে শিশুর অনেক ক্ষতি হতে পারে। regular গরুর দুধে আয়রণ কম থাকে, পানি মিশানোর দরকার হয় না। ১ বছরের আগে গরুর দুধ খাওয়ালে পরবর্তী জীবনে তাদের diabetes-সহ আরো অনেক রোগের ঝুকি বেড়ে যায়।

অতিরিক্ত গরমের সময় শিশুকে বেশি পানি দেয়া প্রয়োজন। তা ছাড়া গরমে বেশি জামা-কাপড় পরালে শিশুর ঘাম শুকিয়ে যায়। যার ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। সেজন্য শিশুকে সময়োপযোগী কাপড় পরানো এবং নিয়মিত গোসল করানো দরকার।

শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্যের চিকিৎসা কোনরকম ঔষধের দ্বারা নিরাময় না করে উপযুক্ত অভ্যাসের আহার এবং উপযুক্ত মাধ্যমেই তা করতে হয়। তাছাড়া কখনও কখনও অন্যান্য কারণেও শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। এর জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত।

আমাদের সন্তানের জন্য কিছু স্বাস্থ্য টিপ্‌স

সন্তানদের স্বাস্থ্য বিষয়ে কিছু খেয়াল করা মা-বাবাদের জন্য খুবই জরুরী। নিম্নে কিছু স্বাস্থ্য টিপ্‌স দেয়া হলো ঃ

১) রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে এবং সকালে নাস্তা খাওয়ার পরে অবশ্যই দাঁত ব্রাশ করা।

২) বাইরে থেকে বাসায় এসেই সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস করা।

৩) যতদূর সম্ভব তাদেরকে ছোটবেলা থেকে গাম, চকলেট বা ক্যান্ডি অতিরিক্ত পরিমাণে খেতে না দেয়া।

৪) খাবার মেনুতে যতদূর সম্ভব আঁশ (fiber) যুক্ত খাবার রাখা। এতে কন্সটিপেশন হবে না। কন্সটিপেশনের কারণে ভবিষ্যতে নানা সমস্যা হতে পারে। Fiber যুক্ত খাবার যেমন, whole wheat bread, শাক-সবজী।

৫) সকালে স্কুলে যাওয়ার আগে নাস্তার মেনুতে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার রাখা। কার্বোহাইড্রেটের অভাবে ছেলেমেয়েরা সকালে স্কুলে মনোযোগ দিতে পারে না, ব্রেইন ঠিকমতো কাজ করে না। যেমন, রুটি এবং সিরিয়াল জাতীয় খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট থাকে।

৬) প্রচুর পানি পান করানো। কারণ পানির অভাবে ব্রেইনের কিছু কিছু নার্ভ শুকিয়ে যেতে থাকে, যার কারণে স্মরণ শক্তি লোপ পেতে থাকে। পানির অভাবে এটা বড়দেরও হতে পারে।

৭) খাদ্যে ফসফরাস এবং আয়োডিন থাকলে তা স্মরণ শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। যেমন সামুদ্রিক লইট্টা মাছে প্রচুর ফসফরাস থাকে।

৮) প্রেগন্যান্ট মায়েরা টুনা মাছ খাওয়া উচিত নয়। এতে প্রচুর পরিমাণে পারদ থাকে যা গর্ভাবস্থায় সন্তানের ক্ষতিসাধন করে।

৯) ছেলেমেয়েরা স্কুল ব্যাগে অতিরিক্ত বই-খাতা বহন করার কারণে ব্যাগ অস্বাভাবিক ওজনে পরিণত হয় যা দিন দিন তার মেরুদন্ডের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে থাকে। এ বিষয়ে মা-বাবার সচেতন থাকা উচিত।

ব্রেইনকে প্রখর রাখতে ৮টি অভ্যাস

সাধারণভাবে আমরা শারীরিক গঠনটাকে সুন্দর করার প্রতি বেশি মনোযোগী। আদৌ কি আমরা তার কিছুটা সময় মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ঠিক রাখার পেছনে ব্যয় করি, সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ। এই মস্তিষ্কের কল্যাণেই আমরা প্রাণীকূল থেকে আলাদা। মেধায়, মননে, বুদ্ধিদীপ্ততায় মানুষের অগ্রগতি থেমে নেই। বিশ্ব যেভাবে এগোচ্ছে, সেটাই প্রমাণ করে আমরা পূর্বের চেয়ে বহুগুণে বেশি মস্তিষ্কের উপর নির্ভরশীল। জীবনের বহু ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর অভ্যাসগুলো আমাদের মস্তিষ্ককে সক্রিয় রাখতে সাহায্য করবে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী, এখানে মস্তিষ্ককে শাণিত করার প্রাকৃতিক ও সহজ ৮টি স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের কথা অলোচনা করা হলো।

১) সক্রিয় থাকা ও নিয়মিত ব্যায়াম করা। দ্রুত হাঁটা, সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানো, অ্যারোবিক ব্যায়াম স্মৃতিশক্তিকে চাঙ্গা রাখবে। বয়স বাড়তে থাকলেও, মস্তিষ্কের জটিল কোন সমস্যা দেখা দেয়ার ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যাবে। তবে, মাঝবয়স থেকে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী শরীরচর্চার তালিকা নির্ধারণ করে নিতে হবে।

২) মাস্তিষ্কেরও ব্যায়াম রয়েছে। অঙ্ক বা গণিতচর্চা, ধাঁধার সমাধান বের করা, প্রোগ্রামিং, পাজল গেইম বা দাবা খেলার মতো যে কাজগুলোতে মাথা খাটাতে হয়, সে ধরনের কাজ বেছে নিয়ে ও নিয়মিত তা করা। কারণ, স্নায়ুকোষের মধ্যে নতুন নতুন সংযোগ তৈরি হয় এ ধরনের চর্চার মাধ্যমে। আর তা মস্তিষ্ককে তীক্ষ্ণ রাখে।

৩) স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস বা ডায়েট অনুসরণ করা। চিনি কিংবা সম্পৃক্ত চর্বিসমৃদ্ধ খাবার, ফাস্ট ফুড, ভাজাপোড়া জাতীয় খাবার যতোটা সম্ভব পরিহার করা। পর্যাপ্ত পানি পান করা। সাধারণভাবে, প্রতিদিন ৮-১০ গ্লাস পানি পান করার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। ফরমালিন মুক্ত নানা রঙের টাটকা ফলমূল ও শাক-সবজি খাওয়ার অভ্যাস করা। মস্তিষ্কের পাশাপাশি শরীরটাও ভালো থাকবে। ক্যান্সার, ডায়াবেটিস বা হার্টের সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে।

৪) দুশ্চিন্তা বা মানসিক চাপমুক্ত থাকার অভ্যাস করা। অনেক চাপের মধ্যেও নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চর্চাটা আমাদের মস্তিষ্ককে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ করে দেবে। নিয়ম করে মাঝে-মধ্যে একটু প্রকৃতির সান্নিধ্যে

যাওয়া উচিত। শহরে থাকলে, সময় বের করে একটু দূরে কোন গ্রাম থেকে ঘুরে আসা উচিত।

৫) পর্যাপ্ত পরিমানে ঘুমানো উচিত। বয়সভেদে ঘুমের সময়ের পার্থক্য হলেও, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ৭-৮ ঘণ্টা ঘুম প্রয়োজন। সুনিদ্রা মস্তিষ্ককে আরও সক্রিয় করে তোলে। সম্প্রতি এক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, জেগে থাকা নয় বরং ঘুমিয়ে থাকার সময়টাতেই মানুষের মস্তিষ্ক অধিক সক্রিয় থাকে। সারাদিনের স্বাভাবিক কাজকর্ম কিংবা মানসিক চাপের পর মস্তিষ্কে যেসব ক্ষতিকর বিষাক্ত পদার্থ জমা হয়, তা পরিস্কার করে ঘুম। পর্যাপ্ত বিশ্রামে মস্তিষ্কের কোষগুলো পরিশোধিত হয়। সতেজতা ফিরে পায়। নতুন কাজ করার উদ্দীপনা তৈরি হয়। চিন্তা করার সময় জড়তা থাকে না। স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীলভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া সহজতর হয়। স্বল্প বা দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণতর হয়।

৬) অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট জাতীয় খাবার আমাদের ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত করতে যেন না ভুলি। যেমন গাঢ় রঙের আঙুর, ডালিম, রসুন ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। তাই প্রথমেই জেনে নিতে হবে কোন খাবারগুলো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। এরপর ডায়েট চার্টে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করা।

৭) প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার অভ্যাস করা। বার্ধক্যজনিত কারণে শরীরের অভ্যন্তরীণ যে ক্ষয় শুরু হয়, তা প্রতিরোধে অন্যতম ভূমিকা পালন করে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। সারা জীবন মস্তিষ্কের ভারসাম্য রক্ষা ও মাথা খাটানোর কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা করে বিশেষ এ পুষ্টি উপাদানটি। তাই আমাদের উচিত ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবারগুলোকে খুঁজে বের করা ও তা প্রতিদিনের ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত করা। যেমন ঃ তেলাপিয়া, টোনা, চিংড়ি, সালমান মাছ, সয়াবিন তেল, ক্যানোলা তেল, ডিম, দুধ, কুমড়া বিচি ইত্যাদি।

৮) সামাজিক জীবনে সক্রিয় থাকা মস্তিষ্কের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পথ্য। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে মেলামেশার পাশাপাশি বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো, আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা সে কাজগুলোর মধ্যে পড়ে। অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা, আলোচনা করা মস্তিষ্ককে সক্রিয় রাখে এবং চিন্তার শক্তিকে তীক্ষ্ণতর করে।

ব্রেইনের জন্য ১০টি খারাপ অভ্যাস

প্রতিনিয়ত অভ্যাসবশত আমরা কিছু কাজ করে থাকি যা আমাদের ব্রেইনের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। তাই ব্রেইনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সতর্ক হওয়ার জন্য জেনে নেয়া যাক সেই অভ্যাসগুলো।

১. **সকালে নাশতা না করা ঃ** আমরা অনেকেই ব্যস্ততার কারণে সকালের নাশতা না করেই বাসা থেকে বের হয়ে যাই। কিন্তু এই অভ্যাসটা খুব খারাপ। কারণ সকালে নাশতা না করলে নিম্ন রক্ত সরবরাহের কারণে আমাদের ব্রেইনে পর্যাপ্ত পুষ্টি পায় না। এতে করে ধীরে ধীরে ব্রেইন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ব্যস্ততা সত্ত্বেও সকালের নাশতা করতে ভুলে যেন না যাই।

২. **অতিরিক্ত ডায়েট গ্রহণ ঃ** অনেক সময় আমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ডায়েট গ্রহণ করি। ধারণা করা হয়, মাঝে মাঝে এরকম অতিরিক্ত ডায়েটে কী আর হবে কিন্তু ধারণাটা ভুল। কারণ অতিরিক্ত ডায়েট গ্রহণের অভ্যাস আমাদের ব্রেইনের রক্তনালীর ইলাস্টিসিটি নষ্ট করে দেয়, ফলে অনেক ধরনের মানসিক সমস্যার উৎপত্তি হয়। তাই সর্বদা সচেতন হওয়া এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত ডায়েট গ্রহণে বিরত থাকা।

৩. **ধূমপান ঃ** ধূমপান নানা রোগের অন্যতম কারণ। ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব বলে শেষ করা যাবে না। তাই যারা ধূমপান করেন তাদের জন্য সতর্কবার্তা ধূমপানে কেবল ফুসফুস ক্যান্সার নয় বরং এতে করে ব্রেইন সঙ্কুচিত হয়ে যায় ফলে আলঝেইমার (alzheimer) নামক স্মৃতিবিলোপকারী রোগের উদ্ভব হয়। এছাড়া ইসলামে ধূমপান করা হারাম।

৪. **অতিরিক্ত মিষ্টি গ্রহণ ঃ** অনেকের ধারণা মিষ্টি বেশি খেলে ব্রেইন ভালো হয়। কিন্তু আসলে অতিরিক্ত মিষ্টি খেলে সেটা আমিষ ও অনান্য পুষ্টি উপাদানের পরিপাক ও শোষণে বাধা সৃষ্টি করে যা ব্রেইনের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে এবং বেইনের বিকাশ সাধনের অন্তরায়।

৫. **বায়ু দূষণ ঃ** বায়ু দূষণের জন্য আমাদের বেইনের কার্যক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যায়। কারণ বায়ু দূষণের ফলে অক্সিজেন সমৃদ্ধ বাতাস আমাদের ব্রেইনে যেতে পারে না। ফলে ব্রেইন ধীরে ধীরে পুষ্টির অভাবজনিত কারণে

স্বাভাবিক কার্যকরী ক্ষমতা হারাতে থাকে। তাই বায়ু দূষণযুক্ত পরিবেশ থেকে দূরে থাকা উচিত এবং বায়ু দূষণ রোধে নিজে ও অন্যকে সচেতন করা উচিত।

৬. **নিদ্রাহীনতা ঃ** ঘুম আমাদের ব্রেইনের বিশ্রামের জন্য জরুরী। তাই পর্যাপ্ত ঘুম বেইন কোষের স্বাভাবিক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই যারা দীর্ঘদিন যাবত নিদ্রাহীনতায় ভুগছেন কিংবা কাজের ব্যস্ততার জন্য ঘুমানোর সময় পাচ্ছেন না তাদের জন্য বলা হচ্ছে, নিদ্রাহীনতা আমাদের ব্রেইনের কোষের মৃত্যুর জন্য দায়ী। সুতরাং পর্যাপ্ত ঘুমকে কেবল সময় নষ্ট হিসেবে নয় বরং ব্রেইনের বিশ্রামের জন্য দরকারি হিসেবে গুরুত্ব দেয়া উচিত।

৭. **ঘুমানোর সময় মাথা আবৃত করা ঃ** ঘুমাতে যাওয়ার আগে মাথা খোলা রেখে ঘুমানো ব্রেইনের জন্য উপকারী। কারণ মাথা আবৃত করে ঘুমালে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ঘনীভূত হয় এবং অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। এতে ব্রেইনের ক্ষতিসাধন হয়।

৮. **অসুস্থতার সময় অতিরিক্ত কাজ ঃ** যখন আমরা অসুস্থ হই তখন আমাদের উচিত কোনো পরিশ্রমী কাজ অথবা পড়াশোনা থেকে বিরত থেকে আমাদের ব্রেইনকে বিশ্রাম দেয়া। তা না হলে অসুস্থতার সময় অতিরিক্ত চাপ আমাদের ব্রেইনের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয়, ফলে ব্রেইনের দীর্ঘমেয়াদি মারাত্মক ক্ষতিসাধন হয়।

৯. **চিন্তা না করা ঃ** বেশি বেশি চিন্তা করা, ব্রেইন কোষের উদ্দীপনার জন্য চিন্তা-ভাবনা করা অত্যন্ত জরুরি। যত বেশি সৃষ্টিশীল চিন্তায় মনোযোগ দিতে পারা যায়, তত বেশি ব্রেইন কোষ উদ্দীপিত হবে। আরও বেশি দক্ষ ও মনোযোগী হতে পারা যায় যে কোনো কাজে। আর চিন্তাহীন ব্রেইন ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয়ে ব্রেইনের কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দেয়।

১০. **কথা না বলা ঃ** অনেকেই চুপচাপ থাকতে পছন্দ করেন। কিন্তু অতিরিক্ত নিরবতা ব্রেইনের জন্য ক্ষতিকর। কারণ যত বেশি বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনায় অংশ নিতে পারা যায় সেটা ব্রেইনের স্বাভাবিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত উপকারী।

ব্রেইন ফুড এবং স্মরণ-শক্তি বৃদ্ধি

মানুষের বয়স বাড়ার সাথে সাথে ব্রেইনের কিছু কিছু নার্ভ শুকিয়ে যেতে থাকে, যার কারণে স্মরণ-শক্তি আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকে। আর পানি কম পান করার দরুন এগুলো আরো দ্রুত শুকিয়ে যায়। তবে সব ধরনের বেরী ফল হিউম্যান ব্রেইনের উন্নতি সাধন করে স্মরণ-শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। তাই আমাদের নিজেদের এবং সন্তানদের বেশী বেশী করে এই ফলগুলো নিয়মিত খাওয়ার অভ্যাস করা উচিত। যেমন ঃ কালোজাম, লেবু, আমড়া, আমলকি, স্ট্রবেরী, ব্লুবেরী, ব্ল্যাকবেরী, রাসবেরী ইত্যাদি।

মানসিক শান্তির জন্য স্বাস্থ্য ভাল রাখা খুবই প্রয়োজন

১) খাওয়ার শুরু ও শেষে দু'আ পড়া।
২) খুব ক্ষুধা না লাগলে না খাওয়া। প্রতি তিন ঘন্টা পরপর হালকা কিছু খাওয়া।
৩) অতিরিক্ত পরিমাণ আহার না করা।
৪) অতিরিক্ত চর্বি-মশলা ও লবণযুক্ত খাদ্য এবং নেশা-জাতীয়/উত্তেজক পানীয় গ্রহণ না করা।
৫) প্রতিদিন টক-ঝাল-মিষ্টি-তেতো স্বাদের খাদ্য খাওয়া।
৬) পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া, প্রচুর পরিমাণে সবজী খাওয়া।
৭) সারাদিন প্রচুর পানি পান করা।
৮) খাওয়ার পরপরই শুতে না যাওয়া অথবা কোন ব্যায়াম না করা।
৯) খাদ্য ভাল করে চিবিয়ে খাওয়া।
১০) রেগে থাকলে অথবা কোন কারণে মেজাজ খারাপ (আপসেট) থাকলে ঐমুহূর্তে না খাওয়া, এতে হজমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে।
১১) দ্রুত খাবার না খাওয়া, ধীরে-সুস্থে এন্‌জয় করে খাওয়া।
১২) দিনে দু'বার দাঁত ব্রাশ করা। রাতে ঘুমাবার আগে অবশ্যই।

স্ট্রেস কন্ট্রোল করা

পরিমাণ মত খাবার-দাবার গ্রহণ ঃ আমাদের ধারণা আছে অ্যালকোহল গ্রহণ করলে বা বেশি পরিমাণে খাওয়া-দাওয়া করলে স্ট্রেস থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু খুব বেশি পরিমাণে খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাস স্ট্রেস কমানোর বদলে তা

বাড়িয়ে তোলে। তাই স্ট্রেস বেশি হলে পরিমাণমত খাবার খেতে হবে। খুব বেশি খাবার খাওয়ার প্রয়োজন নেই।

নিজের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিতে হবে ঃ অন্যদের ইচ্ছা পূরণ করার পাশাপাশি নিজের ইচ্ছা পুরণের দিকেও নজর দিতে হবে। প্রত্যেকেরই কিছু কিছু নিজস্ব ইচ্ছা আছে এবং তা পূরণ করা বা সেই ইচ্ছা অনুসারে জীবনধারণ করার অধিকার সবারই আছে, তবে অবশ্যই কুরআন ও সুন্নার বিপরীত নয়।

খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করা ঃ স্ট্রেস-ফ্রি হতে গিয়ে খুব বেশি চা বা কফি পান বা সিগারেট খাওয়ার মতো বদ অভ্যেসে অভ্যস্ত হওয়া যাবে না। এর মধ্যে যে নিকোটিন থাকে তা স্ট্রেস বাড়িয়ে তোলে।

নিয়মিত ব্যায়াম করা ঃ খুব কঠিন নয় এমন কিছু ব্যায়াম দৈনিক চর্চা করা যার ফলে শরীর থেকে 'এন্ডোফিন' নির্গত হয় যা স্ট্রেস কমে যায় এবং পজিটিভ চিন্তা-ভাবনা জাগিয়ে তোলে। নিয়মিত পড়াশোনা করা, নিজেকে রিল্যাক্স রাখা। রিল্যাক্সেশনে বিভিন্ন প্রক্রিয়া জেনে নেয়া। অবসর সময় নষ্ট না করে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান বাড়ানের জন্য নিয়মিত পড়াশোনার চর্চা করা। স্ট্রেসের কারণ কম করার চেষ্টা করা।

নিজের গুরুত্ব উপলব্ধি করা ঃ নিজের কাজে নিজের চিন্তাধারা বা বিচার বুদ্ধির বাস্তব রূপ তুলে ধরা। আমি কতটা ব্যস্ত তা কারো কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে। তাই নিজের গুরুত্ব এবং ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করা।

জীবাণুর বিস্তার রোধ ঃ হাত পরিষ্কার রাখা

হাত পরিষ্কার রাখা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

হাতের মাধ্যমেই জীবাণু বহন করে ও ছড়ায় সবচেয়ে বেশি। বাইরে থেকে এসে প্রথমেই হাত না ধুয়ে সে হাত দ্বারা চোখ, নাক অথবা মুখ স্পর্শ করলে শরীরে জীবাণু প্রবেশ করার সম্ভাবনা থাকতে পারে। যদি কোনও ব্যক্তি নিজের হাতের উপর হাঁচি দেন বা কাঁশেন এবং তারপর দরজার হাতল বা নব, সিড়ির রেলিং কিংবা টেলিফোন স্পর্শ করেন, তাহলেও জীবাণু ছড়ায়। অন্য কেউ ওগুলি ধরামাত্র জীবাণু তাঁর শরীরে উঠে যেতে পারে। যদি তিনি হাত পরিষ্কার না

করেই সে হাত দিয়ে চোখ, নাক অথবা মুখ স্পর্শ করেন তবে জীবাণুর প্রকোপে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন।

আমি কখন হাত সাবান ও পানি দিয়ে ধোব?

যখন হাত স্পষ্টত নোংরা থাকে। আগে ও পরে ঃ

- হাঁচি, কাশি, নাক ঝেড়ে - খাবার তৈরি করা ও খাবার খাওয়া।
- ওয়াশরুম ব্যবহার করে - কাঁটা বা ক্ষতস্থানে স্পর্শ করে।
- ময়লা ঘাঁটলে - চোখ, নাক অথবা মুখে স্পর্শ করে।
- ডায়াপার বদল করে।
- খোলা খাবারে হাত দিয়ে।

সাবান ও পানি দিয়ে সবচেয়ে ভাল ভাবে কী করে হাত ধোয়া যায়?

- কুসুম-কুসুম গরম পানিতে হাত ভেজান ও সাবান দেয়া।
- প্রায় ১৫ সেকেন্ড ধরে দুই হাত জোরে জোরে ঘষা।
- গোটা হাত, এমনকী হাতের পিছন দিকে, দুই আঙুলের মাঝে, নখের নীচেও ঘষে নেয়া।
- তোয়ালে দিয়ে ভাল করে মুছে হাত শুকিয়ে নেয়া (বাড়ির বাইরে পাবলিক ওয়াশরুম হলে ওয়ান টাইম টিসু বা পেপার টাউয়াল ব্যবহার করতে হবে) অথবা ব্লোয়ার চালিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে।
- যদি প্রয়োজন হয়, পানির কল বন্ধ করতে হলে খালি হাত ব্যবহার না করে টিসু দিয়ে কল ধরতে হবে।

হাত পরিষ্কার করার পরে আমার কি হ্যান্ড লোশন ব্যবহার করা উচিত?

হ্যাঁ। যখন ঘনঘন হাত পরিষ্কার করতে হচ্ছে, বিশেষ করে শীতকালে, সেই সময় ত্বক শুকনো হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। শুকনো ত্বক ফেটে যেতে পারে। ফাঁটা জায়গা দিয়ে শরীরে জীবাণু ঢুকে পড়তে পারে। ত্বক শুকিয়ে যাওয়া রোধ করতে সাবান অথবা অ্যালকোহল-ভিত্তিক হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা যেতে পারে, যাতে ইতিমধ্যেই লোশন দেয়া আছে কিংবা হাত ধোয়ার পরে নিজেও লোশন (লিকুইড হলে ভাল) ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রচন্ড গরম থেকে নিরাপদে থাকা

অত্যাধিক গরমের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বাস্থের ক্ষতি হতে পারে। হীট স্ট্রোকে অনেকে মারাও যেতে পারে। প্রচন্ড গরমে যারা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন তারা হলেন ঃ বৃদ্ধরা, শিশু ও ছোট বাচ্চা, দীর্ঘকালীন রোগে আক্রান্ত রোগীরা, মানসিক রোগী।

প্রচন্ড গরমে কী করা যেতে পারে

- তেষ্টা পাওয়ার পূর্বেই ঠান্ডা পানি পান করা।
- অধিক পরিমাণে তরল পদার্থ পান করা।
- যতোটা সম্ভব ঠান্ডা বা ছায়াতল স্থানে থাকা।
- ঢিলা এবং হালকা রংয়ের কাপড় পরিধান করা।
- সূর্য থেকে দূরে থাকা এবং ছাতা ব্যবহার করা।
- বাইরের কাজগুলো দিনের ঠান্ডা সময়ে করে নেয়া।
- ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করা এবং ভিজা টাউয়াল ব্যবহার করা।
- দিনে সূর্য থেকে বাঁচার জন্য জানালায় পর্দা ব্যবহার করা।
- কম গরমের সময় রান্না করে রাখা এবং রান্না ঘরের চুলা যতোটা সম্ভব কম জ্বালানো।
- জানালার পাশে অথবা জানালার মধ্যে টেবিল ফ্যান ফিট করা এতে বাইরে থেকে ঠান্ডা বাতাস ভিতরে নিয়ে আসবে এবং ভেতরের গরম বাতাস বাইরে বের করে দিবে।
- বদ্ধ ঘরে ফ্যান ব্যবহার করা ঠিক নয়।

রসুনের উপকারিতা

তাই হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণ ও হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধে রসুন এক অসাধারণ ভেষজ। প্রতিদিন এককোয়া রসুন কাঁচা খেলে সাধারণত হার্ট এটাকের সম্ভাবনা ৫০ শতাংশ কমে যায়।

মধুর উপকারিতা (Medicine of Prophet ﷺ)

মধু হলো মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত এক অপূর্ব নিয়ামত। স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং যাবতীয় রোগ নিরাময়ে মধুর গুণ অপরিসীম। রসূলুল্লাহ ﷺ একে

'খাইরুদ্দাওয়া' বা মহৌষধ বলেছেন। আয়ুর্বেদ এবং ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রেও মধুকে বলা হয় মহৌষধ। এটা যেমন বলকারক, সুস্বাদু ও উত্তম উপাদেয় খাদ্যনির্যাস, তেমনি নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্রও। আর তাই তো খাদ্য ও ওষুধ– এ উভয়বিধ পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ নির্যাসকে প্রাচীনকাল থেকেই পারিবারিকভাবে 'পুষ্টিকর ও শক্তিবর্ধক' পানীয় হিসেবে সকল দেশের সকল পর্যায়ের মানুষ অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে ব্যবহার করে আসছে। মধুতে যে সকল উপকরণ রয়েছে এর মধ্যে প্রধান উপকরণ সুগার। সুগার বা চিনি আমরা অনেকেই এড়িয়ে চলি। কিন্তু মধুতে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ এ দু'টি সরাসরি মেটাবলাইজড হয়ে যায় এবং ফ্যাট হিসেবে জমা হয় না।

মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে মধুর নমুনা পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এতে এলুমিনিয়াম, বোরন, ক্রোমিয়াম, কপার, লেড, টিন, জিংক ও জৈব এসিড (যেমন– ম্যালিক এসিড, সাইট্রিক এসিড, টারটারিক এসিড এবং অক্সালিক এসিড), কতিপয় ভিটামিন, প্রোটিন, হরমোনস, এসিটাইল কোলিন, এন্টিবায়োটিকস, ফাইটোনসাইডস, সাইস্টোস্ট্যাটিক্স এবং পানি (১৯-২১%) ছাড়াও অন্যান্য পুষ্টিকর উপাদান রয়েছে। ভিটামিন যেমন– ভিটামিন সি বা অ্যাসকারবিক এসিড, ভিটামিন বি-১, বি-২, বি-৩, বি-৫, বি-৬, ভিটামিন-ই, ভিটামিন-কে, ভিটামিন-এ বা ক্যারোটিন ইত্যাদি বিদ্যমান। মধু এমন ধরনের ঔষধ, যার পচন নিবারক (এন্টিসেপটিক), কোলেস্টেরল বিরোধী এবং ব্যাকটেরিয়া বিরোধী ধর্ম আছে। মধু দ্বারা ব্রঙ্কোনিউমোনিয়ার জীবাণু চতুর্থ দিনে, টাইফয়েডের জীবাণু পঞ্চম দিনে এবং আমাশয়ের জীবাণু ১০ ঘণ্টায় ধ্বংস হয়।

নিয়মিত ও পরিমিত মধু সেবন করলে নিম্নলিখিত উপকার পাওয়া যায় ঃ

১. হৃদরোগ প্রতিরোধ করে। রক্তনালী প্রসারণের মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালনে সহায়তা করে এবং হৃদপেশীর কার্যক্রম বৃদ্ধি করে।

২. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৩. ক্যান্সার প্রতিরোধ করে।

৪. দাঁতকে পরিষ্কার ও শক্তিশালী করে।

৫. দৃষ্টিশক্তি ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে।

৬. মধুর রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্ষমতা, যা দেহকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের হাত থেকে রক্ষা করে বার্ধক্য ঠেকাতে সাহায্য করে।

৭. মধুর ক্যালরি রক্তের হিমোগ্লবিনের পরিমাণ বাড়ায়, ফলে রক্তবর্ধক হয়, এবং ঠান্ডাজনিত রোগ নিরাময় করে ।

৮. আন্ত্রিক রোগে উপকারী । মধুকে এককভাবে ব্যবহার করলে পাকস্থলীর বিভিন্ন রোগের উপকার পাওয়া যায় ।

৯. দুর্বল শিশুদের মুখের ভেতর পচনশীল ঘা-এর জন্য খুবই উপকারী ।

১০. শরীরের বিভিন্ন ধরনের নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং উষ্ণতা বৃদ্ধি করে ।

১১. ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স এবং ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ মধু স্নায়ু এবং মস্তিস্কের কলা সুদৃঢ় করে ।

১২. মধুতে স্টার্চ ডাইজেস্টি এনজাইমস এবং মিনারেলস থাকায় চুল ও ত্বক ঠিক রাখতে অনন্য ভূমিকা পালন করে ।

১৩. মধু কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে ।

১৪. যারা রক্ত স্বল্পতায় বেশি ভোগেন বিশেষ করে মহিলারা, তাদের জন্য নিয়মিত মধু সেবন অত্যন্ত ফলদায়ক ।

১৫. শিশুদের প্রতিদিন অল্প পরিমাণ মধু খাওয়ার অভ্যাস করলে তার ঠাণ্ডা, সর্দি-কাশি, জ্বর ইত্যাদি সহজে হয় না ।

১৬. ক্ষুধা, হজমশক্তি ও রুচি বৃদ্ধি করে ।

১৭. রক্ত পরিশোধন করে ।

১৮. শরীর ও ফুসফুসকে শক্তিশালী করে ।

১৯. জিহ্বার জড়তা দূর করে ।

২০. মধু মুখের দুর্গন্ধ দূর করে ।

২১. বাতের ব্যথা উপশম করে ।

২২. মাথা ব্যথা দূর করে ।

২৩. শিশুদের দৈহিক গড়ন ও ওজন বৃদ্ধি করে ।

২৪. কাশি-হাঁপানি এবং ঠাণ্ডাজনিত রোগে বিশেষ উপকার করে ।

২৫. শারীরিক দুর্বলতা দূর করে এবং শক্তি-সামর্থ্য দীর্ঘস্থায়ী করে ।

২৬. মধু খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, ফলে শরীর হয়ে ওঠে সুস্থ, সতেজ এবং কর্মক্ষম।

কালিজিরার উপকারিতা (Prophet's ﷺ Medicine)

কালিজিরাকে সব রোগের ওষুধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অন্যান্য সব ভেষজের মতো কালিজিরা নিয়েও গবেষণা কম হয়নি। ১৯৬০ সালে মিসরের গবেষকরা নিশ্চিত হন যে, কালিজিরায় বিদ্যমান নাইজেলনের কারণে হাঁপানি উপশম হয়। জার্মানি গবেষকরা বলেন, কালিজিরার অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টি-মাইকোটিক প্রভাব রয়েছে। এটি বোনম্যারো ও প্রতিরক্ষা কোষগুলোকে উত্তেজিত করে এবং ইন্টারফেরন তৈরি বাড়িয়ে দেয়। আমেরিকার গবেষকরা প্রথম কালিজিরার টিউমারবিরোধী প্রভাব সম্পর্কে মতামত দেন। শরীরে ক্যান্সার উৎপাদনকারী ফ্রি-রেডিক্যাল অপসারিত করতে পারে কালিজিরা। মোটকথা, কালিজিরা সব ধরনের রোগের বিরুদ্ধে তুলনাহীন। কালিজিরার এমন কিছু ব্যবহার জানা যাক, যেগুলো একেবারেই অপ্রচলিত।

১. স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে ঃ কালিজিরা মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধি করে স্মৃতিশক্তি বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। প্রতিদিন নিয়ম করে আধা চা চামচ কাঁচা কালিজিরা অথবা ১ চা চামচ কালিজিরার তেল খাওয়া উচিত।

২. চুল পড়া রোধে ঃ কালিজিরা চুলের গোড়ায় পুষ্টি পৌঁছে দিয়ে চুল পড়া রোধ করে এবং চুল বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ২ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল ও ১ চা চামচ কালিজিরার তেল একসাথে মিশিয়ে হালকা গরম করে নিয়ে চুলের গোড়ায় ভালো করে লাগিয়ে ১০-১৫ মিনিট মাসাজ করতে হবে। ১ ঘণ্টা পর চুল শ্যাম্পু করে ধুয়ে ফেলতে হবে।

৩. ব্যথা কমাতে ঃ যেকোনো ধরনের ব্যথা কমাতে কালিজিরার জুড়ি নেই। কালিজিরার তেল হালকা গরম করে নিয়ে ব্যথার জায়গায় মালিশ করলে, ব্যথা সেরে যাবে। বিশেষ করে বাতের ব্যথায় বেশ ভালো উপকার পাওয়া যায়।

৪. ফোঁড়া সারাতে ঃ ব্যথাযুক্ত ফোঁড়া সারাতে কালিজিরা সাহায্য করে। তিলের তেলের সাথে কালিজিরা বাটা বা কালিজিরার তেল মিশিয়ে ফোঁড়াতে লাগালে ব্যথা উপশম হয় ও ফোঁড়া সেরে যায়।

৫. মেদ কমাতে ঃ চায়ের সাথে কালিজিরা মিশিয়ে পান করলে তা বাড়তি মেদ ঝরে যেতে সাহায্য করে। একটি পাত্রে পানি নিয়ে চুলার উপরে দিতে হবে। পানি ফুটে উঠলে চাপাতা ও সমপরিমাণ কালিজিরা পানিতে দিতে হবে। চায়ের রং হয়ে এলে নামিয়ে ছেঁকে নিয়ে সাধারণ চায়ের মতোই পান করতে হবে।

৬. দাঁতের ব্যথায় ঃ দাঁত ব্যথা হলে, মাড়ি ফুলে গেলে বা রক্ত পড়লে কালিজিরা তা উপশম করতে পারে। পানিতে কালিজিরা দিয়ে ফুটিয়ে নিতে হবে। এই পানির তাপমাত্রা কমে উষ্ণ অবস্থায় এলে তা দিয়ে কুলি করতে হবে। এতে দাঁত ব্যথা কমে যাবে, মাড়ির ফোলা বা রক্ত পড়া বন্ধ হবে। এছাড়া জিহ্বা, তালু ও মুখের জীবাণু ধ্বংস হবে।

৭. মাথা ব্যথায় ঃ ঠান্ডাজনিত মাথাব্যথা দূর করতে কালিজিরা সাহায্য করে। একটি সুতি কাপড়ের টুকরায় খানিকটা কালিজিরা নিয়ে পুঁটুলি তৈরি করতে হবে। এই পুঁটুলি নাকের কাছে নিয়ে শ্বাস টানতে থাকলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যথা সেরে যাবে। ইনশাআল্লাহ।

নাবী মুহাম্মাদ ﷺ স্মৃতিশক্তি বাড়াতে যে খাবার খেতে বলেছেন

আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ সবসময় স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। অনেক মানুষেরই স্মৃতিশক্তি কম থাকে। তাই স্মৃতিশক্তি বাড়াতে তাদের স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া জরুরী। স্বাস্থ্যকর খাবার অর্থ শুধু মাছ বা মাংস খাওয়া নয়। মহানাবী ﷺ নিজে যে খাবার খেতেন এবং যে খাবার গুলো উনার উম্মতদের খেতে বলেছেন সেগুলো হলো-

১. ডালিম-বেদানা ঃ বেদানার পুষ্টিগুণ ও খাদ্যগুণের পাশাপাশি এটার ধর্মীয় একটি দিক আছে এবং নাবী ﷺ বলতেন, এটা আহারকারীদের শয়তান ও মন্দ চিন্তা থেকে বিরত রাখে।

২. মধু ঃ মধুর নানা পুষ্টিগুণ ও ভেষজ গুণ রয়েছে। মধুকে বলা হয় খাবার, পানীয় ও ওষুধের সেরা। হালকা গরম পানির সঙ্গে মিশিয়ে মধু পান ডায়রিয়ার জন্য ভালো। খাবারে অরুচি, পাকস্থলীর সমস্যা, হেয়ার কন্ডিশনার ও মাউথ ওয়াশ হিসেবে উপকারী।

৩. আঙ্গুর ঃ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ আঙ্গুর খেতে অত্যন্ত ভালবাসতেন। আঙ্গুরের পুষ্টিগুণ ও খাদ্যগুণ অপরিসীম। এই খাবারের উচ্চ খাদ্য শক্তির কারণে এটা থেকে আমরা তাৎক্ষণিক এনার্জি পাই এবং এটা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। আঙ্গুর কিডনির জন্য উপকারী এবং বাওয়েল মুভমেন্টে সহায়ক।

৪. দুধ ঃ দুধের খাদ্যগুণ, পুষ্টিগুণ ও ভেষজগুণ বর্ণনাতীত। দেড় হাজার বছর আগে বিজ্ঞান যখন অন্ধকারে তখন নাবী মুহাম্মাদ ﷺ দুধ সম্পর্কে বলেন, দুধ হার্টের জন্য ভালো। দুধ পানে মেরুদন্ড সবল হয়, মস্তিষ্ক সুগঠিত হয় এবং দৃষ্টিশক্তি ও স্মৃতিশক্তি প্রখর হয়। আজকের বিজ্ঞানীরাও দুধকে আদর্শ খাবার হিসেবে দেখেন এবং এর ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি অস্থিগঠনে সহায়ক।

৫. ফল ঃ যে সমস্ত ফল এবং সব্জিতে বেশি পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, তা মস্তিষ্কের পক্ষে খুবই ভালো। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে ব্লুবেরি ও স্ট্রবেরিতে থাকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা মনোযোগ এবং শর্ট টার্ম মেমরি ভালো রাখতে সাহায্য করে।

৬. ডিম ঃ ডিমে প্রচুর পরিমাণে কোলিন থাকে যা শরীরে নিউরোট্রান্সমিটার অ্যাসিটিলকোলিন তৈরি করতে সাহায্য করে। শরীরে যদি সঠিক পরিমাণে অ্যাসিটিলকোলিন তৈরি না হয় তাহলে, কোনও কিছু মনে রাখতে অসুবিধা হতে পারে। ডিমে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি এসিড থাকে যা বাচ্চার মস্তিষ্কের পক্ষে খুবই ভলো।

৭. বার্লি (জাউ) ঃ ব্রেইনের পাশাপাশি এটা জ্বরের জন্য এবং পেটের পীড়ায় উপকারী। অসুস্থ অবস্থায়, মূলত জ্বর হলে রসুল ﷺ এই খাবারটি বেশি গ্রহণ করতেন বলে জানা যায়।

৮. খেজুর ঃ খেজুর রসুল ﷺ - এর খুব প্রিয় একটি খাবার। রসুল ﷺ বলতেন, যে বাড়িতে খেজুর নেই সে বাড়িতে কোনো খাবার নেই। এমনকি রসুল ﷺ সন্তান প্রসবের পর প্রসূতি মাকে খেজুর খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর তাহনিক করার ক্ষেত্রেও রসুল ﷺ খেজুর ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। খেজুরের গুণাগুণ ও খাদ্যশক্তি অপরিসীম। খেজুরের খাদ্যশক্তি ও খনিজ লবণের উপাদান শরীর সতেজ রাখে।

রসুল ﷺ আরো কিছু খাবার পছন্দ করতেন

দেড় হাজার বছর পর আজকের বিজ্ঞান গবেষণা করে দেখেছে রসূল ﷺ -এর বিভিন্ন খাবারের গুণাগুণ ও উপাদান অত্যন্ত যথাযথ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. ডুমুর ঃ ডুমুর রসূল ﷺ -এর প্রিয় খাবারের অন্যতম। ডুমুর অত্যন্ত পুষ্টিকর ও ভেষজগুণ সম্পন্ন যাদের পাইলস ও কোষ্ঠকাঠিন্য আছে তাদের জন্য অত্যন্ত উপযোগী খাবার।

২. তরমুজ ঃ রসূল ﷺ তরমুজ আহারকে গুরুত্ব দিতেন। নিজেও বেশ পরিমাণে তরমুজ খেতেন। সব ধরনের তরমুজ স্বাস্থ্যের জন্য উপকারি। যেসব গর্ভবর্তী মায়েরা তরমুজ আহার করেন তাদের সন্তান প্রসব সহজ হয়। তরমুজের পুষ্টি, খাদ্য ও ভেষজগুণ এখন সর্বজনবিদিত ও বৈজ্ঞানিক সত্য।

৩. মাশরুম ঃ দেড় হাজার বছর আগে রসূল ﷺ জানতেন মাশরুম চোখের জন্য ভালো। এটা বার্থ কন্ট্রোলে সহায়ক ও মাশরুমের ভেষজগুণের কারণে এটা নার্ভ শক্ত করে এবং শরীরের প্যারালাইসিস বা অকেজো হওয়ার প্রক্রিয়া রোধ করে। আজ বিশ্ব জুড়ে মাশরুম একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর খাবার এবং মাশরুম নিয়ে চলছে নানা গবেষণা।

৪. জলপাই তেল ঃ অলিভ অয়েলের খাদ্য ও পুষ্টিগুণ অনেক। গবেষণায় দেখা গেছে, অলিভ অয়েল ত্বক ও চুলের জন্য উপকারী এবং বয়স ধরে রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক বা বুড়িয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া বিলম্বিত করে। এছাড়া অলিভ অয়েল পাকস্থলীর প্রদাহ নিরাময়ে সহায়ক।

৫. ভিনেগার বা সিরকা ঃ ভিনেগারের ভেষজ গুণ ও খাদ্যগুণ অপরিসীম। রসূল ﷺ অলিভ অয়েলের সঙ্গে মিশিয়ে ভিনেগার খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আজকের এই মর্ডান ও বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্যের যুগে বিশ্বের বড় বড় নামি-দামি রেস্টুরেন্টেগুলো অভিল অয়েল ও ভিনেগার এক সঙ্গে মিশিয়ে পরিবেশন করে থাকে।

৬. খাবার পানি ঃ প্রিয়নাবী ﷺ পানিকে পৃথিবীর সেরা ড্রিংক বা পানীয় হিসাবে উল্লেখ করেছেন। পানির অপর নাম জীবন। পানির ভেষজগুণ

অপরিসীম। সৌন্দর্য চর্চা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য রক্ষায় চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা আজ প্রচুর পানি পান করতে বলেন।

দীর্ঘজীবী হওয়ার উপায়

কেউ যদি দীর্ঘজীবী হতে চায় তাহলে প্রাণ খুলে মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। এতে আয়ু বেড়ে যাবে। যুক্তরাজ্যের গবেষকেরা সম্প্রতি এ তথ্য জানিয়েছেন।

ইংল্যান্ডের গবেষকদের ভাষ্য, যাঁরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেন, পীড়িতদের সেবায় সময় দেন, তাঁরা মানসিক ও শারীরিকভাবে উপকৃত হন। আত্মকেন্দ্রিক স্বভাবের বদলে পরোপকার মানুষের আয়ু বাড়িয়ে দিতে পারে। গবেষকেরা দাবি করেন, যাঁরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেন, তাঁদের কম বয়সে মৃত্যুহার স্বেচ্ছাসেবকের কাজ না করা ব্যক্তিদের তুলনায় ২২ শতাংশ পর্যন্ত কম হতে পারে।

বিএমসি পাবলিক হেলথ সাময়িকীতে প্রকাশিত পর্যালোচনায় গবেষকেরা ৪০টি গবেষণার তথ্য-উপাত্ত ঘেঁটে পরোপকারের সুফল সম্পর্কে জানিয়েছেন। তাঁরা বলেন, পরোপকার মানুষকে বিষন্নতা থেকে মুক্তি দিয়ে জীবনের ভালো দিকগুলো সম্পর্কে সচেতন হতে সহায়তা করে।

গবেষক সুজান রিচার্ডস এ প্রসঙ্গে বলেন, স্বেচ্ছাসেবকদের ক্ষেত্রে মানসিকের পাশাপাশি শারীরিক উন্নতির বিষয়টিও লক্ষণীয়। গবেষকেরা জানান, মানুষের উপকার করে যেতে পারলেই কেবল এই সুফল পাওয়া সম্ভব। প্রতিনিয়ত অন্যের উপকারের কথা ভেবে কাজ করে যেতে পারলে মানসিক শান্তির পাশাপাশি সামাজিকতা ও বন্ধুত্ব বাড়ে, যাতে একাকিত্ব থেকে মুক্তি মেলে।

এবার আমরা দেখি এ বিষয়ে হাদীসে কি উল্লেখ রয়েছে।

আনাস ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি চায় যে, তার রুযী (জীবিকা) প্রশস্ত হোক এবংআয়ূ বৃদ্ধি হোক, সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখে।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

APPENDIX

কিছু বাস্তব চিত্র থেকে শিক্ষাগ্রহণ

Appendix

মা-বাবাদের নিকট কিছু বাস্তব সিনারিও তুলে ধরা হলো। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সতর্ক করা। আমরা খুব দ্রুত বিজাতীয় কালচার নিজেদের দেশে আধুনিকতার নামে আগ্রহ করে লুফে নিচ্ছি। কিন্তু একবার কি ভেবে দেখেছি যে নিজেদের কী সর্বনাশ ডেকে আনছি!

বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড কালচার

আমরা জানি স্কুল-কলেজগুলোতে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার এমন কোন ব্যবস্থা নেই যে যেখানে ইসলামিক কালচার শেখানো হয়। তারা এই শিক্ষা পায় না যে একটা অ্যাডাল্ট ছেলে এবং একটা অ্যাডাল্ট মেয়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হয়। বরং এখনকার কালচার হচ্ছে যে হাইস্কুল-কলেজ থেকেই বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড সম্পর্ক তৈরী করা এবং যাদের বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ড নেই তাদেরকে অন্যান্য ছেলেমেয়েরা একটু অন্যরকম চোখেই দেখে থাকে। এছাড়া তারা নিজেরাও অনেক সময় এই কারণে হীনমন্যতায় ভুগে। তারপরও আরো কথা থেকে যায়। এই বয়সের মনও চায় সেটা, তার উপর আবার অবারিত পরিবেশ। সবার বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড আছে কিন্তু আমার নেই তা তাদের মনেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের অনেক মুসলিম ছেলেমেয়েরাই এই প্রভাবে পড়ে বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড সম্পর্ক তৈরী করে কিন্তু মা-বাবা যেহেতু পছন্দ করেন না সেহেতু তা তারা সবার নিকট লুকিয়ে রেখে বাইরেই কাজটা সেরে বাসায় আসে।

মনে রাখতে হবে, যে সকল ছেলেমেয়েরা কো-এডুকেশনে পড়ে এবং ৮-১০ ঘন্টা বাসার বাইরে থাকে, আমি কি তাদেরকে নিয়ে চিন্তা করবো না? আমি কি সচেতন হবো না? আমার সন্তানদের জন্য কি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবো না?

কো-এডুকেশনের প্রভাব বা ফলাফল

কো-এডুকেশন মানে ছেলেমেয়েরা একই সময়ে একই স্থানে, একই শ্রেণীকক্ষে বসে পড়ালেখা করা। যার দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল অনেক ক্ষেত্রেই খারাপ হচ্ছে। এতে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রেই ছেলেমেয়েদের মাঝে অবৈধ সম্পর্কের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। যদিও পশ্চিমা দৃষ্টিতে ও আইনানুসারে এই সম্পর্ক বৈধ। এ সম্পর্কে বাংলাদেশের একটি চিত্র দেখি। বাংলাদেশ অবজার্ভার পত্রিকায় ডা. সাবরিনা কিউ রশীদ একটি আর্টিক্যালে লিখেছেন তা নিম্মে তুলো ধরা হলো ঃ

'পূর্বে কখনো আমরা ডাক্তারেরা এত অধিক সংখ্যক অবিবাহিত অল্প বয়স্ক মেয়েকে গর্ভবতী হতে দেখিনি'। তিনি এ মন্তব্য সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের সম্পর্কে করতে গিয়ে প্রবন্ধে উল্লেখ করেন- ছাত্র-ছাত্রীদের পারস্পরিক কথাবার্তা শেষ পর্যন্ত আর শুধু কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এগুলো পরবর্তীতে স্পর্শ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এ বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যৌন হরমোনের নিঃসরণ হওয়ায় যে কোন স্পর্শ শরীর ও মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এটি ছেলেদের ক্ষেত্রে বেশি ঘটে। কেননা মেয়েরা একটু ঠাণ্ডা হলেও ছেলেরা অনেক বেশি আবেগপ্রবণ। সুতরাং মেয়েরা ছেলেদের বন্ধু হিসেবে নিতে চাইলেও ছেলেরা তার চেয়ে অনেক বেশী ভাবে।

সেজন্য ডা. সাবরিনা সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের ছেলেদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা না করতে এবং নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করে চলতে বলেছেন। ডা. সাববিনা রশীদের পরামর্শ যুক্তিযুক্ত।

আমাদের সত্যিকার কালচার কী?

ঘটনা-এক ঃ আমি (আমির জামান) একদিন টরন্টোতে বাসে করে মসজিদের দিকে যাচ্ছি। মেইন স্টেশন সাবওয়ে থেকে দু'জন ভদ্র মহিলা উঠেছেন, হয়তো অফিস থেকে ফিরছেন। একজন আমার পাশের খালি সিটে বসেছেন এবং অপরজন দাঁড়িয়ে গল্প করছেন। তারা বাংলায় গল্প করছেন বলে আমি পাশে বসে শুনার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও সবই শুনতে পারছি। তারা মূলতঃ আমাদের কালচার নিয়ে কথা বলছেন। আমি তাদের দু'জনের আলাপের কিছুটা অংশ আমাদের শিক্ষণীয় হিসেবে তুলে ধরছি।

১ম মহিলা ঃ ভাবী, আপনারা তো ক্যানাডায় অনেক দিন হলো, আপনার মেয়েরা বাংলাদেশী কালচার ভুলে যাচ্ছে না তো?

২য় মহিলা ঃ না না ভাবী, আমি তো এ ব্যাপারে খুব সচেতন। আমি আমার মেয়েদেরকে বাংলা গানের এবং নাচের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি, ওরা নাচ-গান দুটোই শিখছে, এছাড়া ওরা প্রতি বছর বৈশাখী মেলায় প্যান্ট-শার্ট না পরে শাড়ি পরে থাকে, সেখানে স্টেজে নাচে, ফুল নিয়ে একুশের মেলায়ও যায়। আর আমার বড় মেয়েটা তো শুটকি ভর্তা খেতে খুব পছন্দ করে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিশ্লেষণ ঃ দেখি এই ভদ্র মহিলার কাছে কালচার মানে অনৈসলামী কিছু কাজকর্ম যা মুসলিম কালচার থেকে অনেক দূরে! আসলে শুধু এই মহিলা কেন, আমাদের বাংলাদেশের বেশীরভাগ মানুষের কাছেই কালচার মানে অনৈসলামী কাজ কারবার।

ঘটনা-দুই ঃ টরন্টোর একটা বাংলাদেশী মেলায় আমরা ইসলামের দাওয়াতি ম্যাটারিয়ালস ডিস্টিবিউশনের উদ্দেশ্যে স্টল দিয়েছিলাম। উদ্বোধনী দিনের একটি ঘটনা আমাদের শিক্ষণীয় হিসেবে তুলে ধরছি। ঢাকা ইউনিভার্সিটির বটতলার মতোই খুব সুন্দর করে স্টেইজ সাজানো হয়েছে। প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশের একজন এক্স প্রেসিডেন্ট আসছেন শুভ উদ্বোধন করার জন্য। সকলেই প্রধান অতিথির জন্য অপেক্ষমান, যে কোন সময় তিনি এসে পড়বেন।

চিত্র ১ ঃ প্রধান অতিথি যথা সময়ে আসলেন। অডিটোরিয়ামের গেটে একদল মেয়ে গানের তালে তালে নেচে প্রধান অতিথিকে স্বাগতম জানালো এবং নাচ শেষে একটি মেয়ে তার গলায় ফুলের মালা পড়িয়ে দিল। এটি ছিল প্রধান অতিথিকে বরণ করার প্রথম পর্ব।

চিত্র ২ ঃ এবার প্রধান অতিথিকে বরণ করার দ্বিতীয় পর্ব। অতিথি মূল স্টেজের কাছাকাছি গেলেন এবং পূর্ব থেকেই ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া দু'টি যুবতী মেয়ে নাচের সাজে সেজে স্টেজের মধ্যে আগে থেকেই সিজদারত অবস্থায় রয়েছে এবং মেয়ে দু'টি সিজদার মাধ্যমে প্রধান অতিথিকে বরণ করলো মনোমুগ্ধকর নাচের তালে তালে। এবার প্রধান অতিথি তার নিজ আসন গ্রহণ করলেন।

বিশ্লেষণ ঃ প্রোগ্রাম শেষে এক ভদ্রলোক এক মেয়ের বাবাকে বলছেন, "ভাই আপনার মেয়ে তো খুব সুন্দর নেচেছে!" মেয়ের বাবাতো এই মন্তব্য শুনে খুব

খুশি, তার বুকটা যেন গর্বে ভরে গেল। এই হলো আমাদের কালচারের অবস্থা! আমার মেয়ে স্টেজে নেচে নিজেকে প্রদর্শনের মাধ্যমে অন্য পুরুষের মন জয় করছে আর আমি বাবা হয়ে সেজন্য গর্ববোধ করছি, মনে খুব আনন্দ পাচ্ছি, তৃপ্তি পাচ্ছি, শান্তি পাচ্ছি। আর বিশেষ কিছু লিখতে চাই না আশা করি আমরা মা-বাবারা সচেতন হবো।

কিছু বাস্তব চিত্র এবং এর বিশ্লেষণ

বাস্তব চিত্র ঃ ১

ঘটনা ঃ বুসরা (ছদ্ম নাম) নামের একটি মেয়ে। এস.এস.সি পাশ করে ইন্টারমিডিয়েট ১ম বর্ষে ভর্তি হয়েছে ঢাকার একটি নামকরা প্রাইভেট কলেজে। তারা দুই ভাই বোন, বুসরা বড় এবং ভাইটি ছোট হাইস্কুলে পড়ে। মা এবং বাবা দু'জনই শিক্ষিত এবং দু'জনই ভাল চাকুরী করেন। হঠাৎ একদিন মা অফিস থেকে কোন একটি জরুরী কাজে দুপুরে বাসায় এসেছেন। বাসায় এসে তার মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার অবস্থা। বুসরা কলেজ ফাঁকি দিয়ে বাসায় এবং এখানেই শেষ নয়, সে তার বয়ফ্রেন্ড নিয়ে একান্তে তার বেডরুমে সময় কাটাচ্ছে!

সমস্যা ঃ মা এখন কি করবেন? চেচামেচি করে বাসা মাথা তুলবেন? এখুনি বুসরার বাবাকে ফোন করবেন? আত্মীয়-স্বজনদেরকে ডেকে আনবেন? ছেলেটির মা-বাবাকে ফোন দিবেন? বুসরাকে ধরে চর-থাপ্পর দিবেন? ছেলেটিকে ঘার ধরে বাসা থেকে বের করে দিবেন? বুসরার কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দিবেন? বুসরাকে বাসা থেকে বের হতে দিবেন না?

সমস্যার সমাধান ঃ না। মায়ের এগুলো কোনটাই করা ঠিক হবে না। তাকে ধৈর্যধারণ করতে হবে। বুসরার বাবাকে এই মুহর্তেই ফোন না দিয়ে সে বাসায় ফেরার পর তার সাথে ধীরে সুস্থে পরামর্শ করতে হবে, কী করা যায়। হৈচৈ করার কোন প্রয়োজন নেই। বুসরার কলেজ বন্ধ করারও প্রয়োজন নেই। হ্যা, বুসরার মাকে অফিস থেকে কয়েক মাসের ছুটি নিতে হবে। বুসরার সাথে নিয়মিত সময় কাটাতে হবে। বুসরাকে মা বোঝাবেন যে, সে তাদের মা-বাবার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। তারা কখনই তার কাছ থেকে এটা আশা করেনি। তারা খুব কষ্ট পেয়েছেন সেটা বুসরাকে বোঝাতে হবে। ছোট বেলা থেকে কিভাবে

মা-বাবা সন্তানকে লালন-পালন করেন সেই ইমোশনাল কথা মনে করিয়ে দিতে হবে। যেনো বুসরা অন্তর থেকে বুঝতে পারে। বুসরাকে বোঝাতে হবে যে, তার পছন্দের কথা তাদের জানাতে পারতো। তার সাথে বুদ্ধসুলভ আচরণ করতে হবে। প্রায় প্রতিদিন বিকেলে, সাপ্তাহিক বন্ধের দিন পরিবারের সবাই মিলে সুন্দর সুন্দর জায়গায় বেড়াতে যেতে হবে, টুকটাক কেনাকাটা করা যেতে পারে। শুক্র-শনিবার সবাই একসাথে মিলে নাস্তা খাওয়া, লাঞ্চ করা এবং প্রতিদিন একসাথে ডিনার করা।

বাস্তব চিত্র ঃ ২

এই ঘটনাটি আমরা সবাই পত্রিকায় দেখেছি, টিভিতে খবরে দেখেছি এবং ইউটিউবেও এর ডকুমেন্টারী রয়েছে। মেয়েটির সম্মানের খাতিরে আমরা নাম প্রকাশ করছি না। একজন বড় অফিসারের মেয়ে। বাবার অগাধ টাকা। বাবা তার চাকুরী নিয়ে ব্যস্ত থাকেন এবং মা সোসাইটি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। মেয়েকে খুব একটা সময় দেন না কিন্তু মেয়েকে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা-পয়সা দেন, এদিকে কোন কমতি নেই। মেয়েটির তরুন বয়স, অফুরন্ত টাকা-পয়সা নিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সময় কাটায়, এক সময় খারাপ বন্ধু-বান্ধবও জুটে যায় এবং ড্রাগ এডিকটেড হয়ে যায়। এভাবে চলতে থাকে বেশ কিছু দিন। এক সময় মা-বাবা বিষয়টি বুঝতে পারেন এবং তাকে শাষন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মেয়ের সেটা ভাল লাগে না। অবশেষে নানা কারণে সে নিজ হাতে মা-বাবাকে হত্যা করে।

এখানে মেয়েটিকে সর্বপ্রথমে দোষ দেয়া যাবে না। ঘটনায় দেখা যাচ্ছে মা-বাবা তাকে প্রথম থেকে সময় দেন নাই, টাকা-পয়সার লিমিট করেন নাই এবং তাকে প্রথম থেকেই কন্ট্রল করেন নাই। যার কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে। সময় থাকতে বাবা মা সচেতন হন নাই এবং যখন রোগ বেশী দূর পর্যন্ত চলে গেছে তখন মেয়েকে টাইট দিয়েছেন যার কারণে হিতে বিপরীত হয়েছে।

বাস্তব চিত্র ঃ ৩

শাহেদ (ছদ্ম নাম) নামে একটি ছেলে হাইস্কুলে পড়ে। মা-বাবা, ভাই-বোন সকলেই খুবই ধার্মিক অর্থাৎ পুরো পরিবারটাই ধর্মপরায়ণ। বাবা ব্যবসা করেন এবং মা হাউজ-ওয়াইফ, মা-বাবা সারাক্ষণ ছেলেমেয়েদেরকে চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করেন। পরিবারটি লক্ষ্য করছেন যে শাহেদের পরীক্ষার রেজাল্ট

খুবই খারাপ হচ্ছে অর্থাৎ বেশীরভাগ সাবজেক্টেই ফেল। মা-বাবা চেষ্টা করে যাচ্ছেন কিন্তু সঠিক কারণটা ঠিক বুঝতে পারছেন না কেন ছেলের রেজাল্ট এতো খারাপ হচ্ছে! এভাবে চলছে বেশ কিছুদিন।

হঠাৎ একদিন অবাক হয়ে পরিবারটি আবিষ্কার করলেন যে, শাহেদ নিয়মিত স্কুলে যায় না। সে স্কুল ফাঁকি দিয়ে সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে প্রায় প্রতিদিন কম্পিউটার গেইম খেলে। কিন্তু এখন প্রশ্ন, সে প্রতিদিন সাইবার ক্যাফের জন্য টাকা পায় কোথায়? যা হোক, মা-বাবা সেটাও কিছুদিনের মধ্যে উদ্ঘাটন করে ফেললেন। আর তা হচ্ছে শাহেদ বাবার পকেট থেকে মাঝেমধ্যে না বলে টাকা নিয়ে থাকে।

ঘটনার বিশ্লেষণ ঃ এখানে পাঁচটি বিষয় ১) শাহেদ নিয়মিত স্কুল ফাঁকি দিচ্ছে ২) পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ করছে ৩) বাজে বন্ধুদের পাল্লায় পড়েছে ৪) কম্পিউটার গেইমের নেশায় পড়েছে এবং ৫) বাবার পকেট থেকে না বলে টাকা নিচ্ছে। এখানে পরিবারটি ধার্মিক এবং যথেষ্ট সতর্ক হওয়ার পরও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। মা-বাবা কোনদিন কল্পনাও করতে পারেননি যে এ ধরনের ঘটনা তার ছেলের দ্বারা হতে পারে। মনে রাখতে হবে, টিনএইজারদের নিজের উপর নিজের কন্ট্রোল খুব কমই থাকে। এই বয়সে মন অনেক কিছুই চায়। তার উপর আবার অধুনিক পরিবেশ। এখানে মা-বাবা ছেলের ব্যাপারে এতোটা গভীরভাবে কখনও চিন্তা করেন নাই কিন্তু যখনই ছেলের রেজাল্ট খারাপ হয়েছে তখনই ওনারা বেশ চিন্তায় পড়ে গেছেন।

সমস্যার সমাধান ঃ আলহামদুলিল্লাহ, সমস্যার সমাধান পরিবারটি নিজেরাই করেছেন। শাহেদকে বেশ কিছুদিন বাবা নিজে সাথে করে স্কুলে দিয়ে এসেছেন এবং স্কুল শেষে বাসায় নিয়ে এসেছেন। মাঝেমধ্যেই স্কুলে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়েছেন সে স্কুলে আছে কিনা এবং টিচারদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন। শাহেদকে বাসায় ভাল কম্পিউটার কিনে দিয়েছেন যেন নিজ ঘরে বসেই কম্পিউটার গেইম খেলতে পারে। বাসায় পড়াশোনার পাশাপাশি কম্পিউটার গেইম খেলার জন্য নিদিষ্ট রুটিন করেও দিয়েছেন। পরিবারের সকলে মিলে বন্ধের দিনগুলোতে বিভিন্ন ইসলামিক প্রোগ্রামে যোগ দিচ্ছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, শাহেদ এখন পড়াশোনার পাশাপাশি কয়েকটি ইসলামিক অর্গানাইজেশনের সাথে নিয়মিত ভলান্টারী কাজ করছে, বিভিন্ন স্থানে বড় বড় ইসলামিক সেমিনার, কোর্স, ওয়ার্কশপ অর্গানাইজ করছে। আমরা তার জন্য

দু'আ করি সে যেন জীবনে একজন ভাল প্রফেশনাল হওয়ার পাশাপাশি একজন ভাল মুসলিম হয়। আমীন।

বাস্তব চিত্র ঃ ৪

একদিন বিকেলে বাসায় ফিরছি। লিফ্টে জামাল ভাইয়ের (ছদ্ম নাম) স্ত্রী তার টিনএইজ ছেলেকে প্রশ্ন করছেন "তোমাকে স্কুল থেকে কেন বের করে দিয়েছে? তুমি নিশ্চয়ই কোন অন্যায় করেছ, কী করেছ? অন্য কাউকে তো বের করে দেয়নি, তোমাকে কেন বের করে দিয়েছে?" ইত্যাদি ইত্যাদি কথা হতে হতে আমাদের ফ্লোর এসে গেছে এবং আমরা নেমে যাই। পরিবারটির একটু বর্ণনা দেয়া যাক, জামাল ভাই চাকুরী করেন আর স্ত্রী লেখিকা, ছেলেটা মেয়েদের মতো লম্বা চুল রেখেছে এবং পিছনে ঝুটি করেছে আর পরেছে আর্মির প্যান্ট ও গেঞ্জি। অন্য আরেকদিন বিকেলে বাসায় ফিরছি এমন সময় দেখি বিল্ডিংয়ের সামনে পুলিশের গাড়ি দাঁড়ানো এবং দু'জন পুলিশ জামাল ভাইয়ের ঐ ছেলেটাকেই হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে নিয়ে আসছে। তার চোখ মুখে কোন ভয়ের ছাপ নেই এবং সে খুবই স্বাভাবিকভাবে পুলিশের সাথে হেঁটে যাচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে সে এরকম প্রায়ই যায়।

বাস্তব চিত্র ঃ ৫

আমাদের এক পরিচিত ভাইয়ের ছেলে প্রাইমারী স্কুলে পড়ে। স্কুল শেষে সে একদিন হেঁটে হেঁটে বাসায় ফিরছে, হাতে তার স্কুলের রেজাল্ট শীট। তার সাথে পথে দেখা, খুব আগ্রহ করে তার রেজাল্ট শীটটা দেখতে চাইলাম। কিন্তু সে তার প্রতি উত্তরে অবাক করে দিয়ে বলল ঃ "It's not your business!"

বাস্তব চিত্র ঃ ৬

আকাশ নামে একটি ছেলে হাইস্কুলে পড়ে। মা-বাবার চোখে সে নিয়মিত স্কুলে যায়। কিন্তু যখন কোন পরীক্ষা আসে তখন সে স্কুলকে অসুস্থতা দেখিয়ে ঠিক সময়মতো পরীক্ষা দেয় না এবং পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পরপরই সে বন্ধুদের কাছ থেকে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে শুধু ঐ কটা প্রশ্নের উত্তর পড়ে অন্য একটা তারিখ ঠিক করে পরীক্ষা দিয়ে থাকে। এভাবে সে নিয়মিত স্কুলের পড়াশোনা না করে শুধু সিলেক্টেড কটা প্রশ্ন পড়ে পাশ করে যাচ্ছে। আমরা কি চিন্তা করে দেখেছি এই ছেলে নিজের অজান্তে কার ক্ষতি করছে?

বাস্তব চিত্র ঃ ৭

একটি পরিবারের দুই ছেলে। মা-বাবা দুজনই খুবই উচ্চ শিক্ষিত। ছেলে দু'টির পেছনে প্রচুর সময় এবং অর্থ ব্যয় করেছেন বড় প্রফেশনাল হওয়ার জন্য। প্রচুর অর্থ খরচ করে তাদেরকে পৃথিবীর নাম করা ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়েছেন। দুই ছেলেই ইউনিভার্সিটি পাশ করেছেন এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। একজন নামকরা ডাক্তার (নিউরোলজিষ্ট) এবং আরেকজন নামকরা ইনিঞ্জনিয়ার।

মা-বাবা ছেলে দু'টিকে কোন দিন দ্বীন ইসলামের কোন শিক্ষা দেন নাই, ছেলেরা জানে না কিভাবে ঠিক মতো সলাত আদায় করতে হয়, কীভাবে কুরআন পড়তে হয়। ছেলেরা জানে না ইসলামে কোনটি হালাল আর কোনটি হারাম, কী করা যাবে আর কী করা যাবে না। ছেলেরা ঠিকভাবে শিখেনি ইসলামে মা-বাবার প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য। যা হোক, ছেলেরা নিজেদের পছন্দমতো বিয়ে-শাদী করেছে, দু'জনেরই আলাদা আলাদা সংসার হয়েছে, ছেলেদের বউরাও উচ্চ শিক্ষিতা। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে দুই ছেলের কেউ-ই এখন আর মা-বাবাকে দেখেন না। এখন মা-বাবা বৃদ্ধ কিন্তু তাদের আদরের সন্তানরা তাদের কাছে নেই। তারা অভাবের তাড়নায় গ্রামে চলে গেছেন, চিকিৎসার অভাবে কষ্ট পাচ্ছেন। হয়তো শেষ জীবন অতি কষ্টে এভাবে শেষ হয়ে যাবে।

বাস্তব চিত্র ঃ ৮

এই পরিবারের দু'টি ছেলে। মা-বাবা আর দুই ছেলে ছিমছাম পরিবার। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যাদেরই বিয়ে হয় মায়ের পাত্রী পছন্দ হয় না। তাই সে বেশীরভাগ সময়ে এই বিয়েগুলোতে যান না। সবাই অপেক্ষায় আছে যে তার দুই ছেলেকে কোথায় কেমন পাত্রীর কাছে বিয়ে দেয় তা সকলেরই দেখার ইচ্ছা। ছেলে দু'টি বিদেশে থাকে। যাহোক, তার দুই ছেলের যখন বিয়ের বয়স হলো তখন তারা দু'জনই মা-বাবাকে না বলে, মা-বাবার অনুমতি না নিয়ে এবং মা-বাবার ইচ্ছের কোন গুরুত্ব না দিয়েই দু'জনে দুই অমুসলিম বিদেশী মেয়েকে বিয়ে করে নিয়েছে!!

বাস্তব চিত্র ঃ ৯

ঢাকার কল্যাণপুরের একটি ঘটনা। এই পরিবারের চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে। ছেলেমেয়েরা সবাই মোটামুটি বড় হয়ে গেছে। ভাই-বোনদের মধ্য থেকে দুই

ভাইয়ের মধ্যে অনেক দিন ধরে দ্বন্দ্ব। প্রায়ই দুই ভাইয়ের মধ্যে কথা কাটা-কাটি হয়, কোন কোন সময় এক পর্যায় ঝগড়াও লেগে যায়। কেউ কারো কথা সহ্য করতে পারে না, একজন একটি বললে অপরজন দশটি বলে। একদিন দুই ভাইয়ে কথা-কাটাকাটির এক পর্যায়ে তুমুল ঝগড় লেগে যায় এবং সেই ঝগড়া থেকে এক সময় তা হাতাহাতিতে চলে যায়। মানুষ যখন ক্রোধে পরে তখন তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। এ সবই শয়তানের কাজ, সে তা আরো প্রকট আকার ধারণ করিয়ে দেয়, শেষ পর্যন্ত সমাধান হয় অঘটন দিয়ে। এই দুই ভাইয়ের অবস্থাও সেরকম, তারা হাতাহাতিতে সন্তুষ্ট হতে না পেরে এক পর্যায়ে একজন হাতের কাছে বাঁশ পেয়েছে তা দিয়েই অপর ভাইকে মারতে গিয়েছে। মা এতোক্ষণ দুই ছেলের কান্ড দেখছিলেন এবং থামতে বলছিলেন কিন্তু যখন একজন অপরজনকে বাঁশ দিয়ে আঘাত করতে যাচ্ছে তখন মা তাদের মাঝে চলে গেছেন থামানোর জন্যে। বাঁশের বারি ভাইয়ের মাথায় না পরে মায়ের মাথায় পরে মা-জননী ঐ জায়গাতেই পরে মারা যান।

এই ধরনের ঘটনা আমাদের দেশে বিরল নয়, প্রায় পত্রিকায় দেখা যায় ভাইয়ের আঘাতে ভাইয়ের মৃত্যু অথবা ছেলের আঘাতে বাবার মৃত্যু। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে জমি-জমার ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। উপরের এই ঘটনাতেও ঐ একই বিষয়ের ঘাটতি। পরিবারটি প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা পায় নাই যার কারণে কারো প্রতি কারো ভালবাসা নেই, শ্রদ্ধাবোধ নেই, মায়া-মমতা নেই, সর্বপরি পরকালে বিচার দিনের বিন্দুমাত্র ভয় নেই। এই ধরনের পরিবারগুলো ইসলামের শিক্ষা থেকে অনেক অনেক দূরে।

বাস্তব চিত্র ঃ ১০

একজন দুঃখী বাবার গল্প। বাবা কম বেতনের একটি সরকারী চাকুরী করেন, খুবই সৎভাবে জীবনযাপন করেন। যা বেতন পান তা দিয়ে খুবই কষ্টে সংসার চলে। তার অনেক স্বপ্ন। নিজে খান আর না খান ছেলেকে লেখা-পড়া শিখিয়ে অনেক বড় করবেন। ছেলেকে ভাল স্কুলে পড়ালেন, ভাল কলেজে পড়ালেন, ভাল ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেন। ছেলেকে পড়াশোনা করাতে গিয়ে সারাজীবন অনেক কষ্ট করলেন, এবং রিটায়ার্ডও করলেন। এদিকে ছেলে পাশ করে বের হলেন, বিসিএস দিয়ে বড় অফিসার হলেন। নিজের ক্লাসমেট এক বড় লোকের মেয়েকে বিয়েও করলেন। ধানমন্ডিতে ফ্লাট কিনলেন, নতুন বউকে নিয়ে সেখানে উঠলেন। নানারকম পার্টিতে অংশগ্রহণ করেন এবং নিজেও মাঝেমধ্যে

পার্টি দেন। তার এখন হাই সোসাইটির সাথে উঠাবসা। ট্র্যাজেডী এখানেই শুরু, অতি দুঃখের বিষয় হচ্ছে এখন তিনি অন্যদের নিকট নিজ মা-বাবাকে পরিচয় করিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন, নিজ ফ্ল্যাটে মা-বাবাকে রাখতেও লজ্জা পান তাই তাদেরকে গ্রামের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। যে বাবা এতো কষ্ট করে তাকে পড়ালেখা করালেন, যে মা তাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করলেন তাদেরকে পরিচয় দিতে ছেলে এখন লজ্জা পান! অথচ এই সন্তানকে যদি শেখানো হতো যে, মাতা-পিতার দায়িত্ব নিয়ে, তাদের সাথে সৎব্যবহার করে, তাদের দেখাশুনা করে সে জান্নাতে যেতে পারতো তাহলে নিশ্চয়ই এমন লোভনীয় অফার সে হাত ছাড়া করতো না।

অথচ অপর দিকে, এমন ইসলামিক পরিবারের সন্তানও আছে এই বাংলাদেশে যিনি বিদেশের আরাম আয়েস ছেড়ে বাংলাদেশে একেবারে চলে এসেছেন শুধুমাত্র তার বৃদ্ধা মায়ের পা টিপার জন্য, মায়ের সেবা করার জন্য। জান্নাত পাবার আশায়। জান্নাত পাবার সুযোগ সে হাত ছাড়া করতে চায়নি।

বাস্তব চিত্র ঃ ১১

উচ্চ শিক্ষিত, আর্থিকভাবে অতি সচ্ছল, বাড়ি-গাড়ির মালিক এই পরিবার। দু'টি সন্তান, দু'টিই ছেলে -বয়স ১৪ বছর এবং ৫ বছর। সেই পরিবারের মহিলা তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালো যে সে তাদের ১৪ বছর বয়সের ছেলেটাকে খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করে, রেগে গিয়ে চেচাঁমেচি করে, ওর দিকে এটা-সেটা ছুড়ে মারে ইত্যাদি। এর কোন বিহিত করা যায় কি?

সেই ছেলের বাবাকে ডেকে এনে অভিযোগগুলো শুনিয়ে জানতে চাওয়া হলো অভিযোগগুলো সত্য কিনা। বলল ঃ সত্য। এবার জানতে চাওয়া হলো কেন সে ছেলেটার সংগে এমন দুর্ব্যবহার করে যাচ্ছে। জবাবে সে জানালো যে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ছেলেটাকে সলাত আদায় করার জন্য রাজী করানো যাচ্ছে না, কুরআন শরীফ এবং অন্যান্য ইসলামী বইপত্র কিনে দেয়া হয়েছে কিন্তু সে সেগুলো পড়তে নারাজ, একজন মুসলিম যুবকের মত চালচলন আচার ব্যবহার রপ্ত করতে উপদেশ দিচ্ছি কিন্তু আমার কোন কথাতেই সে কান দিচ্ছে না, বরং গোঁয়ার ও বেআদবের মত ব্যবহার করে চলেছে। তাই আমি ওর সংগে এমন দুর্ব্যবহার করি, এবং যতদিন সে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলবে ততদিন আমি ওর সংগে দুর্ব্যবহার চালিয়ে যাব। উনার কথা শেষ হওয়ার পর বলা হলো ঃ আপনাকে কিছু প্রশ্ন করি, এর উত্তর দিন।

এখন বলুন, আপনি কি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করেন?
- না।
সুযোগ থাকলে কখনো কি আপনি ছেলেদের নিয়ে
মসজিদে জুমার সলাত আদায় করতে যান?
- না।
ঈদের সলাতে?
- না।
আপনি নিয়মিত কুরআন পড়েন কি?
- না।
আপনি কোনদিন ইসলামী বিষয় নিয়ে আপনার স্ত্রী এবং
ছেলেদের সাথে আলোচনা করেন কি?
- না।
আপনি রমাদান মাসে সিয়াম পালন করেন কি?
- না।
আপনার স্ত্রী সলাত আদায় করেন কি?
- না।
অপনার স্ত্রী সিয়াম পালন করেন কি?
- না।

প্রশ্নোত্তর শেষ হলে তাকে বলা হলো ঃ এতক্ষণ ধরে সবই তো বললেন "না"। এবার আপনিই বলেন আপনার বাসায় যেখানে কোন ইসলামী পরিবেশই আপনি সৃষ্টি করতে পারেননি, এমন কি আপনি নিজেও সলাত-সিয়াম পালন করেন না সেখানে এই ছেলেটাকে শাসন করলেই কি সে একজন মুসলিম হয়ে সলাত-সিয়াম-কুরআন পাঠ ইত্যাদি শুরু করে দেবে? ওর সামনে ইসলামী জীবনে আকৃষ্ট বা আগ্রহী হওয়ার মত দৃষ্টান্ত বা Role model কোথায়? শক্তি প্রয়োগ করে একাজ হবে না কখনো।

তারপর তাকে পরামর্শ দেয়া হলো ঃ ওকে মারপিট, ধমকাধমকি ছাড়ুন। শুরুতে আপনি নিজে একজন মুসলিম হোন, আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন নিজের ঘরে, নিজের স্ত্রী ও সন্তানের সামনে। ছেলেটা দেখুক যে ওর বাবা পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করেন, কুরআন পাঠ করেন, রমাদানে সিয়াম পালন করেন, ইসলামী বইপত্র পড়ে, ইসলামিক ডিভিডি দেখে, ঘরে ইসলাম নিয়ে আলোচনা করে, বাবা তাকে আদর করে তখন দেখবেন গালিগালাজ বা মারপিট কোনটাই লাগবে না, আপনাকে অনুসরণ করেই সে সানন্দে ইসলামকে গ্রহণ করেছে, ইসলামী

জীবনে অভ্যস্থ হচ্ছে, ইসলামী আদব-কায়দা শিখছে। এবং বড় ভাইকে অনুসরণ-অনুকরণ করে ছোট ছেলেটাও কোন বড় ধরনের চেষ্টা ছাড়াই ইসলামকে আঁকড়ে ধরবে। তখন ছেলের মাও আর পিছিয়ে থাকবেন না, সেও একই কাতারে এসে স্বেচ্ছায় শামিল হবেন। একটা শান্তিপূর্ণ সংসার এমনি করেই গড়ে উঠবে, ইন্‌শাআল্লাহ। Give it a try. Be a Muslim first. Let Islam enter your home through you first and gradually embrace you all with peace. And good luck.

একটি সাধারণ পরামর্শ

অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন পরিবারের সকলে মিলে নিজ ঘরে কুরআনের তাফসীর নিয়ে বসতে হবে, প্রথমে সূরা ফাতিহা দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। একজন একজন করে তাফসীর থেকে কিছু অংশ রিডিং পড়বে এবং একেকটি আয়াত নিয়ে নিজেরা আলোচনা করবে যে এখানে থেকে আমরা কি শিখলাম। এভাবে আস্তে আস্তে ইসলামের অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে আল কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলোচনা করতে হবে, ইসলামের হালাল-হারাম নিয়ে আলোচনা করতে হবে, কবিরা গুনাহ নিয়ে আলোচনা করতে হবে, ইসলামী আদব ও কালচার নিয়ে আলোচনা করতে হবে, ইসলামের ফরয আদেশগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে। এভাবে পরিবাবের সকলে একসময় বুঝে যাবে একজন মুসলিম কী করতে পারবে আর কী করতে পারবে না।

REFERENCES

- তাফসীর ইবনে কাসীর - ইবনে কাসীর
- সকল সমস্যার মূল হচ্ছে আংশিক বা ভুল ঈমান - মোঃ সারওয়ার কবির শামীম
- সফল প্রবাস জীবন - মোঃ সারওয়ার কবির শামীম
- মা-বাবা ও সন্তানের অধিকার - আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী
- মধুর উপকারীতা - ড. কে এম খালেকুজ্জামান ।
- সচ্চরিত্র গঠনের রূপরেখা - জাবেদ মুহাম্মাদ
- সন্তানদের "মানুষ" করা (আর্টিক্যাল) - রেহনুমা বিনতে আনিস
- মা-বাবার দায়িত্ব ও সন্তানের করণীয় - শাইখ মু. ইবন জামীল যাইনূ রহ.
- বাবামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য - মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান
- মা ও শিশু - অধ্যাপক এম আর খান, ডাঃ এ.এফ.এম সেলিম, ডাঃ সুমন চৌধুরী
- লেকচার প্যারেন্টিং-এর উপর তাফসীর - উস্তাদ নুমান আলী খান
- মস্তিষ্ককে শাণিত রাখতে সহজ ৮ অভ্যাস - কাজী আরিফ আহমেদ
- সুস্থ থাকুক/মহানবী (সা.) স্মৃতিশক্তি বাড়াতে যে খাবার খেতে বলেছেন - আমাদের সময়.কম
- Awake! December, 2007 (Canada)
- Toronto Public Health
- Aids – Sexual Health Information
- Molly Brunk, PhD, Center for Public Policy, Virginia Commonwealth University
- Jana Martin, PhD, Psychology Regional Network, Los Angeles, California
- Nancy Molitor, PhD, Northwestern Health Care, Evanston, Illinois
- Janis Sanchez-Hucles, PhD, Old Dominion University, Norfolk, Virginia
- www.history.com
- http://teenadvice.ygoy.com/7-negative-effects-of-facebook/
- news.bbc.co.uk/2/health/3773659.stm
- www.amanaparenting.com
- http://www.cbc.ca/news/health/story/2010/05/26/teen-pregnancy.html
- http://www.beyond-hearing-voices.com/teen-alcohol-abuse.html
- http://www.myblackseed.com/
- http://rivr.sulekha.com/medicinal-value-of-honey_334168_blog
- http://www.nutrition-and-you.com/dates.html
- http://real-timenews.com/details.php?id=44907&p=1&s=6
- http://kidshealth.org/parent/positive/#cat146
- http://www.todaysparent.com/kids/is-your-kid-ready-to-be-home-alone/
- http://www.msn.com/en-us/lifestyle/parenting/3-things-to-never-say-to-your-kids-and-3-alternatives-to-use-instead/ar-AAdXVjO
- http://www.msn.com/en-us/lifestyle/parenting/10-best-life-lessons-we-learned-from-our-grandparents/ar-AAec0SV
- http://kidshealth.org/parent/positive/#cat146
- http://www.todaysparent.com/kids/is-your-kid-ready-to-be-home-alone/
- http://www.parentfurther.com.php53-8.dfw1-2.websitetestlink.com/resources/tips

Children Education Series (English)
Book 1 to 12

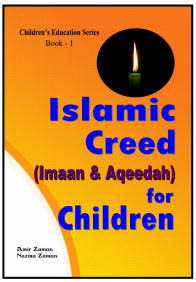

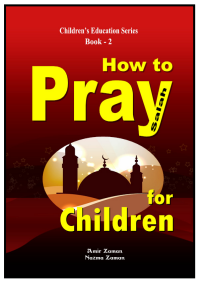

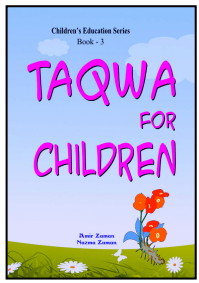

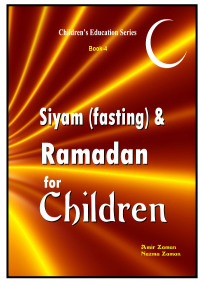

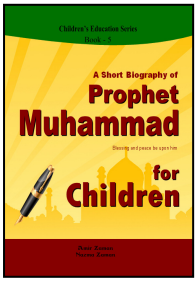

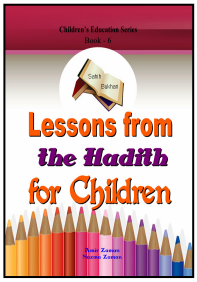

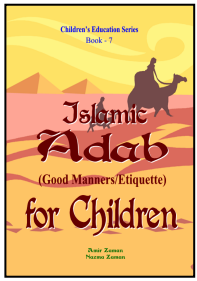

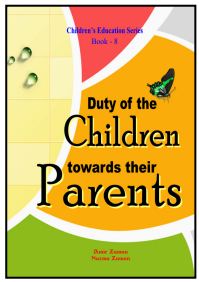

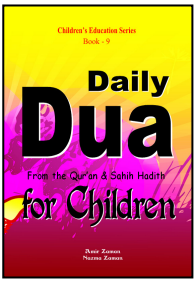

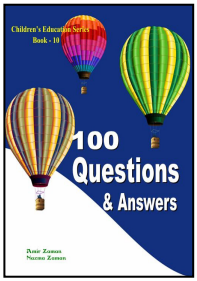

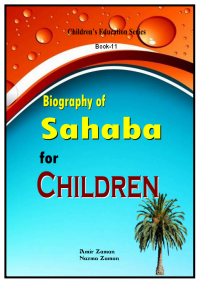

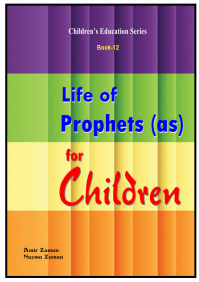

Published by
Institute of Family Development, Canada
www.themessagecanada.com